উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

মঙ্গল কাব্য ও আখ্যান কাব্য

কোর পত্র – ১০৩ (আবশ্যিক)

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১- মনসামঙ্গলের কাব্য পরিচয় ও চরিত্র

একক ২- মনসামঙ্গলের চরিত্র

একক ৩- মনসামঙ্গল ও পুরাণ

একক ৪- মনসামঙ্গলের লোকাচার ও রীতিনীতি

একক ৫- লোরচন্দ্রানীর প্রেক্ষাপট ও কাব্য পরিচয়

একক ৬- লোরচন্দ্রানীর চরিত্র সৃষ্টি

একক ৭- লোরচন্দ্রানী- রোমান্টিক ও মৌলিক কাব্য

পর্যায় খ

একক ৮- চন্ডীমঙ্গলের কাব্য পরিচয়

একক ৯- চন্ডীমঙ্গলের কাহিনীবৃতান্ত

একক ১০- চন্ডীমঙ্গলের পুরাণকথা

একক ১১- চন্ডীমঙ্গলের ভাষা

একক ১২- চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র

একক ১৩- বাস্তবতা ও চন্ডীমঙ্গল

একক ১৪- গোরক্ষবিজয়

১০৩ - মঙ্গলকাব্য ও আখ্যান কাব্য

একক ১- মনসামঙ্গলের কাব্য পরিচয় ও চরিত্র - বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের – আত্মপরিচয়, কাব্যের রচনাকাল, কাব্যের নামকরণ, কাব্যের পালা বিভাজন, কাহিনি গ্রন্থনে বিপ্রদাসের কৃতিত্ব।

একক ২- মনসামঙ্গলের চরিত্র– গঙ্গা, চন্ডী, মনসা, চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা।

একক ৩- মনসামঙ্গল ও পুরাণ – পুরানের নবমূল্যায়ন, কাহিনীতে মন্ত্রজাতের গুরুত্ব, মনসা ও নেতাকাল্টের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, সহেলা পাতানো-নারীপ্রধান সমাজের ইঙ্গিত, মহাজ্ঞান – যোগ ও তন্ত্র সাধনার বিমিশ্র ধারণা, মনসামঙ্গলের পুরাকথায় পশুচারক সমাজের ভূমিকা, মনসা সম্পর্কিত মিথ বা পুরাকথা।

একক ৪- মনসামঙ্গলের লোকাচার ও রীতিনীতি– মনসামঙ্গলের লোকাচার, মনসামঙ্গলের বর্ননাভঙ্গি ও কথন রীতি, বিপ্রদাসের রচনায় বিভিন্ন কাল ও বর্গের সমাজ-বাস্তব, বিপ্রদাসের রচনারীতি, সমাজের বিভিন্ন বর্গ।

একক ৫- লোরচন্দ্রানীর প্রেক্ষাপট ও কাব্য পরিচয় –ভূমিকা, প্রেক্ষাপট ও স্বাতন্ত্র, কবিপরিচিতি ও কবি দৌলত কাজী, কবি সৈয়দ আলাওল, কাব্যরচনাকাল, কাহিনি পরিকল্পনা, নামকরণ,

লোক উৎস ও লোক প্রভাব, অন্যান্য প্রভাব ও মঙ্গল কাব্যের প্রভাব, রামায়ন মহাভারত পুরাণ প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পদাবলী, সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যান্য কাব্যের প্রভাব, সূফী প্রভাব।

একক ৬- লোরচন্দ্রানীর চরিত্র সৃষ্টি - মুখ্য চরিত্র ও ময়নাবতী , চন্দ্রাণী, লোর, বামন, অন্যান্য চরিত্র।

একক ৭- লোরচন্দ্রানী- রোমান্টিক ও মৌলিক কাব্য – কাব্য পরিচয়, কাব্যে নিঃসঙ্গতা, অনুবাদ হলেও মৌলিক, দরবারী সাহিত্য,লোরচন্দ্রানী কাব্যে উপন্যাসোচিত আধুনিকতার দিক।

একক ১- মনসামঙ্গলের কাব্য পরিচয় ও চরিত্র

বিন্যাস ক্রম

১.১ বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের –আত্মপরিচয়

১.২ কাব্যের রচনাকাল

১.৩ কাব্যের নামকরণ

১.৪ কাব্যের পালা বিভাজন

১.৫ কাহিনি গ্রন্থনে বিপ্রদাসের কৃতিত্ব

১.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

১.৭ সহায়ক গ্রন্থ

১.১ বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের – আত্মপরিচয়

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের আত্মপরিচয় সামান্য। স্পষ্ট করে কবি জানিয়েছেন তিনি মুকুন্দ পণ্ডিতের পুত্র, গ্রাম বাদুড়্যা বটগ্রাম। তার গাত্র বৎস্য, প্রবর পিপিলাই, সামবেদী কৌথুম শাখার বংশ তাঁদের। পৈপ্পলাদ--গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণেরা অথর্ববেদীয় তাদের সঙ্গে অহিতুকি, সর্পবিদ্যক, বিষবিদ্যকদের বহু গোপন সাধন প্রণালীর সম্পর্ক ছিল। (সূত্র : ড. অভিজিৎ ঘোষ; সংস্কৃত বিভাগ ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মুকুন্দ পণ্ডিতের চার পুত্রের একজন বিপ্রদাস। মনসা তাঁকে মঙ্গলগীত রচনার নির্দেশ দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছেন :

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।

শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈল উপদেশে ।

পাঁচালি রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।

সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাদুড়্যা বটগ্রাম বলে কোনো গ্রাম পাননি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমায় বাদুড়িয়া এখনও আছে—' থানাটিতে ১১০টি মৌজা (উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত : কমল চৌধুরী, মডেল পাবলিশিং হাউস;)। বাদুড়িয়া এখন একটি পৌরসভা। আশুবাবু অবশ্য বাদুড়্যা বটগ্রাম' না পাওয়ায় সন্দেহ করেছেন বিপ্রদাস হয়তো প্রাচীন কোনো কবি নন! বিচিত্র যুক্তি তার। গঙ্গাসাগর তীর্থ জনপ্রবাদে 'সাগর'-দ্বীপ হয়ে যাওয়া, পুরুষোত্তমপুরীতে পরিণত হওয়া যদি আশ্চর্যজনক না হয়, 'বাদুড়া বটগ্রাম' বাদুড়িয়ায় পরিণত হওয়া কি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার? বিপ্রদাসকে মনসা স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন শুক্লা দশমী তিথিতে বৈশাখ মাসে। আশুবাবু লিখেছেন: শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী তিথিতে বিজয় গুপ্ত মনসার স্বপ্নদেশ লাভ করিয়াছিলেন; অতএব বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমীতে মনসার আবির্ভাবের তাৎপর্য সহজে বোধগম্য নহে। সুতরাং মনে হয় ইহার শুদ্ধপাঠ 'জ্যৈষ্ঠ মাসে' হইবে। (বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; উক্ত ; ৩৪৫ প) মন্তব্যটি ঠিক হতে পারে। তবে দশহরার একমাস আগে স্বপ্নদিষ্ট হলে কাব্য রচনা করতে বসে কবি উৎসবের সময় সে লেখা পড়ে শোনাতে পারেন। এ নিয়ে কল্পনা বিস্তার করে লাভ নেই।

বিশ্বভারতী পুথির অন্যতম লিপিকর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ১৯ কার্তিক তারিখে পুথির কতকাংশ লিখেছিলেন। তাঁর আত্মপরিচয় দেখে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন তিনি বিপ্রদাসের রচনারীতির দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন: "The copyist Nabin Chandra Chakraboti minutely initiated the manner of Vipradasa in giving in the Colophe some particulars about himself and his family .

আমাদের অনুমান, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির দুবর্তী শোনা অহীয়তা ছিল। এই হোক, আছে নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় উদ্ধার করি :

পীতাম্বর-বিপ্রসূত শ্রী নবীন নাম।

চিরকাল বসতি ছোট-জাগুলে গ্রাম।

সামবেদ কুথুম শাখা চারি সহোদৰ ।।

হারাণ পাণ কালী কনিষ্ঠ নবীন।

মনসা কৃপায় তার হস্তের লিখন।।

১.২ কাব্যের রচনাকাল

বিপ্রদাসের কালার্নীটি স্পষ্ট ;

সিন্ধু ই- বেদ মহী শক পরিমাণ।

নপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।।

অর্থাৎ সিন্ধু (৭) ইন্দু (১) বেদ (৪) মহী (১) তথা ১৪১৭ শকাব্দ (অঞ্চস্য বামাগতিসূত্রে) বা ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে মনসামঙ্গল রচিত হয় । এই সময় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ রাজত্ব করতেন (তার রাজাকাল= ৮৯৮-১৯২৫ হিজরি বা ১৪১৯২১৫১৯ খ্রি. ; স্বাধীন সুলতানদের আমল । বিপ্রদাসের একটি পয়ারে তার পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি :

সানন্দে শ্রীমন্ত রায়ে পদ্ম দেহ বর।

দ্বিজ বিপ্রদাস কহে তাহার কিঙ্কর ॥

এই শ্রীমন্ত রায়ের পরিচয় জানা যায় না। আনারপুর পরগনার ইজারাদার দুর্গাগতি রায়ের বংশের পুরুষ হলেও হতে পারেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে কিছু বলা সপ্তণ নয়।

বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধরায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত সুসংহত রচনা হিসেবে বিপ্রদাসের কাব্য যথেষ্ট শিল্প গুণমণ্ডিত।

১.৩ কাব্যের নামকরণ

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, বিপ্রদাসের কাব্য নাম 'মনসা বিজয়'। 'মনসা বিজয়' নয়, আমাদের মতে এই কাব্যের নাম মনসামঙ্গল । কাব্যের কোথাও 'মনসা বিজয়' শব্দবন্ধ মেলেনি। 'মনসা বিজ'ই লেখা হয়েছে পাঁচবার। যথা :

১. রাখালের বাক্য শুনি পদ্মাবতী হাসে। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে।

২. শাসনের রাজ্যে নাগেতে বেষ্টিত। মনসা বিজই বিপ্রদাস বিরচিত।

৩. দেখিয়া শুনিয়া রাণী আনন্দ প্রকাশে। মনসা বিজই দ্বিজ বিপ্রদাস

৪. কাঁদিতে কাঁদিতে রাম হইল নৈরাশ্য। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাস।

৫. কেহ গড়াগড়ি দিয়া করয়ে হাব্যাষ। মনসা বিজই গীত গায় বিপ্রদাস।

অন্য কাব্যের বিভিন্ন গানের ভণিতা আরও কিছু শব্দবন্ধ পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকেও কাব্যের নাম প্রস্তাব করা চলে। যেমন :

১. মনসা চরিত : সনকা ক্রন্দনে বেহুলা সুব্যথিত।

দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরিত।।

২. পদ্মার মঙ্গল : সব কথা কহে দেবী ইন্দ্র বিদ্যমান।

পদ্মার মঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান।

৩. মঙ্গলগীত : সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত

বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি

পাশাপাশি কাব্যকে 'মনসামঙ্গল' বলেছেন বিপ্রদাস, অন্তত সাতবার। যথা

১. শুনরে ভকত ঘেকে হৈয়া এমন। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান।

২. দারুন হতাশে শক্ত ছাড়িল নিঃশ্বাস। মনসামঙ্গল গীত বলে বিপ্রদাস।

৩. বিদ্যা পরীক্ষিয়া যাব রাজ বিদ্যমান। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান ।।

৪. মায়ের ক্রন্দন দেখি বেহুলা জিজ্ঞাসে। মনসামঙ্গল রচে দ্বিজ বিপ্রদাসে।

৫. বিহ্বল বেহুলা কান্দে হইয়া নৈরাশ। মনসামঙ্গল গান দ্বিজ বিপ্রদাস।

৬. কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল মুর্ছিত। মনসামঙ্গল বিপ্রদাস বিরচিত।

৭. হরি বল সর্বজন চল নিজ পুরে। মনসামঙ্গল গীত সাঙ্গ এত দূরে।পরিসংখ্যান বলছে মনসামঙ্গলই কবির উদ্দিষ্ট নাম। নতুন কোনো অকাট্য যুক্তি না পেলে আমরা মনসা বিজয় না বলে কাব্যটিকে মনসামঙ্গল বলারই পক্ষপাতী।

আরেকটি কথা বলে নিতে হচ্ছে। মনসাবিজয় আর মনসামঙ্গল একই কথা- 'বিজয় দেবী বা মনসার ভক্তগণের দিক থেকে, মঙ্গল' শ্রোতৃমণ্ডলীর দিক থেকে। বিজয় কাহিনির একটি অংশ মঙ্গল কাহিনির আদি লক্ষ্য আর পরিণতির শেষ কাম্য। যে-পাঁচবার বিজয় ব্যবহার করেছেন বিপ্রদাস— সেখানে আমরা একের পর এক জনগোষ্ঠীর ওপর মনসার পূজাধিকারলাভের কাহিনি পেয়েছি। রাখালদের মধ্যে, হাসনহাটিতে, জামালুর মধ্যে আর। সবশেষে চাঁদের পরিবারে। বলা বাহুল্য, এই নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ অংশটিকেই কবি বিজয় নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। গোটা কাব্যের নামে 'মনসাবিজয়' কবির লক্ষ্য ছিল না।

১.৪ কাব্যের পালা বিভাজন

বিপ্রদাসের গানে প্রচুর অর্বাচীন প্রক্ষেপ আছে- এই পুর্বসিদ্ধান্ত থাকায় আশুবাবু বিচিত্র যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তার মধ্যে একটি এখানে বলে নিই। "কবি তাহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তাহার বর্ণিতব্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, তাহার শেষে উল্লেখ করিয়াছেন,"

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত

বিস্তরে কহিব সগুনিশি।

ইহাতে মনে হয়, সাতটি পালায় তিনি তার গীত সম্পূর্ণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বৃহত্তর পুথিখানিতে নয়টি পালা পর্যন্ত রচিত হইয়াছে এবং যেখানে নবম পালা শেষ হইয়াছে, সেখানে পুথিও খণ্ডিত হইয়াছে।... প্রথমত কোনও মঙ্গলকাব্যই সাত পালায় রচিত হইতে দেখা যায় না। ন্যূনতম আট পালায় চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়া থাকে; তথাপি কোনও কোনও অঞ্চলে সাত পালায় মনসামঙ্গল রচিত হইত স্বীকার করিয়া লইলেও কবি গ্রন্থকারকে সাত পালায় কাহিনী রচনা করিবেন, একথা বলা সত্ত্বেও ওঁহারই নামে প্রচলিত পুথিতে নয় পাল পর্যন্ত কাহিনী রচিত হইয়াও কাহিনী অসম্পূর্ণ কেন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এরকম বিচিত্র অর্ধমনস্ক অভিযোগ বিবেচনা করলে ধোপে টেকে না। বিপ্রদাস যে সংক্ষেপ গ্রহসূত্র দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই কাব্যের পরিকল্পনা আছে। মনসার জন্ম, দেবতাদের মহাযজ্ঞ, পিলালথ-মহাব্যথা, ক্ষীরসমুদ্র, মন, অমৃত ও বিষ উথিত হওয়া, মনসার বিষাধিকার, মনসার বিবাহ পুত্রলাভ, জন্মেজয় যন্ত্র আস্তিকের নাশ, রাখালদের মনসা পূজা, কিভাবে পালার বিন্যাস করা হত স্পষ্ট-

১ম দিন অধিবাস। তারপর রাত্রে একটি মাত্র পালা গাওয়া হত।

২য় দিন থেকে সকালে ও সন্ধ্যায় ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত গাওয়ার পর,

৭ম দিন রাত্রে দুটি পালা ১২ ও ১৩ একসঙ্গে গাওয়া হত।

কারণ ওইদিনের পালাকে বলা হত জাগরণপালা'। সারারাত এই পালা গীত হত। এইভাবে সাতদিনের তেরো পালা (অষ্টমঙ্গলা ধরলে ১৪) গাওয়ার রীতি ছিল। ১৩শ পালার শেষে 'অষ্টমঙ্গলা। সেখানে ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে উষা-অনিরুদ্ধের অর্থাৎ বেহুলা লখিন্দরের জবানীতে আর একবার কাহিনির সুত্র লিখেছেন বিপ্রদাস। কোনো অসংগতি নেই। আর

এভাবে 'সপ্তনিশি' পার করার বিষয়টি খুবই সহজে প্রমাণিত হচ্ছে। আগে থেকে বিপ্রদাসের রচনায় প্রক্ষেপের কথা ভেবে না নিলে আশুবাবুর এরম বিভ্রান্তি হত না।

অষ্টমঙ্গলায় আবার কাব্যের বিষয় চুম্বক ধরা পড়ে। নতুন কোনো কথা নেই প্রথম। পালার পরিকল্পনা আর একবার সমান্তরালভাবেই উপস্থাপিত করেছেন বিপ্রদাস।

ইন্দ্ররাজ বলে শুন দেবী বিসহরি

কেমনে তোমার পূজা হইল মর্ত্যপুরী।

অষ্টমঙ্গলায় কবি জানাচ্ছেন মনসার জন্ম , বিষ খেয়ে শিবের ক্ষী-রাদ সমুদ্রতীরে ঢলে পড়া, সিজুয়া শিখরে মনসার অধিষ্ঠান , জন্মেজয়ের যজ্ঞপণ্ড , রাখালদের মধ্যে পূজা , হাসনের পুরীতে এবং ঝালুমালুর ঘরে পূজা প্রচার , টাদের মহাজ্ঞান হরণ , সঙ্ক ধন্বন্তরি, বনামনা ও টানের ছয় পুত্রের মৃত্যু , উষা-অনিরুদ্ধের মর্তে জন্মগ্রহণ, চাঁদের অনুপম পাটন যাত্রা- তখন সনকার পাঁচমাসের গর্ভ , কালিদহে ঈদের সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরের সলিল সমাধি , বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ, লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু , মান্দাসে ভেসে বেহুলার স্বর্গে আসা, নৃত্য গীতে মুগ্ধ করে লখিন্দর সহ সকলকে বাঁচিয়ে ফেরা-- চাঁদের মনসা পূজা , লখিন্দর-বেহুলার স্বর্গে ফিরে যাওয়া । কাব্য পরিকল্পনা ও পায়ণে কোন অসংগতি নেই। আশুতোষ সপ্তনিশিকে সৎ পালা ভেবে কাকদন্ত-গবেষণা করে বিষয়টি অহেতুক জটিল করেছেন।

১.৫ কাহিনি গ্রন্থনে বিপ্রদাসের কৃতিত্ব

বিপ্রদাসের কাহিনি গ্রন্থন কৌতূহল সৃজনকারী, নির্দোষ ও মৌখিক রীতির অনুগত। এ কাহিনিতে নাট্যগুণ, হাস্য ও করুণরসের সার্থক মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এইরকম নাট্যগুণসম্পন্ন রচনা উপহার দেওয়া যথেষ্ট শ্লাঘনীয় । কাহিনিটি কবি জানতেন। সম্পূর্ণই মনে মনে বিন্যস্ত করে উপহার দিয়েছেন। মনসার জন্মকথা- যাকে 'আদ্যের কথা বলা হত একসময় এবং এই সূত্রে ধর্মমঙ্গল কাহিনি ও মনসামঙ্গলের

কাহিনির কিছু। সমাপতন ঘটেছে -ও আনুষঙ্গিক, কবির উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয়বাহী। বিশেষত শিবের রিপুকার হিসেবে পার্বতীর কঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি বিদাসের নিজস্ব। শিব-দুর্গার কলহ বা 'ডোম-চাড়ালি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিশেষ নির্মাণ। এই ধারায় মনসামঙ্গল'-এর কবিরা বিভিন্নভাবে তাদের কাহিনি সাজিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের ডোমনি-বেশধারিণী চণ্ডী পারের কড়ি না দেওয়ায় শিবকে কথঞ্চিৎ কটু কাটব্য করেছেন :

পারের কড়ি যদি তুমি নাহি দাও শিব।

ত্রিশূল শিঙ্গা -তোমার সব বিত্ত কাড়ি নিব।।

শিঙ্গা কেটে শিব হে আমার গলায় হার দিব।

ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া আমি লাঙ্গলের ফাল করিব।

কটি ধড়া নিয়ে যাব হংস বান্ধিবার।।

ডম্বুর দিয়া খেলিবে ছেলেরা আমার।

কমণ্ডলু নিয়া মম অম্বল ঢালিব।

ঝুলিতে ভরিয়া মম তুষ ঘষী রাখিব।।

এরপর বিজয় গুপ্তের পার্বতী শিবকে ডেকে নিজের ঘরে রান্না করে খাদ্য পরিবেশন করেছেন। তারপর তার তীব্র শ্লেষাঘাত :

কোন দেব হইয়ারে সে যে বা খায় ভাঙ্গ।

কোন দেব হইয়ারে সে যেবা মস্তকে ধরে গাঙ্গ ॥

কোন দেব হইয়ারে সে যেবা ভস্ম মাখে গায়।।

কোন দেব হইয়ারে সে যে বা শ্মশানে বেড়ায় ।

জগজ্জীবন ঘোষাল অনুরূপ পরিস্থিতি সৃজন করেছেন পার্বতীর গোয়ালিনি রূপ ধারণের মাধ্যমে। শিব তাকে কামনা করায় পার্বতীর বক্তব্য :

গোয়ালিনী বোলে আমরা নীচ জন।

ত্রিদশ ঈশ্বর বাক্য লঙ্ঘিব কেমন ।।

এই মিলনের পর গণেশের জন্ম হয়েছে--শিব পার্বতীকে 'কাতি উপহার দিয়েছেন :

ফিরিয়া চলিলা দেবী আপনার ঘর।

গণেশ জন্মিলা দেবীর গর্ভের ভিতর।

জগজ্জীবন এরপর দেবীকে কুচুনির মূর্তিতে মহাদেবের সঙ্গে মিলিত করেছেন। কুচুনিও বলেছেন - তার অস্পৃশ্যতার কথা :

কচুনী বলেন প্রভু মুঞি নীচ জন।

দেবের দেবতা বাক্য লঙিঘব কেমন।

কুচুনিবেশী পার্বতী, তার কাছে রত্ন অঙ্গুরী উপহার নিয়েছেন :

কুচুনী বলে প্রভু শুন ভগবান।

মোকে দেহ হস্তের প্রভু অঙ্গুরি নিশান।

এই মিলনের ফলে কার্তিকের জন্ম হল।

বিপ্রদাস রত্ন অঙ্গুরীর কথা লিখেছেন– ডুমনিবেশী পার্বতীকেই শিব ওই উপহার দিয়েছেন :

কামে হতচিত হৈয়া ত্রিদশের নাথ।

রতন অঙ্গুরি দিলা ডুমুনীর হাত ।

দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ডোমনি বেশেই হরপার্বতীর মিলন বর্ণিত। সে বর্ণনার সঙ্গে বিজয় গুপ্তের বর্ণনার মিল দুর্লক্ষ্য নয়। পার্বতী সাবধান করছেন কামাহত শিবকে :

যদি মোর ডোম আসি লাগ পায় তোর।।

তবে সে পাইবা বুড়া প্রতিফল এর ।

তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি।

বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়া কড়ি ।

বিজয় গুপ্তে পেয়েছি একই অনুষঙ্গ। সেখানে সামান্য হেঁয়ালি-র ঢং প্রয়োগ করেছেন কবি-

ডোম নারী বলে তোর ধরিয়াছে রসে।

তুমি যাবে খেয়ার নায় বলদ থোবা কিসে।

সমুদ্র উথলে ঢেউ দেখিতে ভয় লাগে।

বলদ এড়ি পার হও যদি বলদ নিবে বাঘে।

এ হল নিতান্তই বাংলার চেনা একটি হেঁয়ালির ভাঙাচোরা রূপ। নৌ-পারাপারকারী এক পান বিক্রেতা ও একটি ছাগলকে পার করার হেঁয়ালি। একদিকে আছে একটি বাঘ। পান ও ছাগল এক পারে থাকলে পান রক্ষা হবে না। ছাগল ও বাঘ এক পারে থাকলে ছাগলের প্রাণরক্ষা পাবে না। বিজয় গুপ্ত এই হেঁয়ালির জগৎ ভেঙে তার বর্ণনার (Narrative) জগৎটি নির্মাণ করেছেন। শিবকে নিতান্ত লৌকিক ভঙ্গিতে উত্থাপন করেছেন। শিবের সমাধান সূত্র :

হাসিয়া বলেন শিব শুন ডোমের ঝী।

নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইল কি।

আমার বলদের গায় তুলা হেন ভার।

নায় না ধরে বলদ দিবেক সাঁতার।

বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাচ্ছি, ডোমনিবেশী চণ্ডী শিবকে স্বামীর ভয় দেখাচ্ছেন :

যদি প্রভু দেখে মোর এই ব্যবহার।

কর্ণ নাসা কেশ ছেদ করিব আমার।

বিজয় গুপ্ত জানাচ্ছেন সেই সেই স্বামী খরতর। শিব তাঁকে বলদ বেচিয়া পারিশ্রমিক দেবার কথা বলছেন।

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ কবি। তার কাব্যের একটি অংশ 'ডুমনি সংবাদ। ডুমনি-বেশী পার্বতী বলেছেন :

ত্রিদশের নাথ তোমায় বলে কোন ছারে।

ঘরের স্ত্রী তুমি রাখিতে না পার।

দেবের দেবরাজ কেনে নাম ধর।

জন্ম ভিখারি বাউল বচন মাত্র সার।

এক কড়া কড়ি নাহি খেওয়াতে দিবার।

খেয়ার গারানি দিতে না পারায় পার্বতী বলেছেন :

পার হইবা কেমনে খেওয়ার কড়ি বিনে

ঝুলি কাঁথা থুইয়া যাও বান্ধা ॥

ডুমনির কাছে রতি-প্রার্থনা করলে চণ্ডী শিবকে বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে এই কর্ম অনুচিত। সে সময়কার বর্ণনা :

ডুমনি বলে দাড়ি -গাপ পাকাইলা কেনে।

আপনার বলো তুমি মা বুঝ আপনে।

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।

কাকের মুখেতে যেন দেখি পাকা বেল ।।

বোঝা যাচ্ছে, মনসামঙ্গল কাহিনির একটি পুরাণ-নিরপেক্ষ লৌকিক রূপ গড়ে উঠেছিল। গায়েনরা প্রয়োজনবোধে কাহিনি বিস্তার করেছেন— আসরের দাবি অনুযায়ী। এই রচনাধারার মধ্যে বিপ্রদাসের লেখায় আছে সংহতি। বিশেষত শিব-দুর্গার কলহ বিবরণ বাংলার দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা হিসেবে বিকশিত শিবায়নের সঙ্গে মেলে। শিবায়নের অনুরূপ (রিপু কুশলীর মতো) চরিত্র শাঁখারি। শিব যেখানে পার্বতীকে শঙ্খ পরিয়েছেন আর শেষ পর্যন্ত পার্বতী 'প্রাণনাথে জান্যা প্রেম আলিঙ্গন' দিয়েছেন। রিপু কুশলীরূপী শিব-পার্বতীর কঁচুলি তৈরি করে দিয়েছেন— বিপ্রদাস তার বিস্তৃত বিবরণ দেননি সংক্ষেপে সেরেছেন। বিপ্রদাস বেহুলার -কঁচুলি নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অন্যত্র। বিশ্বকর্মা সেখানে মনসার অনুরোধে উক্ত নির্মাণ কর্ম করেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১৫৯ সংখ্যক গানে একইরকম বর্ণনা দিয়েছেন।

লোকায়ত কাহিনির বিস্তার ও পরিবর্তনের ছবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে যথেষ্ট। পুরাণসংস্কৃতি আর লোকসংস্কৃতির টানা-পাড়েনে রচিত এই কাব্যকথা— মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের (acculturation) আশ্চর্য উদাহরণ। সামান্য কিছু প্রমাণ দাখিল করা যাক।

শিবের জটায় কেন গঙ্গা, এই প্রসঙ্গে বিপ্রদাসের আখ্যান সম্পূর্ণ মৌলিক -বাধ হয়। লিখেছেন বিপ্রদাস— শান্তনু ঋষির স্ত্রী গঙ্গাকে দেবতারা যজ্ঞে রন্ধনের জন্য নিয়ে যান। দেবতাদের প্রতিনিধি শিবকে শর্ত করান শান্তনু ঋষি :

যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই।

তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।

কাটিয়ে ফিরলেন গঙ্গা, তাকে শান্তনু ঋষি গ্রহণ করলেন না। প্রত্যাখ্যাত গঙ্গা শিবের কাছেই থাকতে বাধ্য হলেন।

কোপে ঋষি গঙ্গারে না লৈলা নিজ ঘরে।

গঙ্গা লৈয়া গেলা নিজ পুর মহেশ্বরে ॥

ধর্মঠাকুর- নিরঞ্জন গোঁসাইয়ের দর্শনাভিলাষী শিব গেলেন কঠোর তপস্যা করতে। ধর্মঠাকুর স্বয়ং এসে দেখা দিলেন গঙ্গাকে :

ধবল ছত্র করি শিরে দণ্ড কমণ্ডুক করে

উলুকে করিয়া আরোহণ।

ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর

হরের আশ্রমে দরশন । ।

দ্বাদশ বৎসর শিব যাঁকে ধ্যান করে দর্শন করতে ব্যর্থ, তাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত গঙ্গা দেখতে পেলেন! তবে দেখার চিহ্ন তাঁর মুখে চিরস্থায়ী হল। ধর্মের বদন দেখি গঙ্গা ধবলমুখী হয়ে গেলেন। অন্যান্য দেবতারা ধবলমুখী গঙ্গাকে মহৎ বলে স্বীকার করে নিলেন

দেখিলা গঙ্গার মূর্তি ধবল আকর।

চতুর্মুখে ব্রহ্মা স্তব করেন গঙ্গার ।

ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, নবগ্রহ, নারদাদি ঋষিদের সামনে শিব তাঁকে শিরে ধারণ করলেন—

সম্ভ্রমে পুলক হর ভাবিয়া অন্তরে।

ভক্তি ভাবে গঙ্গারে তুলিয়া লৈল শিরে।

১.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে কবির আত্মপরিচয় সম্পর্কে যা জানো লেখো।

২। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কব্যের নামকরণ প্রসঙ্গটি আলোচনা করো।

৩। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনে বিপ্রদাসের কবি কৃতিত্ব আলোচনা করো।

১.৭ সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য
- বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল - অচিন্ত্য বিশ্বাস
- বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপালকৃষ্ণ বসু
- লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ - ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী।

একক ২- মনসামঙ্গলের চরিত্র

বিন্যাস ক্রম

২.১ গঙ্গা

২.২ চন্ডী

২.৩ মনসা

২.৪ চাঁদ সদাগর

২.৫ সনকা

২.৬ বেহুলা

২.৭ নির্বাচিত প্রশ্ন

২.৮ সহায়ক গ্রন্থ

বিপ্রদাসের চরিত্র সৃষ্টি

বিপ্রদাসের কাব্যে মানবিক রসাবেদন অত্যন্ত বেশি। তিনি যখন লিখছেন তখন মনসামঙ্গল কাহিনি বাংলায় স্থির একটি চেহারা ধারণ করেছে । এ কাহিনির কোন অংশই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেঅজ্ঞাত ছিল না। প্রধান ভূমিকা বা চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁরা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছেনমুখ্য ভূমিকাগুলির পরিণতিও তাদের অজানা নয় । এরকম শ্রোতৃমণ্ডলীকে মানবিক ব্যবহারের বিবরণের বৈচিত্র্য যোগানো রীতিমতো কঠিন । বিপ্রদাস কিন্তু সেই কাজটুকু করতে পেরেছে।

২.১ গঙ্গা

দেবদেবীর চরিত্রে তিনি এনেছেন মানবিক গুণ। যখন তারা বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করেন, তখন তা হয়েছে মানুষেরই মতো। গঙ্গাকে তিনি শান্তনু মুনির:গৃহিণী করেছেন। পশুপতি শিব দেবতার যজ্ঞে রান্না করার জন্য মুনির কাছে গঙ্গাদেবীকে নিয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করতে মুনি শর্ত দিয়েছেন:

যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই।

তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।।

গঙ্গাকে দিনে দিনে ফেরত পাঠানো গেল না । শান্তনু মুনি গঙ্গাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শিবের গৃহে গঙ্গা থাকতে বাধ্য হলেন। মানুষ আর দেবতার শর্ত— শুদ্ধতার ধারণা আর জেদ রক্ষার জন্য এক নারীকে গৃহছাড়া হতে হল! দেবত্বের ধারণা সাময়িকভাবে ভুলে গেলে এই গঙ্গাকে স্বামী পরিত্যক্তা মধ্যযুগের নারী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

গঙ্গা শিবের ঘরের কাজকর্ম করেন, শিব চলে যান ধ্যানে। বারো বছর ধরে চলে তার তপস্যা। এসময় গঙ্গার কীভাবে কাটল, কবি সে হাশ্নের উত্তর দেননি। বারো বছরের শেষে ধর্মঠাকুর সহসা এসে উপস্থিত! শিব ধ্যান করছেন ধর্ম ঠাকুরকে দেখার জন্য, ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন গঙ্গাকে। তিনি এসে উপস্থিত হলেন আত্মীয় স্বজন অতিথির মতো -

ডাকিলা শিবের তরে করিয়া মধুর স্বরে।

গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে।

তিনি গঙ্গাকে দেখলেন, গঙ্গা তার কাছে ‘পরিহার’ প্রার্থনা করলে! কেন? বিপ্রদাসের ব্যঞ্জনা থেকে মনে হয় গঙ্গা অনেকটা যেন সমস্ত পুরুষ দেবতারই কামনার লক্ষ্য। এমন না হলে ‘পরিহার’ শব্দটির প্রয়োগ হত না।

দেখি নিরঞ্জন কায় গঙ্গা চমকিত হয়।

কর জোড়ে কৈলা পরিহার।

ধর্মকে যেটুকু দেখলেন, তাতেই গঙ্গার মুখ সাদা হয়ে গেল। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠ নিবারণের শক্তি ধরেন— একথা মনে রাখলে এই কাহিনি-অংশের রহস্য ভেদ করা সম্ভব। বিপ্রদাস হয়তো গঙ্গাকে বহু-দেবভোগ্যা নারী হিসাবে অঙ্কিত করতে চান। দেবী নন, গঙ্গা এখানে নিতান্তই মানবীতে পর্যবসিত।

গঙ্গা ধর্ম-নিরঞ্জনকে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। ধর্মঠাকুর রাজি নন। তাঁর কথা তুমি দেখেছ, তাতেই তার দেখা হয়ে গেছে :

তোমারে দেখিলে হর সেই দেখা মোরে ।

শিবে জটা মেলি জেন লয়ে তোমা শিরে।

খবর -শোনার পর দেবতারা সবাই দেবী গঙ্গাকে ঘিরে উৎসব করতে আরম্ভ করলেন। গাকে চতুর্মুখে স্তব করলেন ব্রহ্মা, এলেন অন্য দেবতারা, অষ্ট দিকপাল, ইন্দ্র আর শচী। শিব কিন্তু পরম বঞ্চিত তিনি হস্তপদ আছাড়িয়া পড়িলা ধরণি। দেবতারা এখানে আসরে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের ম-তাই শূন্য মূর্তি অদেখা ঈশ্বরদর্শনের আকুল ইচ্ছা তাদের।

গঙ্গা চরিত্রের তেমন বিকাশ ঘটেনি। ভুমিকাটি ব্রাত্য, অবহেলিত নারীর চিত্র স্পষ্ট করে। দেবতা হলেও তিনি নিতান্ত মানবী। মানুষের সংসার থেকে দেবতার সংসারে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত তার।

২.২ চন্ডী

চণ্ডীর ভূমিকা মনসামঙ্গলে চমৎকার - বহুমুখী। তাঁর মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, কৌতুক, পরিকল্পনার বিচিত্রগতি আর প্রেম একাকার হয়ে গেছে। শিবের কালিদহ যাত্রার

অর্থ তিনি বুঝতে পারেননি। বুঝতে চানওনি। ধর্ম বলেছিলেন, কালিদহে শিব যদি যান, তাঁকে নারীরূপে দেখতে পাবেন:

তবে যদি অতি খেদ করে দেব রায়।

কালিদহে কমল তুলিতে যেন জায়।।

কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর।

তবে কন্যা রূপ মায়া দেখিবেন হর।।

বোঝা যায়, স্বামীর চরিত্র-ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা চণ্ডীকে চঞ্চল করেছে। তার সন্দেহ

কেমন হরের মতি কেমন বা শুদ্ধমতি।

ছলিয়া দেখিব শূলপাণি।

দেবী দুর্গার সন্দেহ অমূলক ছিল না। প্রথমত, শিব তাঁকে বার বার কালিদহে যেতে নিষেধ করেছেন; দ্বিতীয়ত, শিবের অলক্ষ্যে নৌ-পারানি ডোম নারী সেজে শিবানী বুঝেছেন তাঁর স্বামীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয় ; তৃতীয়ত, মনসাকে দেখে শিবের মনে কামনাই জেগেছে। এইরকম স্বামীকে সন্দেহ করার পর চণ্ডী খুব স্বাভাবিকভাবেই মনসাকে সম্ভাব্য সতীন বলে মনে করেছেন। চণ্ডীর ব্যবহার এখানে মানুষের সংসারের মধ্যবয়সী নারীর মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক। ন্যায় মেনে উপস্থাপিত।

কুশলী রিপুকার হয়ে অঙ্গবস্ত্র (কাচুলি) রিপু করে দেবার যে প্রসঙ্গ এনেছেন বিপ্রদাস, তাতে দেবী চণ্ডীর প্রসাধন-প্রিয়তার ছবি স্পষ্ট হয়। এ তো যে-কোন যুগের নারীর-ই সাধারণ স্বভাব।

দুর্গা মনসার তীব্র প্রাণান্তকর রুচি-বিগহিত কোন্দল মনসামঙ্গলে মানবিক ন্যায় মেনেই এসেছে। চণ্ডীর স্পষ্ট অভি-যাগ :

বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরত্তরে।

লুকাইয়া রাখে আনি পুষ্পের ভিতরে।।

চণ্ডীমঙ্গল ঐতিহ্যে কালকেতুর আনাগো সাপটি ষোড়শী হয়ে দেখা দেবার পর ফুল্লরাও তাকে ছেড়ে কথা বলেননি। নারী মাত্রই স্বামীর উপর অসপত্ন-অধিকার ও প্রেম কামনা করে। শিবের অনুপস্থিতিতে চরম ঘৃণার কথা শুনে মনসা তাঁকে কথার ছলে নিরস্ত করতে গেছেন। পারেননি। চণ্ডী তার চক্ষু কানা করে ছেড়েছেন (মহাকোপে চণ্ডিকা লইল কুশাবাণ। তার ঘায়ে মনসার চক্ষু হৈল কাণ।।') মনসা সৎ-মায়ের দিকে বিষ নয়নে তাকাতে তিনি মারা গেছেন।

তার খেদ 'প্রভুবিনে কি মোর জীবনে'। শিবকে 'জগতের নাথ' যে বলেন বলুন, চণ্ডীর কাছে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত বুদ্ধি, আদি অন্ত না ভেবে অপরিণামদর্শী মানুষ। উন্মত্তপ্রায় বাতুল ব্যবহার তাঁর :

পাগল তোমার মন। তেজি রত্ন অভরণ

অস্থি মালা ধরহ দ্বাদশ।

—এরকম যার বেশ-ভূষা-আচরণ, তাঁর পক্ষেই বিষপান করে মারা যাওয়া সম্ভব। মলয়জ কস্তুরি ত্যাগী শিব বিভূতিভূষণ, বসন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস, গৃহধর্ম ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তিধারী। সবার শেষে তিনি চিতায় আরোহণ করে প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছেন:

মায়া মোহ তেয়াগিব প্রভুর সংহতি যাব।

সাজাইয়া দেহ হুতাশন।

এই রচনাংশে দেবীত্ব বিন্দুমাত্র নেই। মৃত্যুঞ্জয় শিবের ঘরণী দেবী চণ্ডী এখানে সদ্য বিধবার অনুমৃতা হবার বাসনায় বিমর্ষ এক চেনা পৃথিবীর নারী মাত্র। এ সময় গঙ্গা মনে করালেন মনসার কথা। মনসা এলেন।

মনসা এখানে সৎমা চণ্ডীকে দেবসমাজে হেনস্থা করার সুন্দর একটি কৌশল করেছেন। নারদের মারফত বলে পাঠালেন, তাকে যেন বসন পাঠান সৎ-মা। শোকের মধ্যেও চণ্ডী মনভরে ভালো একখানা কাপড় পাঠাতে পারলেন না। তিনি তো সর্বজীবে সমদর্শী আদ্যাশক্তি নন- তিনি দোষে গুণে মেশানো নারী। জননী-সত্তা অপেক্ষা তাঁর রমণী-সত্তাই প্রবল। সৎমেয়েকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে পারেননি কখনই।

২.৩ মনসা

দেবতা সমাজে ব্রাত্য এই মাতৃহীন নারী জীবনের প্রথম থেকেই গভীর সমস্যায় পড়েছেন। কালিদহে ভ্রমণ করার সময় শিব তাকে কামনার চোখে দেখেছেন—

মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে।

দেখিয়া লাভিত হর চাহে কাম চিত্তে।

ভয় পাইয়া মনসা কহেন পূর্বকথা।

আমি সে তোমার সুতা তুমি মোর পিতা।।

এরপর যখন যে ভাবেই নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছেন, তাকে তীব্র বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। চরিত্রায়নের এই ছকটি মানবী-সত্তা আর দেবী-সত্তার আন্তরিক দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। মনসার মধ্যে মধ্যযুগের আসরের শ্রোতা আর গায়েনরা, কবি আর সংকলকরা তাদের চেনা পরিবেশের ভাবজগৎটিই দেখতে চেয়েছেন। তারা যখন মনসামঙ্গল গান শুনছেন, তখন ইসলাম ধর্মের বিজয় অভিযান চলছে— জাতিভেদ ক্লিষ্ট সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ মনসাকে আশ্রয় করে পূজা প্রচারের ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment) ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মনসার চরিত্রে দুটি চাপ অনুভূত হয়—

১. উচ্চবর্গে গৃহীত দেবতাদের চাপ।

২. নিম্নবর্গের পূজক সমাজের চাপ।

দেবতাদের চাপ বলতে আমরা এখানে দেব পূজক সমাজের চাপই বোঝাতে চাই। বস্তুত এই সমাজ উচ্চবর্গের। মনসার পূজক সমাজ নিম্নবর্গের বলেই আপাতত প্রমাণিত। এই দুই চাপে। মনসার সক্রিয়তা, তাৎক্ষণিক ক্রোধ, মোহ, গতিশীল অভিব্যক্তি দেখা গেছে এসব গুণ একান্তই সময়-চুম্বিত ব্যক্তিত্বলক্ষণ বলে মনে হয়।

সৎমা চণ্ডীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব মনসার একরঙা মানসিক বৃত্তির পরিচয় বহন করছে। যে-মুহূর্তে সৎ-মা তাকে পিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত বলে মনে করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে উপস্থিত :

শুনিয়া মনসা কোপে হৈল হুতাশন।

আপনা খাইয়া মোরে বল কুচবন।

আপন প্রকৃতি যেন দেখসি আমায়।

হেন অসম্ভব কথা প্রস্তাবে কোথায়।।

চণ্ডী তাকে শিবের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত বলে সন্দেহ করায় এই শাস্তি। কিন্তু যে-পিতার সম্মান রার জন্য তিনি সৎ-মাকে বিষ দৃষ্টিতে মেরে ফেললেন ; সেই শিব মনসাকে বললেন চণ্ডীকে বাঁচিয়ে দিতে! মনসাও তাকে সন্তাপ করতে নিষেধ করলেন--- ‘না কর সন্তাপ বাপু দিব জিয়াইয়া। এই ঘটনার সামান্য আগে কার্তিক গণেশের মুখে এক টুকরো সংলাপ মনে করতে পারি :

মন্দিরে আনিলা বাপু কাহার রমণী।।

কেমন প্রকারে মোর বধিল জননী।।

মনসা সম্পর্কে কার্তিক গণেশের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। মনসা যে-পরিবারের অন্তর্গত হতে চাইছেন, যাঁদের নিজের -লাক ভাবছেন, শ্রদ্ধা করতে চাইছেন, তারা তাঁকে -মাটেই ভালোবাসেননি। এমনকি তার চোখে কুশাবাণ বিধিয়ে দিতেও দেরি করেননি তাঁর সৎ-

জননী। অথচ অনিশ্চয়তার বোধে ভীত সন্ত্রস্ত মনসা আশ্রয়ের উদ্দেশ্যেই যেন শিবের নির্দেশমতো চণ্ডীকে বাঁচিয়ে দিলেন। অথচ চক্ষুকানা করে দেবার পরও মনসা সৎ-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন :

সত-মা হইয়া এত করে অপমান।

কতেক লাঞ্ছনা আর চক্ষু হৈল কাণ।।

এত সব দুঃখ পদ্মা-বিসরিয়া মনে।

পুনরপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে।

তা সত্ত্বেও--

চণ্ডিকারে মনসা বিনয় বলে যত।

জ্বরপিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তি-তা।

মনসার মধ্যে এক বেদনার্ত অনিশ্চয়তার বোধে সন্ত্রস্ত নারীকে দেখতে পেলাম। কিন্তু তার পক্ষে শিবের পরিবারে থাকা সম্ভব হল না। চণ্ডী বললেন :

অরণ্যে নির্বাস উহা দেহ শীঘ্রগতি।

মনসার হাহাকার তোমার পরিবার ছেড়ে থাকব কোথায় ? "তেজিয়া তোমার ঘর যাব কোথাকারে। সিজুয়া পর্বতে মনসাকে রেখে এলেন শিব, সঙ্গে নেতা আর ধামাই। এইভাবে শিবের তিনটি নিজ সন্তানের টিকে থাকার লড়াই শুরু হল। বিশ্বকর্মা আর হনুমানকে ডেকে গড়ে তোলা হল মনসার পুরী। পাশে পাষণ্ডির দেশে বিশ্বকর্মা বাণ মারলেন। সে সব রাজ্য থেকে প্রজাদের আগমন ঘটল মনসা সিজুয়া পর্বতে রীতিমতো রাজেন্দ্রাণী হয়ে বসলেন। এই পর্যায়ে মনসার সক্রিয়তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজস্ব পুরীতে মনসা খুব ভালো আছেন— বিপ্রদাসের বর্ণনা থেকে তেমনি ধারণা হতে পারে। বিশেষত এই পঙক্তিদুটিতে

হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতূহলে।

নাহি শাক দুঃখ লোক সদা আনন্দিত।

আসর-মনোরঞ্জনের জন্য মনসা সখীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন ঐরকম বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। প্রকৃতপক্ষে মনসা-নেতা-ধামাই তেমন সুখে সিজুয়া পর্বতে বসবাস করেননি।

মহাদেব যখন মন্থন-লব্ধ বিষ পান করে মৃতবৎ– চণ্ডী অনুমৃতা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, গঙ্গার কথায় নারদ তাকে আনতে গেছেন! পিতার বর্তমানেই সৎমা যেখানে থাকতে দেননি, এখন তো আরও অত্যাচার করবেন। মনসার বেদনার একটি প্রধান কারণ তদানীন্তন সমাজের অবিবাহিতা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না একক নারীদের অনিশ্চয়তা। রাজেন্দ্রাণী হলেও নিজে নিজের সংসারে প্রবেশ করা যায় না। অবস্থিত নারীদের আর যাই হোক, কৈলাসে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এই অনিশ্চয়তা-বোধ থেকে মনসা ও. নেতা উত্তীর্ণ হতে পারেননি। বিবাহ-উত্তর পর্বেও স্বামী তাঁদের সঙ্গে থাকেননি। মনে হতে পারে, চণ্ডীর সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে নেতা-মনসার মিল আছে। চণ্ডীকে একাকী রেখে দিনের পর দিন মহাদেব কালিদহে তপস্যা করতে যান। কিন্তু চণ্ডী আর শিবের পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ যথেষ্ট। সেই আকর্ষণের কারণেই চণ্ডী ডোম নারীর বেশ ধারণ করে কালিদহের খেয়াঘাটে গিয়েছিলেন। শিব চণ্ডীর কাছে এই প্রেমাকর্ষণের জন্যেই বার বার ফিরে এসেছেন। মনসার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। বিবাহরাত্রেই মনসা দেখেছেন তার স্বামী জরৎকারু কাছে নেই–

নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেবী ঋষি নাহি পাশে।

এখানে মনসার পরিণামদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। চণ্ডীর পরামর্শ মেনে তিনি সর্পসজ্জা করেছিলেন। সৎ-মা চণ্ডীর কৌশলের কাছে মনসা এখানে বিভ্রান্ত। একদিকে সর্প-সজ্জা। করে গেহ্নে মনসা, অন্যদিকে চণ্ডী বাসরে সাপের খাদ্য ব্যাং ছুঁড়ে দিয়েছেন :

ভেক দেখি সর্ব নাগ গর্জয়ে সঘন ।

উঠিয়া বসিল ঋষি চমকিত মন।

নাগভয়ে চলে গেলেন মুনি। এই কাহিনি পুরাণ-কথার লৌকিক পরিণতি বলে মনে হয়। মিথটির উৎসে মনসার স্বতন্ত্রগমা স্বরূপ থাকতে পারে। এ নিয়ে অন্যত্র আ-লাচনা করা হচ্ছে। মনসামঙ্গলের কাহিনি যখন গড়ে ওঠে, তখন পুরা কথার উদ্ভব পর্যায় বিস্মৃত হয়েছে। বিপ্রদাস বিস্মৃত উৎস কথার মাঝখানে জুড়ে দিয়েছেন তার সময়কার বাস্তবতার বোধ চরিত্রায়ণের মূল সূত্র ঠিক এইখানে। ব্যক্তিগত কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর অপেক্ষা যুগবাহিত গণমানসের পরিচয় এখানে অধিকতর লভ্য।

বিপ্রদাস যখন কাব্য লিখছেন তখন অবস্থিতা' নারীর বেদনা, স্বামীর সঙ্গ না পাবার দুঃখকে প্রবল বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী-প্রধান সামাজিক ব্যবস্থায় বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক, মোটেই অগৌরবের ছিল না। যাই হোক, দেবী মনসার বেদনাবোধ গভীর ও আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেছেন বিপ্রদাস :

কান্দে দেবী নেতো হাতে ধরি। ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী।।

তার অনুশোচনা— কেন ঋষিকে পায়ে ধরে সাধলেন না তিনি। দেবসমাজে তার নিন্দা দূর হবার কোন সম্ভাবনা নেই—'দেবপুরে করিল খাঁখার। তার বেদনা তার জন্ম দিন থেকেই শুরু হয়েছে। সান্ত্বনার কোন উপায় নেই :

জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ। কতেক সহিব মনদুঃখ!

বস্তুতপক্ষে মনসার উপর দেবসমাজ, তার সৎ-মা যে ব্যবহার করেছেন, তাতে তার চরিত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক স্বভাব জন্মেছে বলে মনে হয়। তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা, ষড়যন্ত্র করার প্রবণতা হয়তো এই দুঃখপূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতারই ফল। যে-পিতা তাঁকে আশ্রয় দিলেন, যে সৎ-মাতা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেছেন ষড়যন্ত্র করে স্বামীর সঙ্গে সংসার পর্যন্ত করে দেননি, সেই পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিজাত সমাজকে আঘাত করেই মনসা তার অস্তিত্ব জাহির করেছেন। এখানে মনসা নারী হিসেবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনতার মধ্যে প্রতিভাত হয় মধ্যযুগের লাঞ্ছিতা, সর্বরিক্তা এক নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মানসিকতা, প্রত্যয় ও তার বিজয় অভিযান।

মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে মনসা-নেতার মতো পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন, স্বামী পরিত্যক্তা কোন নারী যা যা করতে পারতেন, মনসা আর নেতা দেবী হয়েও ঠিক তাই করেছেন। নিজেরাই নিজেদের পূজা-প্রচার করেছেন, দেখিয়েছেন চমৎকার (miracle) আর -ভাজবাজি (magic), হনন প্রক্রিয়া আর মন্ত্রশক্তি (spell) প্রয়োগের বিদ্যা (witch craft)-র মাধ্যমে মৃতব্যক্তিদের পুনর্জাত করার ক্ষমতা প্রদর্শন এবং অন্য মানুষের অনুরূপ বিদ্যাহরণে তার (তাদের বলতে পারতাম— নেতার ভূমিকা ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যাওয়ায় বলছি না)। সক্ষমতা অপরিসীম। ভক্তিতে না হোক, ভয়েই জনমানসে তার দেবীত্ব স্বীকৃত।

উক্ত কর্মের মধ্যে মনসার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত উল্লেখ করেছি। এখানে আর একটি দ্বন্দ্বের ছক হাজির করা চলে। দেবীত্ব আর মানবীত্ব মনসার মধ্যে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বঘন পরিস্থিতির পরিচয়ও পাই। নেতার সঙ্গে কথোপকথনের সময় মনসা যখন বলেন :

যতেক অমরাগণ দিকপাল মুণিজন।

পৃথিবী সভার অধিকার।

আমি দেব বিষহরি এতিন ভুবন ভরি।

সবে পূজা নাহিক আমার।

তখন এই দেবী সত্তা প্রকাশ পায়। হোক না অবহেলিত, পূজা প্রচালিত না হওয়ায় ক্ষুন্ন, বিমর্ষ— তবু মনসা দেবী। মানবী নন; অন্তত এখানে। পাশাপাশি মনসাকে নিজেই নিজের পূজার জন্য যা করতে হয়েছে, তা কোন দেবীর কর্ম নয়। তিনি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে রাখালদের পূজা পেতে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছেন :

ছলিতে রাখালে মায়া পাতিলে বিশেষ।

মায়ায় হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ ।।

তার রূপ 'অতিবৃদ্ধ', 'দশন গলিত', মুখ দিয়ে কথা বের হয় না— চোখ পাকিয়ে তাকান। দীর্ঘ শালগাছের মতো দেহ, ধবল কেশ বিন্যস্ত- নারে সম্বরিতে। ক্ষেম ধুতি পরে নিতান্ত মানবীর মতো (তাঁর দীর্ঘতাকে যদি শিশু রাখালদের চোখে দেখা বলে মনে করি)।

পাশাপাশি, শুধুমাত্র মানবীকে কেউ পূজা করবে না জেনেই মনসা রাখালদের চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে মহাপদ্ম সাপকে লাঠি বানিয়ে রঙিন এক চুপড়ি কোমরে নিয়ে চললেন। রাখালরা তাকে রাক্ষসী ঠাওরালো :

কোথা হইতে আইল বুড়ি রাক্ষসী ডাইনি।

বস্তুতপক্ষে, মনসাকে দেব সমাজে রাক্ষসী-ক্রোধী-ডাকিনীস্বভাব অপদেবতা বলে প্রায়ই চিহ্নিত করা হয়েছে। চণ্ডী মনসা সম্পর্কে জরৎকারু মুনিকে বলেছেন :

নাগরূপী কন্যা এই নাগ অবতার।

মনিরত্ন এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার।

জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করার সময় ভেবেছেন, তাঁর স্ত্রী মনসা ভয়াবহ নাগবিদ্যা জানেন। মনসাকে শয়ন মন্দিরে দেখে তাঁর ভয়ের সীমা-পরিসীমা থাকেনি :

মনসা দেখিয়া ঋষি মনে ভয় বাসে।

নিদ্রা নাহি যায় মুনি নাগের তরাসে।।

পালার পথে দ্বারী ধামাইকে দেখে জরৎকারুর কথা— নাগ ভয় তার এত বেশি যে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছেন। শুধু তাই নয়, তার প্রস্তাব- ধামাই না হয় মনসাকে নিয়েই থাকেন:

আজি হৈতে পদ্মাবতী নিশ্চয় তোমার।

মনকে চাঁদ সদাগর 'ধামনা ভাতারী' বলেছেন। ধামনা ভাতারী অর্থাৎ নপুংসক যার স্বামী। রীতিমতো অনুচ্চার্য গালাগাল। এই গ্রন্থের অন্যত্র এই কদর্য সম্বোধনের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। এখানে লক্ষ করছি চাঁদ সদাগর আর জরৎকারুর চোখে মনসা একই অবস্থানে আছেন; চণ্ডী আর রাখালদের চোখেও তিনি অপদেবতাই। দেবী যখন অন্তরীক্ষে সাময়িকভাবে হারিয়ে গেছেন, রাখালদের ভাবনা :

ভাল হৈল ডাইনি পলাইল ভয় মনে।

দেবী তাদের কাছে একাদশী ব্রত উদযাপনের জন্য চেয়েছিলেন সামান্য দুধ। তাদের দলপতি পুরন্দর ঘোষ তাকে বললেন অ-সাচ্য গাভীর কথা। অত্যন্ত অবাধ্য সেই গাভী। এক কোষ দুগ্ধ কভু ইছাতে না পাই। সুতরাং অনুরোধ, এই গরুর দুধ দোয়ানা গেলে মনসাকে পূজা করবে তারা। মনসা ধামাইয়ের সাহায্যে তাই করলেন। তিনি কাখের চুপড়িতেই দূপ দুইলেনপ্রতিশ্রুতি :

চুপড়ি দুহিব গাবি না পড়িব ক্ষিতি।

ভয় কিছু নাহি বলে অন্তরে ভকতি।।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যথারীতি :

দুইল অসোচ্য দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর।

নিমিখে চুপড়ি ভরি উঠিল সত্বর!

সেই দুগ্ধ রাখালরা পান করতে বলল মনসাকে, তিনি আনন্দে উধ্বমুখ' হয়ে তা পান করলেন।

মনসার এই নিজের পূজা প্রচারের জন্য চেষ্টা আসলে তাঁর ডাইনি রাক্ষসী জাদুকরী-সত্তার পরিচয়-চিহ্ন মুছে ফেলে দেবী সত্তায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা বলেই মনে হয়।

মনসাকে চাঁদ পূজা দিয়েছেন ভক্তি সহকারেই— তবে তার আগে স্বার্থ আর জেদ দুইটি পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন তিনি। তার শর্ত মনসার নাগরা মাটিতে ভরাডুবি হওয়া ধনসম্পদটুকু নৌকা বোঝাই করে নিয়ে আসুক--- তবে পূজা। সর্বশেষে-

জয় জয় মনসাকুমারী খিতিসার।

না বুঝিয়া কৈনু দোষ। ক্ষেমত যেসব রোষ

সেবকের করো প্রতিকার!

এই পূজার পর ফুলে কুলোয়নি :

নাগ পূজিবারে পুষ্প নাহি আটে শেষে।

দাড়ি গোপ ছিড়িয়া পূজিলা অবশেষে।।

এই পূজাকে খুব সম্মান জানা-নার পূজা বলে মনে না-ই হতে পারে। তবে বিপ্রদাস দেবীকে বাঁ হাতে পূজা দেবার কথা লেখেননি।

মনসা নাগের দেবী। তবে তিনি নাগ রূপিণী নন। মন্ত্রজাত' অংশগুলির আগে পরের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় দেবী নন— মনসা এখানে মন্ত্রধারিণী উপাসিকার মতো। তার উপস্থিতি মানুষেরই মতো দেবী নন— কোন দেবী ভাবনার মানবী প্রতিমূর্তি মনসাকে অনুরূপে উপহার দিতে চান বিপ্রদাস। সাপের খেলা দেখানো, সর্পবিদ্যা, ভোজবাজি ও

বিষবিদ্যাচর্চার বিষয়টির সঙ্গে যে-জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক, মনসা যেন তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ধনা-মনার কাহিনিটুকু প্রকাশ করার সময় বিপ্রদাস মনসার মুখে প্রায় তেমনি একটু সংবাদ উপস্থিত করেছেন। মনসা কাজলা মালিনীকে বলেছেন :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে।

তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে।।

বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি।

জিয়ে বা না জিয়ে তাহা দেখিব এখনি।।

এই সময় মনসাকে দেবী নয়— মানবী বলেই গণনা করতে হয়।

২.৪ চাঁদ সদাগর

সাধারণত মনসামঙ্গল সম্পর্কে যাঁরাই আলোচনা করেছেন, চঁদের চরিত্র পরিকল্পনা তাঁদের বিস্মিত করেছে। টি. ডব্লু ক্লার্ক তার Evolution of Hindusm in Medieval Bengali Literature শীর্ষক রচনায় লিখেছেন চাঁদের মধ্যে বহু উপরণ একাকার হয়েছে। যে-চাঁদ নাখরা বাগানের অধিকারী তিনি 'a great gardener', যিনি গন্ধবণিক, যিনি বাণিজ্যজীবী, যিনি রাজা আর যিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী যোগী— তারা একটি যুগের একটি প্রবণতার ফল নয়।

চাঁদসাগর চরিত্রটি গড়ে উঠেছে বাংলার বেশ কয়েকটি যুগ-লক্ষণকে স্পর্শ করে। এর সঙ্গে বিভন্ন গোষ্ঠীর ভাবনার সত্যও মিলেমিশে গেছে। এইরকম প্রবণতা সমাজে চাঁদ চরিত্রকে ঘিরে মূর্ত হয়েছে বলেই একে মহাকাব্যিক উপাদানে (Epic Element) সমৃদ্ধ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন : মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র বিকাশ চরিত্র মহত্ত্ব দেখিতে পাই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন মহাকাব্যের বিস্তীর্ণজ্যের মধ্যস্থলে' চরিত্র জেগে ওঠে— চরিত্রের মহত্ত্বই মহাকাব্যের প্রাণ। বলে রাখি,

হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' আর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই লেখায় অল্পবয়সী লেখকের আবেগ ও ঝুঁকিপূর্ণ মন্তব্য উপস্থিত। আপাতত সে প্রসঙ্গ অবান্তর। আর এজট রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তারপরে একজন কবি সেই টুকরা ব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন। ...পুরাকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে।' (সাহিত্য সৃষ্টি ; সাহিত্য ; বিশ্বভারতী; ১৯৬৯ ৯৯-১০০ পৃ.) চাঁদ সদাগরের কাহিনিতে এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় ও স্থানের উপাদান পুঞ্জীভূত হয়ে একটি রস-পরিণতি দান করেছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদের চরিত্রে অন্তত চারটি মৌলিক উপাদান লক্ষ করি-

১. অহংকার। এই অহংকার চাঁদের পৌরুষ, ধন, জন, রাজ্য, আভিজাত্যের সবচেয়ে বেশি

জ্ঞানের অহংকার চাঁদের চরিত্রে উপস্থিত। জ্ঞান অর্থাৎ মহাজ্ঞান। এই অহংকারের উপাদানটি যোগী-সংস্কৃতি অঙ্গ বলে মনে হয়।

২. পুরুষ প্রধান ভাবদর্শ (Patriarchal idea)-এর মূর্ত প্রতিনিধি। চাঁদ স্ত্রী সনকার পূজাকে স্বীকার করেননি ; স্ত্রীদেবী মনসাকে পূজা করতে চাননি কিছুতেই। সমান্তরাল দেবভাবনা তার—- শিব কেন্দ্রিক।

৩. প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব (Protestant Protagonist)।চাঁদকে অনেক সহমর্মী, সহযোগী মনসাপূজার জন্য কাতর অনয় করলেও তিনি মনসা-পূজা করতে চাননি। নিজের ব্যক্তিত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা তার। নিজের ব্যক্তিত্বকে অমলিন রাখার নিঃসঙ্গ প্রয়াস। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদী। স্রোতের বিরুদ্ধে চলার আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করতে গিয়ে অকথ্য বেদা সহ্য করার অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে চাঁদের। এই চরিত্র ধর্ম। তাকে অন্য সব সাধারণ সনুষ থেকে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্বাতন্ত্র দিয়েছে।

৪. গাম্ভীর্যের পাথরের আড়ালে স্নেহশীল মূর্তি। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তাঁদের প্রবল

ব্যক্তিত্ব নীরন্ধ্র অহংকার, অপরিমেয় আদর্শবোধ আর প্রতিবাদী মানসিকতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁর অন্তস্তলে ফল্গুধারার মতো ক্রিয়াশীল রয়েছে। ছয়পুত্রের মৃত্যু, লখিন্দরের সর্পাঘাতে উন্মত্তপ্রায় চাঁদ সদাগরের কথাবার্তা শুনলে পিতৃত্বের এই স্নেহাতুর বৈশিষ্ট্যটি বোঝা যায় না। চাঁদ বলেছেন, ভালোই হল-- মনসা আমাকে আর কোনোরকম ক্ষতিই করতে পারবেন না। কিন্তু, পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধ তিনি অমান্য করতে পারেননি। পৌরুষের প্রতাপে অদৃষ্টকে জয় করার জন্য চাঁদ চেয়েছিলেন লোহার বাসর ঘরের প্রতিরোধ গড়তে। তা ব্যর্থ হবার পর ধ্বস্ত চাঁদ সদাগর বেহুলার নির্বন্ধে মনসাপূজা করেছেন। তার মধ্যে এখানে পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীল জনকের প্রতিমূর্তি জেগে ওঠে। সনকার প্রেম, ঝাউয়াবতীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মিনতি, পাশের রাজ্যের চাঁদ-মিতা, মধুকরের কান্ডারির অনু-রাধ— সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করা গেছে, কিন্তু অকাল, বিধবা পুত্রবধূদের নীরব অনুনয় আর বিবাহরাত্রে বিধবা বেহুলার কাতর অনুরোধ তিনি অস্বীকার করতে পারেননি।

চাঁদ চরিত্রের উক্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন যুগে কবি ও গায়েনের সমবেত ভাবনার প্রকাশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। ফলে একে একজন কবির রচনা বলে গণ্য করা যাবে না। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের পাশাপাশি রুচিহীনতার কিছু উপকরণও বিদ্যমান ; রয়েছে কিছু নেতিবাচক উপাদানও। যেমন-

১. চরিত্র শৈথিল্য। মনসা যখন মেনকা নাম নিয়ে চাঁদ সদাগরকে কামোহিত করেছেন—

তখন চাঁদ সদাগরের ব্যবহার নির্লজ্জ কামুক পুরুষের মতো। পূর্বাপর ব্যক্তিত্বের আদর্শ এখানে সংগতিপূর্ণ থাকেনি।

২. চাঁদের মিথ্যাচার ও প্রতারণার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সিংহলে বস্তু বদলের পালায় । চাঁদসেখানে লোভী, অন্যায়কারী। ব্যবসায়ের ন্যূনতম নীতি তিনি রক্ষা করেননি। বিনিময় এখানে ছলনায় পর্যবসিত।

৩. চাঁদ মনসার নিন্দা করতে গিয়ে বারংবার রুচির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। দেবী হিসাবে তিনি মনসাকে মানেননি— এ যদি তাঁর আদর্শ হয়, তাহলে বিপরীত আদর্শকে ন্যূনতম শ্রদ্ধার সঙ্গে অস্বীকার করার কথা ছিল। তা হয়নি। যনসাকে দেবী হিসাবে তো নয়ই, মানবী হিসাবে গ্রহণ করার রুচিও তিনি দেখাননি। মনসার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেছেন চাঁদ, যেভাবে তার স্বামী-না-থাকার কথা, সঙ্গী নপুংসক ধামাই-এর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা— কাজলা মালিনীর পুত্রদ্বয় ধনা মনা সম্পর্কে বিকৃত ইঙ্গিত করেছেন, তাতে চাঁদের চরিত্রের মহাকাব্যিক উচ্চমান রক্ষিত হয়নি।

বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগের সমাজ-পরিবেশ চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বকে যেমন গড়েছে, তেমনি তার রুচির বিকারের জন্যও সেই অনুদার রুচিহীন পরিবেশ বা বাতাবরণকেই দায়ী করতে হবে। চাঁদের চরিত্রের ইতিবাচক আর নেতিবাচক উপকরণগুলির তুলনা করলে বাোঝা যায় মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মান চাঁদ চরিত্রের উচ্চতাকে রক্ষা করতে পারেনি। যে-গীরব তাঁর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আভাসিত হয়— সেই মহত্ত্ব তাঁকে রূপায়িত করার মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ করে যখন চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার অবসর হয়েছে, তখন বিপ্রদাসের রচনায় প্রচুর প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে অনুমান করি। এসমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্রটি হাস্যকর (Ridiculous বা Comic) হয়ে গেছে। তামাসার পাত্র হয়েছেন চাঁদ, আসরে উপস্থিত মানুষ সেই হাস্যকর মানুষটিকে দেখে তাদের মনগত অভিপ্রায় পূরণ হওয়ার (wish fulfilment) বিষয়টি লক্ষ করে খুশি হত— মনে হয়। কবির খেয়াল থাকেনি গাম্ভীর্যকরুণা-বেদনার সারাৎসার যাঁর। চরিত্রে, তাঁকে এমন উৎকট-হাস্যরসের মধ্যে নিমজ্জিত করলে শিল্পকলার যুক্তি রক্ষিত হয় না। মহাকাব্যিক রস পরিণতি ঘটতে পারত যার মধ্যে, তাঁকে বিপ্রদাস দ্বিধাগ্রস্ত বাতুল অকর্মণ্য জেদি ক্রোধী রুচিহীন এক মধ্যযুগীয় কুচক্রী ভূম্যধিকারীর ম-তা করে ফেলেছেন। চাঁদের লাঞ্ছনারআত্যন্তিক আবেগ ধীরে ধীরে চাঁদের মহত্ত্বকেও খর্ব করেছে— কবি বা প্রক্ষেপকারীদের সেই খেয়াল থাকেনি।

মন্তব্য

চাঁদ বনিক—বনের মধ্যে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাঠ সংগ্রহ করেছেন। মনসা অবশ্য ছলনা। করে নাগদের কাঠ হয়ে থাকতে বলেছিলেন। চাঁদজানতেন না, তিনি কাঠের পরিবর্তে নাগদের কুড়োচ্ছেন! (কাঠ বলি চাদো রাজা নাগেরে কুড়ায়।) তারপর সেই কাঠের-বাঝা মাথায়। তুলতে তঁর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, তিনি হতভম্ভ হয়ে গেছেন। মনসা তাঁর কাছে পাঠালেন ধামাইকে। ধামাই

নররূপী গিয়া তথা কাষ্ঠ তুলি দিল।

কুমোর পাড়ায় মাথার বোঝা নামাতে গিয়ে পড়ল 'হাড়ি-পাখই' এর উপর— সারিবদ্ধ হাড়িকুড়ি ভে চুরমার হয়ে গেল।

দশ বিশ হাঁড়ি ভাঙে কুমার কুপিত।

বাড়ি ধরি টানিয়া বেড়ায় চারিভিত।

চাঁদ পরম লাঞ্ছিত হলেন। ভয়ে ভীত কুমোরদের মেয়েরা তাকে সামান্য শুশ্রুষা করলেন। দিলেন চার পণ কড়ি। চাঁদ সেই কড়ি নিয়ে তাতির পল্লিতে গিয়ে কাপড়ের দরদাম করতে থাকলেন গরি পান কড়ি বস্ত্র মুলায় তখন। তাঁতিরা ক্রুদ্ধ। মনসা তখন কাষ্ঠরূপী নাগদের স্বমূর্তি ধারণ করতে বললেন

চারিভিতে নাগ দেখি কমার সভয়।।

বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়।

বাপে -পায়ে কুমারেরা রড়ারড়ি ধায়।

তাতিপাড়া নিকটে চাঁদোর লাগ পায়।

এই আস্তিকতা চাঁদের চরিত্রের ন্যায় নষ্ট করেছে বলাই বাহুল্য।

গোলহালদার, অরবিন্দ পোদ্দারের মতো কিছু কিছু গবেষক চাঁদ চরিত্রে খুঁজে পেয়েছেন শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের ছক। তাদের কথা সামান্য উল্লেখ করা দরকার। গোপাল হালদার লিখেছেন চাঁদের মধ্যে সামাজিক প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে আছে (Chandsadagar is an embodiment of social protest)—কারণ, তখন সমাজ সামন্তযুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন অতি সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তারা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ, অচেতন বিদ্রোহী। তাদের সেই গণ বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিকঙ্কাইে রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে, তাতে অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তি ও সমাজশক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসক শক্তির অঙ্গর সইতেও হত না। (গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা প্রথম খণ্ড; ৬০ পৃ:)। এই বিশ্লেষণ নিছক একমাত্রিক। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনায় তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' (Socialist Realism)-র সন্ধানে এমন অদ্ভুত বিচিত্র যুক্তিহীন আলোচনা খুব বেশি দেখা যায় না। যে চাঁদ সদাগর নিজেই একজন সামন্তপ্রভু দাসদাসী (অধিকাংশই ক্রীতদাস) পরিমণ্ডিত, পাত্র মিত্র সহযোগীতে ভর্তি, যার অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক আধিপত্য যথেষ্ট তাঁকে গণবিদ্রোহী বলে ভাবা নিতান্তই আরোপিত।

২.৫ সনকা

চাঁদের স্ত্রী সনকা বিষয়ে খুব বেশি কথা বলার নেই। সাধারণভাবে মনসামঙ্গল কাব্যে (এবং অনান্য মঙ্গলকাব্যেও) নারীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। সনকা সেই বেদনা প্রকাশ করার অন্যতম মাধ্যম। সনকার বেদনার প্রধান কারণ পরিবারে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বটে, কিন্তু দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। ক্ষমতার কেন্দ্রে নয়, পরিধি ঘেঁষে তাঁর অবস্থানস্বামী, সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনা ছাড়া তাঁর নিজস্ব কোনো আকাঙক্ষা নেই— সত্তা সেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দাবি, চাহিদা বা প্রয়াস নেই। জালু মালুর পরিবারের

বৈভবেব সংবাদ পাবার পর তার তথ্যসন্ধান এই উদ্দেশ্যেই। ঝাউয়া দাসীকে তিনি সংবাদ নিতে বলেছেন। ঝাউয়া সংবাদ এনেছে :

দেখিল বিচিত্র বারি জালুর মন্দিরে।

হরিষে মনসা পূঞ্জে নানা উপহারে।

জালু-মালুর জননী নিছনির কাছে এই অবিশ্বাস্য বৈভবের উৎসে যে-মনসাব্রত তার কার্যকারণ ও উদ্যাপন প্রণালী দেখে নিয়েছেন তিনি। সঙ্গে এনেছেন মনসার স্বর্ণময় ঘটবারি। তাঁর মনে সম্পদ-দানে সক্ষম দেবীর প্রতি ভক্তি জেগে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে এসময় তাঁর উপলব্ধি :

দেব নহে আপ্ত পরম ভক্তিবশে নিরন্তর

বিশেষে আপনি কর দয়া

স্বর্ণবরি প্রথমে দিতে চাননি নিছনি (মহা দুঃখ মনে গণিরাজরাণী কি করিতে পারি), পরে মনসা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন—

হরিষেতে দেহ দুই বারি।

তিনি ছয় পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে পূজা করতে লাগলেন। সহজ বিশ্বাসী, পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য তৎপর নারী সনকা কিন্তু তাঁর এই উৎসাহ চাঁদের ক্রোধে নির্বাপিত হয়েছে। চাঁদ মনসার ঘট ভেঙে ফেললেন। সনকা ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। তবে তখনও তার স্বামীর অমঙ্গল যাতে না হয় সে ব্যাপারে আন্তরিক শঙ্কা মিশ্রিত সক্রিয়তা দেখা গেল।

সনকার স্নেহার্দ চিত্তের আর একটু পরিচয় পাই মেনকা-রূপ-ধারী মনসাকে সামান্য কথায় ভুলে নিজের বোন বলে স্বীকার করে নেওয়ায়। স্বামীর কাছে গিয়েই তিনি বললেন : এই আমার ভগিনী/স্বামী এড়ি পলাইল আইল একাকিনী। অন্যত্র দেখিয়েছি, সেকালের অল্প বয়সে বিয়ের কারণেই এরকম কাহিনি গড়ে তোলা হয়েছে।

স্ত্রী হিসাবে ন্যূনতম স্বাধীনতা, সম্মান, মর্যাদা পাননি সনকা। তেমন কিছু চাহিদাও ছিল। স্বামী যখন মেনকার প্রতি কাম-মোহিত সনকা ডেকে বললেন :

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।

চাঁদের অসংকোচ কাম-প্রবৃত্তিকে সনকা সমালোচনা করার সাহস দেখাতে পারেননি। কেবল অসহায় এক বেদনা করুণ প্রতিক্রিয়া তাঁর-

কর্ণে হস্ত দিয়া রানী করে হাহাকার।

হাহাকার করা ছাড়া আর কী করার ছিল তাঁর! মনসা মেনকার ছদ্মবেশে যখন চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে নিলেন তখন চাঁদ মৃতবৎ হয়ে আর্তনাদ করতে থাকলেন। সনকা আর এক প্রস্থ। দুঃখ করলেন। তার ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল :

তখনি জানিনু তোমা সঞ্চরে বিপদ।

আপন কুবুদ্ধি হেতু মজাইলা সম্পত।

বস্তুতপক্ষে এক ঘোর পুরুষবাদী ব্যবস্থার মাঝখানে শাঁখের করাতের মন্ত্রে পরিস্থিতি হয়েছে সনকার। স্বামীর যৌন আকাঙক্ষার অন্যায়, নীতিহীন -লাভকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, আবার সেই লালসার ফল হিসেবে শক্তি-হীন মহাজ্ঞান-লুপ্ত স্বামীর জন্যই তাকে খেদ করতে হয়েছে। বস্তুতপক্ষে অনিশ্চয়তার সর্বাতিশায়ী বাধেই আক্রান্ত এই নারী। সংসারে তার অধিকার নেই--- কর্তব্য আছে আর আছে প্রতিটি গ্রন্থি-পরিস্থিতিতে তীব্র বেদনা।

সর্বানন্দ, পুরন্দর, সুন্দর, বিদ্যানন্দ, নারায়ণ আর জনার্দন— ছয়টি সর্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র নিয়ে। ভরা সংসার সনকার। তাদের বিয়ে দিয়ে সুখে থাকার কথা। বধূরাও অবাধ্য নন। কিন্তু বিষ। অন্ন খেয়ে ছেলেরা এক সঙ্গে মারা গেলেন সনকা তা দেখলেন। তার স্নেহাতিরেককেও এজন্য অংশত দায়ী করতে পারি। বিদ্যালয় যাবার পথে দুর্বুদ্ধির বশে (কুবুদ্ধি লইয়া নাগ। চলিল সত্বরে') ফিরে এলেন তাঁরা মায়ের কাছে এসে খেতে চাইলেন।

মায়ের অগ্রেতে সভে কহে পরিহারে।

অন্ন খায়্যা যাব মোরা পড়িবার তরে ।।

চাঁদের অন্যায় ও তার ফলে নেমেসিস-কল্প মনসার সঙ্গে বিরোধ, মহাজ্ঞান হারানো, নাখরা বাগানের ধ্বংস— এগুলি সনকার অস্তিত্বের বাইরের দিকটি মলিন করেছে। অন্যপক্ষে ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছেন তিনি পুত্রদের সহসা মৃত্যুর ফলে। স্বামী চাঁদও কি কম নিমর্ম নির্মোহ? মনসার নিন্দা, মনসার প্রতি অন্যায় আচরণই এই দুর্ঘটনার উৎস, এরকম কথা বলে সনকা স্বামীর কাছে ধিক্কার ছাড়া কিছুই পাননি। চাঁদকে সনকা বলেছেন, তার দোষেই এই বিপত্তি :

মনসার নিন্দা শুনি রাণী বড়ো রোষে।

সর্বনাশ হৈল রাজা তার দম্ভদোষে।

হরিল ব্রহ্মজ্ঞান কুবুদ্ধি তোমার।

ধন্বন্তরি ধনা মনা মৈল ধুন্ধুমার!

দুঃখের দিনে স্বামীর অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সনকার সমালোচনাটুকু কিছুমাত্র গায়ে না মেখে। চাঁদ সদাগর বলেছেন— দৈবের কথা। তার ব্যাখ্যা দৈবই এই দুর্ঘটনার মূল কার্যকর শক্তি--

দৈবদোষে পুত্র মৈল কি করিতে পারি।

একটু আগেই কিন্তু চাঁদের ব্যাখ্যা ছিল : 'অন নহে মোর পুত্র লৈয়া গেল কানি। দৈব আর মনসা এখানে একাকার। মনসাই দৈব। চাঁদ সেই দৈবকে জয় করার আদর্শে আত্মদীক্ষিত। কিন্তু তার রুচি সর্বত্র খুব উচ্চ মনে হয় না। এই ব্যাখ্যার পরক্ষণেই তিনি সনকাকে আঁশ্বস্ত করেছেন এই বলে :

তোমা আমা কুশলে থাকিলে দুইজন।

দুই বৎসরের পরে হবে এক এক নন্দন। ।

স্ত্রী যে পুত্র-সন্তান জন্ম দেবার জৈবিক মাত্র, তার অন্য কোন সত্তা নেই, সত্তার স্বীকৃতি নেই— সম্মান নেই, চাঁদের উক্তিতে তার স্পষ্ট ঘোষণা। সনকার সন্তান-স্নেহ, মৃত সন্তানদের জন্যে তীব্র বেদনা, উপদেশ-পরামর্শ দানের কিছুমাত্র ভূমিকা চাঁদের কথায় আচরণে ধরা পড়ল । সনকার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

পুত্রদের মৃত্যুর কিছুদিন পর মনসার প্ররোচনায় চাঁদ (তিনি শিব রূপে স্বপ্ন দেখিয়ে উত্তেজিত করেছিলেন) চললেন বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। সনকা তখন সন্তানসম্ভবা :

পঞ্চম মাসের গর্ভ হইল উপসন্ন।

চাদো রাজা যুক্তি করে যাইতে পাটন।

সনকা চিন্তান্বিত- তিনি স্বামীর কাছে এসে তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেন। নৃপতি পাটন যায়। এমন উচিত নয়/বিধি-বাস হইল ঘটন। স্বামীকে নিরস্ত করার জন্য একটু কড়া কথাও বলেছেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা অনেকটা irony-র মতো শোনায় :

ছয় পুত্র ছিল তোর রূপে গুণে বিদ্যাধর

বধিলেন অন্নে বিষ দিয়া।

সকলি মনসা লয় তবু তোর নাহি ভয়

আসিবা সকল মজাইয়া ।।

ঘটনার গতি, কার্যকারণ সূত্র—- সবই জানেন সনকা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় সংসার চলে না। তিনি মনসামঙ্গলে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদমিত কণ্ঠস্বর। লোকধর্মানুসারে সনকা স্বামীর কাছে পত্র লিখিয়ে নিয়েছেন। তার অনুরোধে

লোক ধর্মাচারে পাছে হয় অপমান।

তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।।

চাঁদ তার অনুরোধ রক্ষা করলেন (পত্র দিলা চাদো রাজা লোকধর্ম ভয়')। যদি এই পত্র লিখিয়ে না রাখতেন তাহলে লখিন্দরের পিতৃত্ব নিয়ে সমাজে সংশয় উপস্থিত হতে পারত।

সনকার মধ্যে সংশয়-ভীরু, আশঙ্কা কাতর জননীর আর একটু রূপ লক্ষ করি লখিন্দরের। বিবাহ প্রস্তাবের সময়। তিনি বলেছেন :

শুনি সনকা বলে চাঁদোর গোচর।।

বিবা রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর।

না দিব পুত্রের বিবা থাকুক ঐমনে।

বলা বাহুল্য, অনেক ইচ্ছার মতোই সনকার এই বাসনাও চাঁদ উপেক্ষা করলেন। তবে সনকার স্নেহাতিরেক এই কথাটুকুর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।

বিয়ের আয়োজনে ছয়-ছয়টি অল্পবয়সী বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে সনকা অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। মঙ্গলাচার করেছেন এয়োতিদের ডাকিয়ে, রান্না-বান্নার কাজে লাগিয়েছেন বিধবা পুত্রবধূদের। বিদায়লগ্নে পুত্রকে কোলে নিয়ে সনকা যখন বলেন :

আমারা তোমা বহি দেখিতে আর নাহি

এই ত ভারত-ভুবনে।

তোমারো সবিচ্ছেদে তিলেক অপ্রমাদের

না জীব ক্ষেণেকে বিহনে।

তখন তা কেবল কথার কথা থাকে না। একমাত্র জীবিত পুত্রটির জন্য তার আশঙ্কা নিছক অমূলকও নয়। একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত একরাখা স্বামীর জেদ, অন্যদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বিধ্বংসী ক্ষমতার অধিকারী মনসার কুটিল অভাবিপূর্ব কার্যকলাপ—এই

দুয়ের টানাপোড়েন, মাঝখানে এক সাধারণ নারী সনকা। তাঁর আশঙ্কা—সবেধন নীলমণি পুত্রটিকেও বলি দিতে না হয়! | স্নেহকেই সনকা চরিত্রের আদি প্রণোদনা ও উপাদান বলে গণ্য করেছি। কালনাগিনীর বিষে। শেষতম বিধি লখিন্দরের মৃত্যু সনকার পক্ষে অসহ্য ঠেকেছে। তার হাহাকার :

কে মোরে ফেলিল বাঁধি এ শোকসাগরে।

কতেক পুত্রের শোক সহিব শরীরে।

তার ভাবনা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করবেন, তাহলে লখিন্দরকে তিনি যমপুরে গিয়েও পেতে পারেন! চাঁদকে এই পর্বে সনকা তীব্র ভৎর্সনা করেছেন। বিশেষত এমন দুঃখের। অবসরেও চাঁদ যখন তাকে বলেছেন

না কান্দ সনকা-গো কান্দিলে কিবা হয়।

এতদিনে ঘুচিলো কানিরে নাহি ভয়।।

আর কোন ক্ষতি করার বস্তু নেই যখন, তখন বিবাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিতান্ত অবোধের মতো কথা। চাঁদের এই উক্তি মহাপুরুষের হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সনকা তাঁকে সমর্থন করতে পারেননি।

কুপিল সনকা রামা চাঁদোর বচনে।

অধগতি হবে রাজা কুবুদ্ধি কারণে ।।

যদি তুমি পূজা করো মনসা কুমারী।

কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।।

এর উত্তর নেই। চাঁদ সদাগরের আদর্শের ভুবনে তিনি একা। সনকাও তাঁর সঙ্গী হতে পারেননি।

মন্তব্য

ঝাউয়াবতী সনকার কাছে এসে যখন বেহুলার ডোমনি বেশ ধরার কথা জানিয়েছেন, তখন সনকার মধ্যে বেদনার ঝংকার আর এক প্রস্থ প্রকাশিত। তাকে তিনি পুত্রবধূ বলে সনাক্ত করেছেন :

হা হা পুত্র বধূ বহি অন্যে নাহি মনে।

চিন্তিতে গণিতে অস্থি বিধিলেক ঘুণে ।।

হাড়ে ঘুন লাগার মতো কষ্ট তাঁর। আশঙ্কা, বেহুলা অন্য কোনা ডোম পুরুষকে গ্রহণ করে নিশ্চয় জাত খুইয়েছেন। আর প্রশ্ন তার ::

কোন বাঁকে পুত্র মোর দিলে ভাসাইয়া।

খুব স্বাভাবিক ভাবনা।

পুত্রবধূ বেহুলার সঙ্গে চাঁদকে মনসাপূজা করতে সনকা আর একবার সংকল্প উত্থাপন করলেন। সমবেত সেই নিবন্ধতিশয্যে চাঁদ যথেষ্ট দ্রবীভূত হয়েও বললেন--

পুত্রশোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে।

নেড়া ঝাউয়া দাসী বলে সনকার বুদ্ধে।।

ঠিক কথাই বলেছেন চাঁদ। তিনি বুঝতে পেরেছেন নারীদের সঙ্গে সংসার যাত্রার যে স্বপ্ন তার সত্য স্বরূপ, মাধুর্য সেই নারীদের মনেই যতটা উদ্ভাসিত হয়, ততটা আর কারও মনে জাগে না। সনকা যত সহজে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় দাসী ঝাউয়ার সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন, যত সহজে তিনি বোঝেন ছয়-বিধবা পুত্রবধূর নীরব বেদনার অকথ্য কথন, যে সহমর্মিতায় অনুভব করেন বেহুলার প্রতিশ্রুতির মূল্য ততটা তো চাঁদসদাগর বোঝেন না। সনকার চরিত্রায়ণে বিপ্রদাস বিরল সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

২.৬ বেহুলা

বেহুলার চরিত্রায়ণ-পরিকল্পনায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে আসে। পুরাণের একটি কাহিনির সঙ্গে বেহুলাকে যুক্ত করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে বিপ্রদাসের রচনায়। প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের কবিই এই পুরাকথার সঙ্গে বেহুলার যোগসূত্র রচনা করেছেন। ঊষাঅনিরুদ্ধ কাহিনি পুরাণে যেমন, বাংলার কোনো কবিই তেমন করে উপস্থিত করেননি। পুরাণেও ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনির বৈচিত্র্য প্রচুর ভেদ যথেষ্ট। বিপ্রদাসের রচনায় পুরাণ-প্রসঙ্গ উষাঅনিরুদ্ধের রূপান্তর গ্রহণের দৈব সূত্র রচনার কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত। মনসা বেহুলা ও লখিন্দরকে ইন্দ্র সভায় তালভঙ্গের অপরাধে সাময়িকভাবে অভিশপ্ত করিয়ে মর্তে নিয়ে আসছেন, এই সময় আত্মার অধিকার নিয়ে যমের সঙ্গে তার প্রাণান্তর দ্বন্দ্ব ঘটছে— যম হেরে ফিরে যাচ্ছেন, এরকম প্রসঙ্গগুলি এখানে বিস্তৃত আলাচনার অবসর নেই।

মনসা প্রতিশ্রুত হয়েছেন। বেহুলা চরিত্রে এই আরোপ তাঁর বহু বিশিষ্ট সংঘর্ষমান প্রয়াসের বাস্তবতা রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। জাতিস্মরতা আরোপিত হওয়ায় বেহুলার সক্রিয়তাকে মানবিক লক্ষণ না ভেবে দৈবী মায়া বলে মনে করার সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। বেহুলার মধ্যে এই উপাদানটিকে মধ্যযুগের আসর-সাহিত্যের প্রভাব বলে মনে হয়। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে স্বর্গ ও মর্তের দ্বৈততা, সমান্তরালতা লক্ষ করে এক ধরনের দোলাচলতা সৃষ্টি হতে পারে এরকম একটি সূক্ষ্ম জনমনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা এর আড়ালে কাজ করে গেছে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এই দোলাচলতা, সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাটিকে ভেঙে দিয়েছে। বেহুলাকে ভাটি গাঙে ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলার নদী-মাঠ-ভাটফুল স্বর্গের প্রতি উদ্যত হতে চেয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার পঙক্তিকটিতে এই ঊর্ধ্বায়ন (Sublimation-এর ইঙ্গিতটি বেহুলার ভাসান-যাত্রায় দেখতে পুচ্ছি! বেহুলার জাতিস্মরতার অহংকার বিপ্রদাসের রচনায় বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি।

মন্তব্য

মুক্তাসরোবরে সখীদের সঙ্গে নিয়ে জল তোলপাড় করে স্নান করছিলেন বেহুলা। তাঁর চরণের জল' ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে কূলে বসে থাকা মনসার গায়ে লাগে। মনসা তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। অভিশাপ দিলেন :

শাপ দিনু বিবারাত্রে খাইব ভাতার।

বিপ্রদাসের রচনায় এরপর দেখছি বেহুলার দুর্পিত উক্তি :

ভালো গালি দিলা অই আশীর্বাদ মোর।

তব শাপে কি হয় সহায় বিষহরি।

তাহার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসারি।

বাণসুতা উষা আমি অনিরুদ্ধ পতি।

পূজা প্রচারিতে পদ্ম জন্মাইল খিতি।।

এখানে একটি নতুন দোলাচলবৃত্তির ছাপ পরিকল্পিত হচ্ছে। বেহুলার চোখে মনসা এখানে দেবলোকের সত্তা, শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা নয়। শ্রোতৃমণ্ডলী আগেই জানেন মনসা জরী ব্রাহ্মণীর বেশে এসেছেন, বেহুলার সামনে কথা বলছেন। ফলে ধরে নিতে হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের মধ্যে দ্বৈততা সৃজনের উদ্দেশ্যে এই কাহিনি নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু এর ফলে বেহুলা চরিত্রের মানবিক গুণ গেছে কমে। সেখানে পড়েছে দৈবী সত্তার মা্েহ আবরণ।

লখিন্দরের পুনরুজ্জীবনের আগে-পরেও বেহুলার মনে তার পৃথিবীতে জন্মলাভের কারণটি মনে পড়েছে। ভাসান যাত্রার সময় কাকের মুখে বার্তা পেয়ে বেহুলার কাছে এসেছেন তাঁর ছয় দাদা। তারা তাকে থেকে যেতে বললে বেহুলার ব্যথিত চিত্তের উক্তি :

কি আর কহিব বাণী জন্মে জন্মে অভাগিনী।

এত দুঃখ করিল গোসাঞিও।

বিধির লিখন ছিলো সেই মাত্র সার হৈল।

ইহা বহি দরশন নাঞি।

এই গোসাঞি– ধর্ম ঠাকুর হলে যোগী সংস্কৃতির স্মৃতি চিহ্ন এখানে থাকতে পারে। অন্যপক্ষে হানি যদি নিছক বিধাতা হন, তাহলে জন্মে জন্মে অভাগিনী'র রহস্য ভেদ করা দরকার। মনসামঙ্গলের ভাবজগৎ বেহুলার বহুজন্মের বেদনার শেষে মুক্তি (মোক্ষপদ-লাভ)র প্রসঙ্গে কিছুনা, সাবিত্রীর সঙ্গে খুব চলে। সাবিত্রী যেমন স্বামীর মৃতদেহ আগলে রেখে যমরাজের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষায় বিজয়িনী, বেহুলাও তাই। মহাভারতের বনপর্বের। পতিব্রতা মাহাত্ম পর্বাধ্যায়ে' মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রীকে লাভ করেন সূর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর বরে। "তার তেজের জন্য কেউ তার পাণি প্রার্থনা করলেন না। অশ্বপতি তখন সাবিত্রীকে বলেন- 'কেউ তোমাকে চাচ্ছে না' আড়াল হয়ে যাওয়া ভাবসত্যে বিশ্বাসী ছিল। কিছু পরে এ নিয়ে বেহুলা-মনসার কথাবার্তা সামান্য রক্ষিত হয়েছে। চাঁদ সদাগরের কাছে বেহুলা আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :

তিন জন্ম দম্পত্য পদ্মার সেবা করি।

সতী পতিব্রতা পূর্ব জাতি না পাসরি।

পূর্বে বাণসুতা নাম, উষা তো আমার।

প্রভু অনিরুদ্ধ কামদেবের কুমার ।।

'পূর্বজাতি না পাসরি'—অর্থাৎ জাতিস্মরতার শক্তি থাকায় বেহুলার দৈবী মহিমা সহজেই স্বীকৃত হয়েছে। বিপ্রদাসের ভাষায় দেখছি চম্পা নগরীর সবাই স্বীকার করেছেন :

কোথায় সম্ভবে হেন অসম্ভব নরে।

লক্ষ লক্ষ মৃত জীব জিয়াইতে পারে।

আর এজন্য লিখেছি, বেহুলাকে এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম নীরক্ত মনে হয়।

মন্তব্য

চাঁদের পূজা প্রদানের পর বেহুলা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের পথে চলেছেন। মনসা পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁকে নিয়ে অন্তরীক্ষে তাঁর রথ চালনা করেছেন। লখিন্দরের মনে ছিল পূর্বকথা। বেহুলা তাকে বলেছেন :

তবে ত বেহুলা সতী নিভৃতে ডাকিয়া পতি

বুঝাইলা সকল কারণ। |

তিন জন্ম সেবা করি তুষ্ট কৈনু বিষহরি

মুক্ষপদ লভিব এখন

'মুক্ষবর' লাভ করা, সদাই অমর সঙ্গে মেলা'-র অধিকার পাওয়ার জন্য বেহুলা-লখিন্দর চলে গেলেন! তেজি মিছে মোহ মায়া' বললেন তারা। আকাশপথে যেতে যেতে বাপের অন্তঃপুরী' দেখতে পাবার পর মনসার কাছে প্রার্থনা করলেন বেহুলা

ক্ষেণেক বিলম্ব করো এই মোর বাপঘর

দেখি যদি দেহ গো মেলানি

প্রভুর সংহতি যাব। পরিচয় নাহি দিব

অবিলম্বে আসিব এখনি ।।

মনসা দুঃখিত-চিত্তে অনুমতি দিলেন। যোগী-যোগিনীর রূপ ধরে বেহুলা-লখিন্দর গেলেন | উজানী নগরে। বিহুল সুমিত্রার কাছে আত্মপরিচয় দিলেন

এই প্রভু লখাই বেহুলা আমি সেই।

তিন জন্ম মুক্ষপদ মনসা সেবই।

মুক্ষপদ পাইয়া স্বর্গে যাই পুনর্বার।

বিদায় হইয়া দুহে সভার গোচর।

মর্ত্য মায়ার মোহে আচ্ছন্ন যাঁরা, তাঁদের বেদনার সঙ্গে কোন পরিচয় বেহুলার ঘটেনি, এই ছকটি মেনে নিলে বেহুলাকে মানুষ বলে মনে হয় না। তিনি যাঁর ব্রতদাসী' সেই মনসা আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবী চণ্ডী যেখানে নিরতিশয় মানবী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন সেখানে। বেহুলার অতিমানবিক দৈবী রহস্যময় শক্তি আমাদের কতকটা বিভ্রান্ত ও অতৃপ্ত করে।

বিবাহরাত্রে মনসা রথে আরোহণ করে বেহুলা-লখিন্দরকে দেখতে গেলে তার নাগছত্র। দেখে ভয় পেলেন লখিন্দর। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চৌদিগে ভুজঙ্গে /লখাই দেখি তরাস'!

আতঙ্কে ঢলে পড়লেন লখিন্দর। বরের অবস্থা দেখে, সকলে ভয়কাতর বেদনাহত (বিবাহরাত্রে 'সর্পাঘাত হবার কথা সবাই শুনেছিল-- সুতরাং তাদের ভয় লখিন্দর মারাই গেছেন)।এই সময় বেহুলা মনসাকে কাঁতর প্রার্থনা জানায়-

পতি পত্নী তিন জন্ম পূজি বিষহরি।

তোমার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসরি।

নিজ দাসী পেয়ে এত নিদারুণ কেনি।।

জীয়াইয়া দেও প্রভু করুক ছায়নি!

নহে গলে তুলি দিবো রসান কাটারি।

জীবন তেজিব আমি তোমা বরাবরি

সত্যি রসান কাটারি দিয়ে যখন গলায় আঘাত করতে গেলেন (হইয়া উগ্রমতি গলায় দিতে কাতি) তখন মনসা 'মন্ত্রপুষ্পজল দিলেন। সেই পুষ্পজল ছিটিয়ে দেওয়ার পর লখাই-এর জ্ঞান ফিরে এল।

মন্তব্য

বিবাহ বাসরে একের পর এক নাগ পাঠাতে পারেন মনসা, তাই তাঁর মন্ত্রণা ও সক্রিয়তার বিবরণ দিলেন বিপ্রদাস :

ওথায় মন্ত্রণা করে বেহুলা রূপসী।

স্বর্ণ যন্ত্র লইলেক হড়পি সাঁড়াসি।

নাগ আসার সঙ্গে সঙ্গে বেহুলা তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। তাকে 'গৌরব করিয়া দুগ্ধ দিল বাটি ভরি। দুধ খাওয়ার সময় সুবর্ণ সাঁড়াসি', দিয়ে মুণ্ড চেপে ধরে হড়পিতে রেখে দিলেন। এইভাবে চারটি নাগকে বন্দী করলেন বেহুলা :

এ সময় বেহুলা অবিচলিত। জনক সাহেকে বললেন--- এই মনে থাকো সভে মনস্থির হইয়া। নিজে " বের হলেন মনসাপূজার স্থানে। মনসাকে কাতর প্রার্থনা তার—

চারি গোটা নাগ বন্দী করে চারি পরে।

মনসা তখন উজানি নগরে নিজেই গিয়ে হাজির হলেন। বেহুলা চাতুরি করে প্রত্যেক ঘরে মনসার বারি রাখার ব্যবস্থা করেছেন, দেখে তাদের উপর মনসা ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না নাগদের সকাল হবার পর বেহুলা ছেড়ে দিলেন। বিবারাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু হল হল না লখিন্দরে।

লোহার বাসরে লখিন্দর-এর সহসা ক্ষুধা উদ্রিক্ত হল। লখিন্দর বেহুলাকে রন্ধন করতে বললেন (গুন রামা করহ রন্ধন')। লহুঘরে' কেমন করে অনুচরী" ছাড়া রান্না করবেন। তা ছাড়া :

কোথা পাবো কাষ্ঠজল হাঁড়ি চালু আনল

তিহড়ি কাটিতে নাহি স্থান।

নিশি ঘোর অতিশয় উপসন্ন কেহ নয় ।

কোন মতে করিব রন্ধন।।

লখিন্দরের পরামর্শ— মঙ্গল 'হেমহাড়ি'তে চাল আছে, পুরাতন বস্ত্র চিরে ধৃত সমযোগ করে নারিকেল দিয়ে তিহড়ি করতে হবে। নারিকেলের জল দিয়ে রান্না করলেন বেহুলা। সানার থালায় অন্ন ঢেলে খেতে দিলেন তিনি। লখিন্দর কিছু খাবার রেখে দিলেন; ইচ্ছা-

শুন সুবদনি লও। এই অন্ন তুমি খাও

বিশেষ আমার যত্ন তোরে।

বেহুলা সেই খাবার খাননি। বলেছেন— 'আছে কিছু অনুমানআজি যত্ন না করিয় মোরে। বেহুলার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে উজ্জ্বল করেছে।

লোহার বাসর ঘরে লখিন্দর বেহুলার রতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু কালিনিশা' থাকায় বেহুলা লখিন্দরের প্রার্থনা পূরণ করেননি। তার অনুনয়--

না করি যত্ন প্রভু আজি যুক্ত নয়।

জানালেন তিনি জন্মে জন্মে পতি তুমি আমি ত রমণী। সুতরাং আজকের পর তিনি নিশ্চয় তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন। মনসাকে সেবা করার জন্যই তাঁদের জন্ম। আজকের রাতে অন্যায় আচরণ না করাই বাঞ্ছনীয় (না কর পাষণ্ড প্রভু বিঘ্ন পাছে হয়)। আত্মসংযত বেহুলা এসব স্থানে শুধু সক্রিয় নন, তাঁকে লখিন্দরের চেয়ে অনেক পরিণত মনে হয়।

প্রত্যুৎপন্নমতী, সচেতন, সংযত, ভক্তিমতী বেহুলার ভাসানযাত্রা বাংলার সংস্কৃতি-জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই ভাসান যাত্রাক মধ্যযুগে নারীর আচরণের আদর্শ রূপে উপস্থাপিত করেছেন কবিরা। সে আদর্শের লক্ষ্য স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে শেখা। বস্তুতপক্ষে এই পুরুষপ্রধান। ব্যবস্থায় সতীত্বের আদর্শের প্রতীক হয়েছেন বেহুলা। তার ভাসান যাত্রা নিষ্ক্রিয় এক খেয়ালি পুরুষের মৃতদেহ বহন করে ভেসে যাওয়া, কৃত্রিম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সতীত্বের পরীক্ষা দেবার সক্ষমতা হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলার নারী সমাজের

কাছে বেহুলা শুধু আদর্শ (Ideal) নন, আদর্শের এক অতি উচ্চ মান (Standard) হয়ে দেখা দিয়েছেন, 'অজস্র বিপন্নতা পার হতে হতে যাকে দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধকাম হতে হচ্ছে। চরম বিপর্যয়ের মুখে যাঁর স্বামী-সংস্কার এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হচ্ছে না-- এমন এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম বেহুলাকে ঘিরে উত্থাপিত হয়েছে, যা আসলে বর্ণনীয় বস্তুকে স্মরণীয় করে— অপ্রাপণীয়কে আদর্শ বলে সঞ্চারিত করতে চায়।

একের পর এক বাঁক পার হয়েছেন বেহুলা। প্রত্যেক বাঁকেই দেখা মিলেছে দুর্নীতিগ্রস্ত, দুশ্চরিত্র, দুর্বার পুরুষ দল। তারা লোভ দেখিয়েছে ধন জন সম্পদের লোভ, আরাম আয়েসের লোভ শেষে ভয় দেখিয়েছে। বেহুলা যাকে যেমনভাবে পেরেছেন, নিরস্ত করেছেন।

১. ধনা পুলার বাঁকে 'জল কূলে'-র সব অধিকারী' ধনাকে প্রবোধ দিলেন বেহুলা আত্মপরিচয় দিয়ে।

২. 'গোদা বড়স্বর বঙ্কে জনার্দন নামক ব্যক্তি, যার দুই পায়েই স্থূল বা গোদ, চাঁদের শালা হওয়ায় বেহুলা তাকে মামা শ্বশুর সম্বোধন করলেন। তার কাছ থেকে কোনক্রমে মুক্তি পেলেন।

৩. জুয়ার বঙ্কে' এই জুয়াড়ি এক ব্যক্তি-জুয়া খেলাইতে তার মজিল সকল'। স্ত্রী-পুত্রকে জুয়ায় হেরে গেছে সে। বেহুলার অলংকার দেখে লোভ বাড়ল— ভাবনা তার, এই নারীকে পেলে স্ত্রীর অভাব দূর হবে আর সেই সঙ্গে ওই অলংকারের অর্থ দিয়ে জুয়া খেলা যাবে। বেহুলা তাকে সামান্য কিছু ধন দিলেন :

কিছু ধন দয়া করি দিল তোর দুঃখে।

উদ্ধরিয়া স্ত্রী পুত্র বঞ্চহ গিয়া সুখে।

জুয়াড়ি তাতে সন্তুষ্ট।

৪. ‘বড়সিয়ার বঙ্কে–করপদহীন পাপী এক পাষণ্ড! বড়সি ফেলে মান্দাস টেনে ধরায় বেহুলা তাকে অভিশম্পাত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, টান মেরে নাবালে ফেলে দিয়েছেন বেহুলার শাপে গোদা নাবালেতে ওলে। জলে নাকানি চুবানি খেয়ে বেহুলার স্তব করল সেই ‘বড়সিয়া। বেহুলার বরে তার গোদ দূর হয়ে গেল। প্রকৃতির প্রবাহে প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেন বেহুলা। লোভী দুশ্চরিত্র লম্পট ছাড়াও পথে আছে পশুপাখি। শুরুতেই মনসা কাকের রূপ ধরে এসেছেন। বেহুলা তাঁকে অঙ্গুরী। খুলে দান করেছেন- উজানি নগরে পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠাতে বলেছেন। এরপর বেহুলা এলেন সেইখানে যেখানে গৃধিনী শকুনি পাখি রয়েছে। ভয়াবহ ভয়ংকর তারা।

মৃত নর গন্ধ মাত্র দুই পক্ষ পায়।।

পাখে আচ্ছাদিয়া তারা মাজষ রহায়।

তাদের হাত থেকে স্বামীকে কোনক্রমেই রক্ষা করতে পারলেন না। তীক্ষ্ণ রসান কাটারি’ দিয়ে আত্মহননে উদ্যত হলেন তিনি ।

মনসা চিন্তিয়া রামা গলে দিতে কাতি।

রথ ভরে অন্তরীক্ষে আইলা পদ্মাবতী।

মনসা শকুনি গৃধিনীদের সরিয়ে দিলেন।

এবার এল শার্দুলের বঙ্ক। বাঘের ডাক শুনে বেহুলা লখিন্দরের শব কোলে নিয়ে মূর্ছিত হলেন। বেহুলার ডাক শুনে মনসা ব্যাঘ্র মুক্তি ঘটালেন--

ধরিয়া ব্যাঘ্রের পুচ্ছ ফেলিল আকাশে।

বাঘের বঙ্ক পার হবার পর এল বুড়নিয়া বঙ্ক। মধ্যগঙ্গা চাণকের গঙ্গ। ছদ্মবেশী যোগীরা সেখানে নৌবহর ডুবিয়ে দেয়। এরা আসলে জলদস্যুর দল :

ললাটে উজ্জ্বল ফোটা কান্ধ শোভা যোগ পাটা

পদ্মবীজে জপমালা করে।

মিছা মন্ত্রজপ করে গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে

নিশি হইল দুষ্টু বিত্তি করে

তারালবদ্ধ হয়ে বেহুলার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হল। বেহুলা প্রার্থনা করলেন মনসার উদ্দেশে। মনসার মায়া-ধন্ধ/বুড়নিয়া হইল অঙ্গ'– মনসা এইভাবে বেহুলাকে মুক্ত করলেন।

এবার অনন্ত অসীম সমুদ্র—'চৌমুখে বেহুলা রয়্যা/কান্দে পথ না পাইয়া। নেতা ধোপানি তার কাছে এসে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের সঙ্গে মর্তের আসরের এমন যোগ সূত্র বেহুলার মান্দাস যোগে তৈরি হল। এ-স্বর্গ জলাভূমি-খাল-বিল-নদী ও নয়নজুলির আড়ালে জেগে ঝকা থই থই কৃষিক্ষেত্রের সামান্য দক্ষিণে। বেহুলা চরিত্রের সক্রিয়তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বামীমের অপার্থিব আদর্শে, কৃচ্ছসাধনের অতুলনীয় সামর্থ্যে এই স্বর্গ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতেই রচিত হয়েছে।

ড.মহুয়া মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় নৃত্যের সন্ধান করেছেন জয়দেবের গীত-গাবিন্দ প্রভাবিত - স্থাপত্য, টেরাকোটা আর প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোক সমুচ্চয়ে। যদি তিনি মনসামঙ্গলের পাঠ গ্রহণ করতেন কিছু সূত্র নিশ্চয় পেতেন। স্বর্গের নর্তকী বেহুলা মান্দাসেই নিয়ে এসেছিলেন রত্ন অলংকার। সেগুলো পরে নিলেন তিনি-- পরলেন ঘাঘরা আর নূপুর। মৃদঙ্গ বাজিয়ে নিজেই গান গাইতে গাইতে নাচলেন তিনি ।

আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে।

সুতাল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গ ভঙ্গে ||

তাঁকে দেখে দেবসমাজ মুগ্ধ-

রূপ বেশে মোহিত অমর সুর মুনি।

সব থেকে পীড়িত হলেন শিব। তিনি কামমোহিত বিহ্বল হলেন। তার কথা :

দেখিয়া যৌবন তোর কাম-সাগরেতে মোর

ডুবি মন হইল বিকল।

পশুপতি তারে বলে নহে প্রাণ কামানলে।

কৃপা করি হও অনুকূল।

শিবের নির্লজ্জ কামনাতুর রতিলাভ তার শিষ্য চন্দ্রধর আর শঙ্কর ধন্বন্তরির মতই। কামুক পুরুষের লাভ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা বেহুলার যথেষ্ট। এখনও তিনি নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করলেন। তার কথা—

ক্ষেম অপরাধ মোরে করো পুটপাণি।।

মনসার বরদাসী তোমারো নাতিনী ।।

শিব তুষ্ট হলেন— তিনি এবার বেহুলার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য মনসাকে আদেশ দিলেন। বোঝা যায় মর্তের বাসর থেকে শুরু করে স্বর্গের নৃত্য-মঞ্চ কোথাও বেহুলা রতি-লোলুপ পুরুষদের নজর থেকে মুক্ত হননি কেউ তার স্বামী, কেউ মামাশ্বশুর, কেউ পথের গুণ্ডাবিশেষ, কেউ দেবাদিদেব। সতী সাধ্বী এক নারীর চারপাশে কামাতুর এই পুরুষ শক্তির মাঝখানে বেহুলাকে ক্ষুরধার সত্যের পথে থাকতে হয়েছে। কেউ তার উপর উপগত হতে পারেনি। ভাবলে অবাক লাগে, সতীত্বের এই আদল (model)-টি বাংলার মনসামঙ্গলের কবিরা গড়ে তুললেন কীভাবে! সব নারীর তো বেহুলার মতো দৈবী মায়া, অভিশাপ দেবার ক্ষমতা, সহযোগী দেবীদের সাহায্য জুটবে না। যাই হোক, রূপকথাধর্মী এই কাহিনিতে বেহুলা উত্থাপন করেছেন মডেলটি বাংলার সাধারণ মানুষ এই অপ্রাপণীয় আদর্শটিকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। বেহুলা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুরাণ-প্রভাবহীন পুরাণ ধর্ম উপস্থাপনের আশ্চর্য নির্মাণ। হয়ে উঠেছেন।

স্বামীকে ফিরিয়ে এনে বেহুলা সরাসরি শ্বশুর বাড়িতে স্ববেশে যাননি। একটু তামাসা কৌতুক করতে চেয়েছেন। সেজেছেন ডোমনি। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র উপকূলের লোকাচার, মালদহের একটি জনগোষ্ঠীর কৃত্যের কথা স্মরণ করা যায় ; উপযুক্ত অবসরে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা বলতে চাই উক্ত বেশ ধারণের অন্য কোন তাৎপর্য কিছু আছে কি না। আমাদের মনে হয়—

১. বেহুলা দেখতে চেয়েছেন তাঁকে পরিবারের সদস্যরা কী চোখে দেখছেন। ছয় মাস ঘরের বাইরে একাকী কাটিয়ে আসা যুবতী বধূকে কে বিশ্বাস করবে! তাদের কথা কে মনে করেনকখবে! সুতরাং বেহুলার ডোমনি বেশ ধারণ পূর্বাগত কোনা কৃত্য (Ritual) হতেও পারে, কিন্তু এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও কিছু আছে।

২. লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যজনী গড়িয়ে বেহুলা ধনাঢ্য চাঁদ সদাগরের বাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশ করার কৌশল করে থাকতে পারেন। ধনী গৃহস্থ ভিন্ন ব্যজনী খরিদ করবে না কেউ। তা ছাড়া ব্যজনীটিতে বেহুলা লখিন্দরের জীবন কথাও চিত্রের সাহায্যে বলা আছে।

লখিন্দরের কাছে ডোমনি বেশ গ্রহণের অনুমতি চাইলে তার মনে সন্দেহ জেগেছে‘ লোক মুখে লজ্জা পাছে হয়তো আমার। উত্তরে বেহুলা বলছেন— রাজাকে ছলনা করে দেখব। এ ছলনার উৎসে কৌতুক থাকতে পারে। দুঃখের দীর্ঘ ভাসান যাত্রার শেষে সামান্য অবসর comic relief যাকে বলে, পেতে চাইছেন বেহুলা। শুধু তিনি নন, মধ্যযুগের আসরও সম্ভবত। বিপ্রদাস-পূর্ববর্তী ধারাবাহিক করুণ রসের পর এই অবসরটুকু ভেবে নিয়ে থাকবেন। হেলাকে দেখে ঝাউয়া দাসী অন্দরমহলে সনকাকে বলেছেন, বেহুলার মতো একজন এসেছে। ডেকে তাঁকে আনার পর যথারীতি সনার পুত্রশোক দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি হাহাকার করছেন। বেহুলা বললেন, তার ক্ষিদে পেয়েছে। ('ক্ষুধায় জুলিছে মোর প্রাণ')। শাশুড়ির মন বোঝা হল। এবার চললেন বেহুলা- স্বামীর কাছে। বেহুলার উপস্থিত বুদ্ধি ঘটনা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক দক্ষতা এসবের মধ্যে উপহার দিয়েছেন বিপ্রদাস। তিনি বেহুলা সম্পর্কে যখন লিখেছেন

ত্রিভুবনে কেবা পারে বলিতে মহিমা।

প্রতিজ্ঞা করিলা ধন্য বেহুলা উত্তমা ।।

তখন যথার্থ কথাই প্রকাশ পায় তার লেখনী থেকে। তার মন্তব্য— তব গুণে ঝুরিয়া মারিব সর্বজন। বেহুলার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালি নারীর স্বামী সংসার, পতির সুখে দুঃখে সঙ্গে থাকার বাসনা ও অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ বলে ধরা পড়েছে। বেহুলা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের যুগাতিক্রমী উজ্জ্বল এক রত্ন- তাকে কোন ব্যক্তি কবি সৃষ্টি করেননি, বেহুলা মধযুগের আসর সাহিত্যের স্বাভাবিক নির্মাণ।

২.৭ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কব্যে দেব চরিত্র গুলির পরিচয় দাও।

২। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে নর-নারী চরিত্র গুলির পরিচয় দাও।

৩। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার চরিত্রটি আলোচনা কর ।

২.৮ সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য
- বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল - অচিন্ত্য বিশ্বাস
- বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপালকৃষ্ণ বসু
- লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ - ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী।

একক ৩- মনসামঙ্গল ও পুরাণ

বিন্যাস ক্রম

৩.১ পুরানের নবমূল্যায়ন

৩.২ কাহিনীতে মন্ত্রজাতের গুরুত্ব

৩.৩ মনসা ও নেতাকাল্টের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব

৩.৪ সহেলা-পাতানো-নারীপ্রধান সমাজের ইঙ্গিত

৩.৫ মহাজ্ঞান – যোগ ও তন্ত্র সাধনার বিমিশ্র ধারণা

৩.৬ মনসামঙ্গলের পুরাকথায় পশুচারক সমাজের ভূমিকা

৩.৭ মনসা সম্পর্কিত মিথ বা পুরাকথা

৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

৩.১ পুরানের নবমূল্যায়ন

বিপ্রদাস পুরাণ-কাহিনি পুনর্গঠনের স্বাধীনতা নিয়েছেন। তেমনি দুয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি :

১. নহুষ রাজার যজ্ঞে প্রচুর ঘি খেয়ে ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য হয়েছিল, বিপ্রদাসের এই বিবরণ। পুরাণ-অনুগত নয় :

নহুষ রাজা যজ্ঞ কৈল মুষলধারে ধৃত দিল

অগ্নিমান্দি হইল ব্রহ্মার।

মহাভারতে অনুরূপ ঘটনা 'শ্বেতকী'-রাজার যজ্ঞের অনুষঙ্গে দেখা গেছে। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী। ধৃতপানের ফলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মার পরামর্শে অগ্নিকে খাণ্ডব বন দহন করে প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করতে বলেছিলেন। বিপ্রদাস এই পুরাণ-প্রসঙ্গের লোকায়ত ভাষ্যটি উত্থাপন করেছেন। ব্রহ্মা আর অগ্নি এখানে একাকার।

২. দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কাহিনি সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষিতে লিখেছেন বিপ্রদাস এ হল। 'দূঅজ মথন'। এর লক্ষ্য অমৃত নয়- বিষ। বাংলার লৌকিক জীবনে এ এক অভিনব পরিকল্পনা! কদ্রু-বিনতার কাহিনি, গরুড় ও নাগদের জন্মকথা- গরুড় ও নাগদের স্থায়ী বিরোধ, শেষে মাতা বিনতাকে মুক্ত করার জন্য গরুড়ের চেষ্টায় অমৃত কামনায় ক্ষীর সমুদ্র মন্থন! পুরাণের এই সুপরিচিত কাহিনিতে নানারকম স্তর আছে। বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্নভাবে এ কাহিনি উপস্থাপন করেছে। অমৃত সংগ্রহের জন্য গরুড় নানারকম চেষ্টা করেছে ইন্দ্রের শক্তি নির্জিত করেছে- বিষ্ণুর বাহন হবার অঙ্গীকার করেছে। সবার শেষে কুশ-স্থানে অমৃতভাণ্ড রেখে সর্পদের স্নান করে আসতে বলা হয়- অমৃতস্থানে কুশে জিহ্বা দিয়ে লেহন করায় সর্পরা দ্বিজিহ্ব হয়ে গেল— এ কাহিনি মহাভারতের।

এই কাহিনি বিপ্রদাস জানতেন। তিনি লিখেছেন গরুড়ের উক্তি- পূর্বকথা :

অমৃত রাখিয়াছিনু কুশায়াড় তলে।

ভক্ষণের কাজে নাগ আইল হেনকালে।।

কুশায়ে কামড় খাইল হইয়া অস্থির।

সে কারণে জিহ্বা তব হৈল দুই চির।

মধ্যপ্রাচ্যের লৌকিক মহাকাব্য (Oral epic) গিলগামেশের কাহিনিতে এর বিপরীত ধরনের পরিকল্পনা দেখা যায়। অমরত্বের সূচক লতা বহু কষ্টে সংগ্রহ করে, স্নান করে সেটি গ্রহণ

করার জন্য নদীতীরে রেখেছিলেন গিলগামেশ। সাপ এসে সেই অমৃতলতা খেয়ে যায়। ফলে মানুষ মরণশীল আর সাপ খোলস বদলায়—তারা মরে না! মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনি আর মহাভারত হয়ে বাংলার নিজস্ব পুরাণকথা- মনসামঙ্গল চিন্তাপ্রবাহের মিল ও অমিল দেখতে চাইলে আলোচনাকে বিস্তৃত করতে হবে। এখন শুধু উল্লেখ করছি গিলগামেশের সঙ্গে মনসামঙ্গল আর সেই অঞ্চলের বেশ কিছু দেবী-ভাবনার সঙ্গে মনসার মিল হয়তো-বা শুধুমাত্র আপতিক নয়। খুব প্রাচীন সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাবাহিকতা মনসামঙ্গলে আভাসিত হয়।

বরুণ অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। আবরণকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন। এই আলোচনার নির্যাস মনে রাখলে মনসা বারবার আকাশপথে ভ্রমণ করছেন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ঝড়বৃষ্টির প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন ইত্যাদি বর্ণনার সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। কালিদহে মনসার নাগরা আকাশ আবৃত করে রেখেছে। দুর্লভ কান্ডার জানিয়েছেন :

এই কালিদহ মনসার অধিকার।

ঝড়বৃষ্টি নহে শুন নাগ অবতার ।।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে বলা হচ্ছে- বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়' (ঋতং সিন্ধ-বা বরুণস্য যন্তি') কালিদহে চাঁদ সদাগরের নৌবহর জলে ডুবিয়ে দেবার সময় সমস্ত নদীকে ডেকে এনেছেন মনসা--

পদ্মার আদেশ পাইয়া বায়ুমতিমান।।

ভুবনের নদনদী সবে দিল টান ।।

বাংলায় মনসামঙ্গল অমৃতকে প্রধান না করে বিষকে প্রধান করেছে। বিষ দিয়ে বিষ শোধন- মৃত্যুকে অবলম্বন করে মৃত্যুকে জয় করার আকাঙক্ষা ও বিচিত্র রহস্যময় আচার অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন। বিষ অমৃতের বিপরীত একটি জাগতিক সংঘটন। একে প্রয়োগ করা হবে দু-ভাবে। শত্রুনাশ করার জন্য (মনসা হাসনহাটিতে বিঘতিয়াকে দিয়ে সম্পূর্ণ

উৎসাদন করেছেন তুরুকদের চাঁদকেও পুত্রহীন করেছেন কালি-নাগের দ্বারা)। অন্যপক্ষে এর দ্বারা শত্রু নয়, আত্মশোধন করা হবে। ধন্বন্তরীর অহংকারে এই চেষ্টা দুর্লক্ষ্য নয়। বিপ্রদাসের ভাষা :

সঙ্কের প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণাবত

গণ্ডুষ করিয়া পিয়ে বিষ।

ধন্বন্তরীর অন্য নাম শঙ্কর-ধন্বন্তরী। শিবও মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে বরণ করে, বিষপান করে বিষকে অতিক্রম করে যাবার দুর্জয় ক্ষমতা তার। এখানে বৈদিক সোম-প্রিয় দেবভাবনার বিপরীতে বেদ-বাহ্য শিবের সমান্তরাল উপস্থিতি।

অত্রির কাছে যোগশিক্ষা নিয়েছেন শিব। যোগরাজ তিনি। অসুর বাণ ও রাবণকে সমর্থন করেছেন নানা সময় শিবের ভূমিকা যজ্ঞবিরোধী অন-আর্য বা প্রাগার্য সংস্কৃতির বুনট (texture)-টি আমাদের সামনে নিয়ে আসে। পুরাণে আছে দেবাসুর অতিলোভে মন্থন করায় অমৃতের পর বিষ উগরে দেয়- ভীত-সন্ত্রস্ত ধরিত্রীকে রক্ষা করেন মহাদেব-বিষপ্রভাবে নীলকণ্ঠ হন। বিপ্রদাস পুরাণের এই কাহিনি দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন--তার সংযোজন (বস্তুত ব্যক্তিগত সংযোজন বলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কিছু নেই-মনসামঙ্গল কাব্যধারায় এই সংযোজক নানাভাবে দেখা গেছে) বিষের উৎসে বাসুকী নাগের পরিশ্রমকে চিহ্নিত করার মধ্যে প্রমাণিত :

সূচনা বিন্দু স্থির করা যাচ্ছে না বলেই এ কাহিনিকে আধুনিক অর্থে বৃত্তান্ত বা প্লট plot) গঠনের প্রক্রিয়ায় ধরা যায় না। এ হল মধ্যযুগীয় আখ্যান বা টেল (tale) জাতীয় রচনা। বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন কাহিনির মিশ্রণ, আপতন ও সংঘটন এখানে। মনসামঙ্গল কাহিনিতে বিষ বিদ্যকদের ভূমিকাও কিছু আছে, নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্বে বিষের উৎস কথাই প্রধান। কারণ তারা বিষকে সম্বোধন করে বিষক্রিয়া দূর করার চেষ্টা করে থাকে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বিষজর্জর। মহাদেবকে বিষক্রিয়া মুক্ত করার প্রয়াস হিসেবে মনসার মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ

করতে দেখি। সেখানেও বিষকে সম্বোধন করা হচ্ছে, আসলে বিষজর্জর মানুষের দেহকে শুদ্ধ করার বাসনা থেকেই যেন গড়ে উঠেছে এই মন্ত্রোচ্চারণ :

অহর্নিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে।

কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে ।

উক্ত মন্ত্রটিতে কাহিনির তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। ত্রিপুরকে দহন করার জন্য হরের কোপানল অসুর হত্যার পর আগ্নরূপে (বাড়বাগ্নি রূপে) পৃথিবীতে থাকা। পৃথুরাজের পৃথিবী দোহন করা ও নাগদের বিষদান, বিষের পাতালে স্থিতিলাভ | তৃতীয় স্তরে মনসার দেবীত্ব-বাসুকির কাছে বিষের অধিকার লাভ। তিনটি স্তরের শেষ স্তরটি বিপ্রদাসের কাহিনিতে আছে। বাসুকির মুখ থেকে লালা বের হওয়া ছাড়া বিষ-সংশ্রব সেখানে নেই। মনসা বিষলাভ করছে মন্থন থেকে। পৃথুরাজার দোহন নয়— শিবের নেতৃত্বে সমুদ্রমন্থন। শিবের কোপ— ত্রিপুরাসুরকে হত্যার কারণে জাত ক্রোধ নয়— এখানে হরের কোপ দেবাসুর আর মন্থন করতে চাইছেন না। মন্থনের কাহিনি নিশ্চয় পৃথুরাজার দোহনের কাহিরি পরবর্তী। অমৃতলাভের পর দ্বিতীয় মন্থনের কাহিনিও খুব সম্ভব পুরাণের সমুদ্রমন্থনের কাহিনির দ্বিতীয় পর্যায়ের সংযোজন। লক্ষ করার বিষয়, মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলিত কাহিনিসূত্রে উক্ত তিনটি স্তর (বিষের জন্ম সম্বন্ধী) প্রায় অনুপস্থিত বা প্রসঙ্গত উল্লেখ মাত্র। আর তাই, বলতে হয়—মন্ত্রজাত প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল কাহিনির সবচেয়ে প্রাচীন অংশ। এখানে কাহিনি আচরণের অঙ্গ বিষের মর্মকথা বিষনাশের লক্ষ্যে পরিচালিত। অর্থাৎ পুরাণ প্রসঙ্গগুলি প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে স্মৃতি চিহ্নিত হয়ে এসেছে এখানে। স্মৃতিগুলি জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন ক্রিয়া আর কৃত্যের। আর এভাবে পুরাণ কথার সঙ্গে লোককথার বস্তুত লৌকিক স্মৃতির বিমিশ্রণ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিপ্রদাসের, হয়তো সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যধারায় রচয়িতা ও গায়েনদের চেতনায় এই বিমিশ্রণ-- পুরাণের নব মূল্যায়ন ঘটিয়েছে।

৩.২ কাহিনীতে মন্ত্রজাতের গুরুত্ব

মনসা মঙ্গলের কাহিনী গড়ে উঠেছে মন্ত্রজাতগুলির মধ্য দিয়ে। ভাষা এখানে archaic ও stylized । এখানে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে মানুষকে বাচিয়ে তুলতে ।

১. শিবকে বাঁচানোর জন্য এ মন্ত্র উদ্ধার করছি -

অহর্নিশ খসে রস কিছুই না টুটে।

কোমল নবনি হেন বজ্র নাহি ফুটে ।।

দশমী দুয়ার প্রভু খসাও কপাট।

আসুক পবন হংস ভ্রমুক নিকট।।

২. কাজল্যা মালিনীর কাছে শর্ত করিয়ে মনসা দুই মৃত পুত্র–ধনা আর মনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন সেখানেও মন্ত্রজাত পড়ছেন :

ত্রিপুর দহনে হর অগ্নি উঠে চক্ষে।

দানব পুড়িযা অগ্নি পৃথিবীতে থাকে।

হর হর বিষ ধনা-মনা অঙ্গে হর।

বিষহরির আজ্ঞায় ঘায় মুখে মর।

সমুদ্রে জন্মিল বিষ কপিলার ক্ষীরে।

দেবগণ মেলি তাহা দিল বাসুকিরে।।

এই মন্ত্রে আরও কিছু পুরাণ প্রসঙ্গ। যেমন-

ক. বায়ু রক্তের পরশ পেলে প্রাণের জন্ম হয়। সুতরাং ধর্মের আজ্ঞায় বিষ ধ্বংস হোক।

খ. সমুদ্র মন্থনে বিষ জগদীশ পান করেছেন গণ্ডুষ করে। সুতরাং মনসার দাবি :

বাপে ঝিয়ে কহি তোর আদ্যের কাহিনী।

হরের আজ্ঞায় বিষ ঝাট হও পানি।

গ. কড়ু-বিনতার কাহিনি, গরুড় প্রসঙ্গ।

ঘ. সাগরের মধ্যে কুরল নামক মহাপক্ষী থাকে সেই পাখির নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'বিষ হয়ে কম্পমান। এই সংবাদ আদ্যনাথের। সুতরাং

কুরলের নামে বিষ ঘা মুখে নাই।

ঙ. কঙ্ক নামক পক্ষী আছে— সমুদ্রে আকাশমার্গে ভ্রমণ করে। তার স্পর্শ পেলেও 'বিষ কাঁপে থরথর। শুধু কী তাই-

তাহার পরশে ভস্ম হয়ত গরল।

কঙ্কের আজ্ঞায় বিষ যাও রসাতল।|

৩.৩ মনসা ও নেতাকাল্টের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, ধন্বন্তরির মধ্যে দিয়ে নেতা ধোপানির নিজস্ব একটি কাল্ট (cult) চালু হয়েছিল। মনসার পাশাপাশি এই দেবীভাবনা স্বতন্ত্র ছিল সমান্তরাল। আশুবাবুর ইঙ্গিত, এই সমান্তরাল দেবীভাবনা সম্ভবত মনসার চেয়েও প্রাচীন ও প্রভাবশালী ছিল। ধন্বন্তরির মৃত্যু নেতার কাপ্টটির স্থায়ী পরাজয় আর নেতার সখিত্ব এই পরাজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মনসার অধিকার বৃদ্ধির ইঙ্গিত। অবশ্য আশুতাোষবাবু এই বক্তব্য খুব যে প্রমাণ করতে পেরেছেন অনুমান তা নয়। তবে এক্ষেত্রে তার যথেষ্ট মৌলিক। আশুতোষ ভট্টাচার্যের যুক্তি ধারা সামান্য উদ্ধার করছি :

১. মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের.....কাহিনীর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনীর ধারা আসিয়া একসঙ্গে মিলিয়াছে। একটি কাহিনী শঙ্কর গরুড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদ সদাগর-

বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর এবং ইহার সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তীকালে চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে। (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; উক্ত.; ২৮৬ পৃ.)।

২. শঙ্কর গরুড়ীর কাহিনীর মধ্যে যে লৌকিক দেব চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহার নাম নেতা। শঙ্কর গারুড়ী নেতার শিষ্য এবং তাহারই বরে (মনসার বরে নহে) তাহার দেহ অজর ও অমর।' (ওই)।

৩. 'নেতাকে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বত্র রজক কুমারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য পর্যন্ত বলা হয়েছে, সে স্বর্গের দেবতাদিগের ধোপানী, সর্বত্রই তাহার রজক সম্পর্ক বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাহিনীর প্রচারের যুগে এই রজক কুমারী মনসামঙ্গল কাহিনীর একাংশে স্থানলাভ করিয়া মনসার সহচরী রূপে পরিচিতা হইয়াছে। মনে হয়, কোন রজকের বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞানলাভ করিয়া কালক্রমে সাধাকৃজনগণের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর, কারণ তাহা না হইলে মনসা চরিত্রের সর্বব্যাপকগ প্রতিষ্ঠার ওপর এই কাহিনীতে তাহার কোনভাবেই স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। চঁদ সদাগর বেহুলা কাহিনী প্রবর্তিত হওয়ার পর নেতা মনসার সহচারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মনসামঙ্গল কাব্যের সামান্য একটা অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া টিকিয়া গিয়াছে। মত তিনটি মৌলিক এবং একটি সিদ্ধান্তের অভিমুখী। তবে এই মতগুলির মধ্যে সংগতি বিধান করা একটি ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষে কঠিন। কোন রজক বিষবিদ্যক সম্পর্কে ভাবনায় নিছকই আশুতোষ বাবুর ব্যক্তিগত পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। একে সাহিত্যিক গবেষণা বলা করে না। নেতাকে রজক কুমারী বলার বিষয়গত তাৎপর্য আশুবাবু অনুধাবন করতে পারেননি।

মনসামঙ্গল কাহিনির নেতা-চরিত্রটি বিষবিদ্যককুলের অন্যতম নাথ যোগীদের আচরণের ফলাফল হতে পারে। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন ড. পীতাম্বর দাস বরথওয়াল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গোরখবাণী'তে আছে :

চন্দা গোটা খুঁটি করিলই সূরিজ করিলই পাটি। -

অহনিশি ধোবী ধোবই ত্রিবেণী কা ঘাটি।

মনসামঙ্গলের এই কাহিনি অনেকটাই পুরাণ-প্রভাবিত। পুরাণের সহায়তা বা ছায়া অবলম্বনে লৌকিক কাহিনির নতুন নতুন রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগে। এই অভিনব পুরাণধর্মী কাহিনিকে 'কিস্যা' বলতে চান আমার মেধাবী ছাত্র শ্রীমান বিশ্বজিৎ রায়। তিনি তার সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (ধর্মমঙ্গলের বিকল্প কিস্যা : শরণাগতের রক্ষা অথবা চাকরি বৃত্তান্ত'; শারদীয় বারোমাস'; দেখিয়েছেন ময়ূরভট্টের নামে চালু 'ধর্মমঙ্গল'-এর একটি গল্পে মহাভারতের শিবিরাজার কাহিনি কেমন করে মিশে গেছে। এখানেও কর্ণের কাহিনির স্পষ্ট ছায়া। মধ্যযুগের কাব্যকথা একক কবির রচনা নয়, সেসবের মধ্যে নানা--লাক পরম্পরার অবাধ গতায়াত। তবে মূলকে বাদ দিয়ে শাখা প্রশাখায় ঘুরে ফেরাতে আনন্দ থাকতে পারে কিন্তু সত্য সন্ধান করার জন্যে মূলকে বুঝে নিতেই হয়। তেমনি ভাবসত্য সন্ধান করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করছি মনসামঙ্গলের কাহিনির নেতা-সঙ্ক ধন্বন্তরির সম্পর্ক ও তার বিষাদঘন পরিণতিতে বাংলার আদিম সমাজের সাংগঠনিক সংবাদও কিছু বিদ্যমান। একে নিছক কিস্যা না বলে লোকপুরাণ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বোধ করি।

সঙ্ক-ধন্বন্তরির মৃত্যু ঘটবে কীভাবে সেই সংবাদ মনসা সহজে জানতে পারেননি। কাহিনির অন্যত্র নেতা মনসার কাছের মানুষ পরামর্শদাত্রী, বিদগ্ধ, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। নেতা মনসাকে কিছুতেই শঙ্করকে মারার পথ বাতলাননি। কারণ :

নেতা বলে করিব মনে ভয় করি।

ওঝারে ব্যাধিতে আমি যুক্তি দিতে নারি।

শঙ্কর হেন শিষ্য মোর নাহি ত্রিভুবনে।

গুরু হইয়া শিষ্যের মৃত্যু কহিব কেমনে।

আমা ছাড়ি শঙ্কু রায় নাহি জানে আর।

সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দিলাম তারে বর।।

আমার প্রতাপে ওঝা অমর অজয়।

প্রাণের অধিক আমার ওঝা শঙ্কু রায়।

কোপ কর তাপ কর যেব কর কর্ম।

তবু না কহিব ওঝার যে মর্ম।

এইখানে খুব স্পষ্ট নেতা ও মনসাকে কেন্দ্র করে সর্পবিদ্যক বা মহাজ্ঞান' সন্ধানী নাথ যোগীদের সাধনপদ্ধতির স্বতন্ত্র ধারা ছিল। দুই পরম্পরার সম্পর্ক খুব সম্ভব অমিত্র-সুলভই ছিল। কালক্রমে মনসার পরম্পরা প্রবল হয়েছে।

৩.৪ সহেলা-পাতানো-নারীপ্রধান সমাজের ইঙ্গিত

মনসাকে নারীকেন্দ্রিক অনেকটাই যেন matriarchal সমাজের স্মৃতি হিসেবে থেকে যাওয়া বাস্তব বলে মনে হয়। নৃতত্ত্বের বিবেচনায় matriarchal সমাজের অস্তিত্ব এখন প্রমাণ করা অসম্ভব। তাই একে matriarchal বা মাতৃ-গাত্রের সমাজ হিসাবে গ্রহণ করাই বিধেয়। যাই হোক, মাতৃ-গাত্রের রীতি হিসাবেই সম্ভবত সই পাতানোর ব্যাপারটি মনসামঙ্গলে এত বেশি। কমলার সঙ্গে মনসার সখী-সম্পর্ক তৈরি করা মনসামঙ্গলের অতি পরিচিত কাহিনির recurrent motif– এরকম আরও অনেক বার, বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। কমলার সঙ্গে সখী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে মনসার কৌশল ভুবন-মাহিনী রূপ ধারণ। তার রূপ দেখে ধন্বন্তরির শিষ্যরা ভুলেছে। সঙ্ক ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলা বলেছেন :

লিব তোমার দধি ভ্রম মায়াবেশে।

দধি ছলে ভ্রম কিবা রতির ব্যাসে।

বুঝিনু চরিত্র তোর চল লো রূপসী।

দধি-ছলে মায়াবেশে নগর ভ্রমসি।।

স্বনাম-শোনার সঙ্গে সঙ্গে কমলার মনসা সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ আপত্তি দূরে গেল--

নিজ নাম কমলা শুনিয়া কুতূহলে।

সহি সহি বলিয়া মনসা কৈল কোলে।।

এয়োতিদের ডাকা হল, নানা দ্রব্য বিশেষত ফুল এনে সকলকে সাক্ষী রেখে

পরম আনন্দে দুহে করিল সহেলা

সমনামীদের শত্রুতা এবং বন্ধুত্বের (এবং বন্ধুত্বের হলে শত্রুতার) চিত্র আমাদের মতে খুব প্রাচীনকালের kinship-এর পরিচয় বহন করছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার নগরভাংনি গ্রামের সখীর মেলা'র কথা হয়-তা অনেকেই জানেন। এই মেলাতে প্রতি বৎসর বারুণী স্নানের দিন ১৫ হইতে ২০ হাজার নরনারী জমায়েত হন, তন্মধ্যে অবশ্য নারীর সংখ্যাই বেশি। একই সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে :'মেলা স্থানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ও পুকুর আছে। দুই নারী বন্ধু শিবমন্দিরে একত্রে পূজা দিয়া পুকুরে নামিবেন ও হাতে পান, সুপারি ও বাতাসা নিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া একসঙ্গে ডুব দিবেন। স্নানান্তে পান, সুপারি ও মিষ্টি সমান ভাগ করিয়া খাইয়া আজীবন সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। ইহা হইতেই এ মেলার নাম হইয়াছে সখীর মেলা। মেলায় পুরুষরাও সখা সম্পর্ক গড়ে, তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। নারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এই মেলায় পুলিশের যোগান যথেষ্ট থাকে। এই অভিনব মেলাটির মধ্যে আমাদের সমাজের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন মেলে। সমাজে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকা সত্ত্বেও নারীরা এই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, আজ নিছক বৈচিত্র্যের দ্যোতক মনে

হলেও আদিতে এই সম্পর্কগুলি পুরুষ-প্রধান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত বলেই মনে হয় মনসামঙ্গলের সর্বত্রই এরকম ঘটেছে।

চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের সময় মনসা সনকার বোনের রূপ ধারণ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব- আধুনিক সময়ে একেবারেই অসম্ভব, অথচ এই রকম কাহিনি রচনা করেছেন মনসা-মঙ্গলের কবিরা। নিশ্চয় নিছক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে এ কাহিনি ফাদা হয়নি। সহসা শোনা গেল চাঁদের বাড়ির লাগোয়া রামেশ্বরের ঘাটে কাদছেন এক অপরূপ সুন্দরী। সনকা সংবাদ নিতে গেলেন— জানালেন সেই নারী তার পরিচয় :

জাতি গন্ধ বণিক মহেশ দত্ত পিতা।

মেনকা আমার নাম মাহেশ্বরি মাতা।

সনকা চাঁদের রাণী আমার ভগিনী।

পলাইল প্রভু মোরে রাখি একাকিনী।

অসম্ভব-অবিশ্বাস্য এই ঘটনা, কারণ বোন-বোনের রূপ ধারণ করে তার ঘরে যাচ্ছেন, আশ্রয় পাচ্ছেন। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হলে বোনে বোনে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই না ঘটলে এরকম ঘটলেও ঘটতে পারে। যদি ভাবা যায় দৈবীমায়, তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই!

মনসা সনকার বোন মেনকার রূপ ধারণ করে চাঁদের অন্দরমহলে ঢুকলেন! চাঁদ তাকে। দেখে কাম মোহিত হলেন :

মুনি মনোমোহন মনসা অঙ্গভঙ্গ।

কাতর নৃপতি অতি বাড়িল তরঙ্গ।

নিবারিতে নারে মন হইল অস্থির :

পাগল হইল রাজা আইল বাহির!

চাঁদের প্রস্তাব মেনকাকে ভোগ করবেন তিনি। শোনামাত্র সনকা কানে হাত চাপা দিয়েছেন। কর্ণে হস্ত দিয়া রাণী করে হাহাকার। সনকা এরপর মেনকা-বেশী মনসাকে গিয়ে বললেন-

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।।

মদনে কাতর হয়্যা তাহে আলিঙ্গন।

কেমন বলিব হেন ছার কুবচন ||

নিতান্ত অসংকোচে চাঁদের এই কুপ্রস্তাব দেওয়া, আর সরকার সেই প্রস্তাব নিয়ে বোনের সঙ্গে কথাবার্তা বলা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। হতে পারে, সমাজের ব্যবস্থা তখন শিথিল ছিল কিংবা দেবী মনসার কাজ বলে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। অথবা এ হয়তো ছিল যোগ সাধনায় শৈব বিবাহের মতো কোন প্রক্রিয়া। যন্ত্রে সাময়িকভাবে কাম-পারদর্শিনী নারীকে বসানোর বিষয়টি বর্তমান কাহিনি গড়ে ওঠার সময় সমাজে চালু ছিল-- এমনও হতে পারে। এ বিষয়ে একজন গবেষকের উক্তি স্মরণ করছি : 'কুল সাধনে নিজের বা পরের স্ত্রী আবশ্যক। (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি; আনন্দ প্রকাশনী; কলকাতা; ডিসেম্বর ১৯৯১; ১৫৩ পৃ.)। আমাদের সুস্পষ্ট অনুমান এরকম প্রক্রিয়ার অবসরেই মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ। করতে পেরেছেন। মনসা চাঁদকে রতি-আকাঙক্ষায় পীড়িত ও দুর্বল করে জেনে নিয়েছেন। তাঁর মর্ম :

যদি আমা প্রতি রাজা করহ কপট।

দিব সুরতিদান নহিব নিকট।

শেষপর্যন্ত জটা, সিদ্ধিঝুলি আর জয় পতাকা নিয়ে মনসা চলে গেলেন।

ধন্বন্তরির ক্ষেত্রেও কাহিনির কাঠামো একইরকম। কমলার সইকে দেখে ধন্বন্তরি কৌতূহলী হয়েছেন, তাঁর কামনা জেগেছে :

সহির যতেক রূপ ভাবিতে হৃদয়ে।

মদনে পীড়িত হৈল কামে প্রাণ দহে।

ধন্বন্তরির মৃত্যুর মর্মকথা জেনে নিয়েছেন মনসা কামনায় অধীর ধন্বন্তরির বিশেষ দুর্বল মুহূতে- তারই স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন। অর্থাৎ এখানেও পুরুষের প্রাধান্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নারীদের ব্যক্তিগত সইপাতানোর মতো একটি নির্দোষ সংস্কারকে ব্যবহারের মাধ্যমে।

মনসামঙ্গলের অনুরূপ প্লট গঠনের ইঙ্গিত বাংলার দুই প্রান্তে দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত হতে দেখেছি। দুটি অনুষ্ঠানই মনসাকেন্দ্রিক বলি-

১. বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামে দশহরার দিন অনুষ্ঠিত হয় গিন্নিপালন' উৎসব! সে অনুষ্ঠানে গ্রামীণ দেবী মনসার মন্দির থেকে গ্রামীণ বিবাহিত মহিলারা দল বেঁধে সারাদিনের জন্য দ্বারকেশ্বর নদীর চরে (চটাই'-নামক দুর্গম স্থানে গিয়ে অনুষ্ঠান করে। এখানে পুরুষরা প্রবেশ করতে পারে না। অনুষ্ঠানের মূলকথা-- মেয়েরা নিজেরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে বর ও বউ সাজে। রাম ও সীতা! গান গায়। সম্ভবত জুগুপ্সিত নৃত্য এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। (ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত : বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা; পুস্তক বিপণি; ১৯৮১, ৭৬-৭৭ খৃ.)। দশহরার দিনের আরও যে অনুষ্ঠানটি বিশেষ স্মরণীয়, তা হল— 'সই সয়লা বা সই পাতা-না। ড. সামন্ত লিখেছেন : স্বয়ং দেবী সই পাতাতে যান পাশের গ্রামে। গ্রামের নাম বিড়রা। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। এক তিলির মেয়ে সাধ করেছিল যে মা মনসার সঙ্গে সই পাতালে বেশ হয়। অন্তর্যামিনী মনসা বৃদ্ধা ছদ্মবেশে তার সঙ্গে সই পাতাতে যান। অবশ্য স্বয়ং মনসা যান না, যান "আসাবারি"। (ওই)।

২. ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত গোসাদেকপুর অঞ্চলের লোকজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার অনন্যসাধারণ উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম'-এর একস্থানে জালা বিয়া' নামে একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা পেয়েছি। ঠিক যেন গিন্নিপালন অনুষ্ঠান! একটু উল্লেখ করছি উপন্যাস থেকে : শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণও পড়া শেষ হইল। বেহুলা সতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণ রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারক চিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।'

৩. হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সয়লা' নামক উৎসব মনসা পূজার বিশেষ পদ্ধতি। একে কেন্দ্র করে মনসা পূজার পাশাপাশি সই পাতানো চলে। এই সব অনুষ্ঠানের আড়ালে বাংলার মনসামঙ্গল সংস্কৃতির সঙ্গে নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করি। সইসয়লা পাতানো তথা আনুষ্ঠানিক মিত্রতার প্রক্রিয়া (cereinonial friendship) বাংলার আড়াল হয়ে যাওয়া কোন প্রাচীন রীতি বলে মনে হয়।

বিষবিদ্যক সঙ্ক-ধন্বন্তরির মৃত্যু মনসামঙ্গল কাব্যে নেতা-মনসার কাহিনির আধুনিক ভাষ্যটি তৈরি করার ভূমিকা গড়ে তুলেছে। নেতা-র প্রাধান্য সঙ্কধন্বন্তরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই হারিয়ে গেছে। বিপ্রদাসের কাব্যে অবশ্য নেতার প্রসঙ্গ খুব স্পষ্ট করে দেখছি না। তার কাহিনি গ্রহণে সঙ্ক-ধন্বন্তরির আদি প্রসঙ্গটি অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে। সই

পাতা-নার বিষয়ে অবশ্য বিপ্রদাস কাহিনি-নির্মাণের জনম-নারঞ্জক ঢংটি রক্ষা করেছেন। সঙ্ক-ধন্বন্তরির প্রধান দুই নেতা-দেবীর গোরূপ ধারণ, বিষ-নিরাময় বিদ্যার আদি ইঙ্গিতগুলি বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবেই বলতে হবে নেতা (বা নিত্যা'-র আড়ালে মহাদেবীত্ব-ভাবনা বিমূর্ত হয়ে আছে।

৩.৫ মহাজ্ঞান – যোগ ও তন্ত্র সাধনার বিমিশ্র ধারণা

বিষবিদ্যা, বিষ গ্রহণ ও বিষ শোধনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র- যোগের মৌলিক বিষয়। এই বিষকে শারীরিক মৃত্যুবীজ বলে ধরতে হবে। সুতরাং শরীরের মৃত্যুবীজকে অস্বীকার করার সাধনা- মৃত্যুকে জীবনে ফিরিয়ে দেবার প্রয়াস যাদের, তাদের শক্তি-- মহাজ্ঞান। শরীরের অন্ধিসন্ধি জানা-- নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার চেয়ে মহাজ্ঞান আর কী? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বড়ো অংশ মহাজ্ঞান জা, মহাজ্ঞান রক্ষা, হারিয়ে ফেলা আর ফিরে পাবার কাহিনি। মীননাথ মহাজ্ঞান রক্ষা করতে ব্যর্থ বলেই তাকে কদলী রাজ্যে শাস্তি পেতে হয়; গোপীচন্দ্র যতক্ষণ হাড়িফার কাছে মহাজ্ঞান লাভ না করেন, ততক্ষণ তার ওপর প্রবল কষ্টের পরীক্ষা চলতে থাকে। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' হীরা নটী আর ধর্মমঙ্গল ধারায় গোলহাট পালায় সুরিক্ষার সাহায্য ছাড়া মহাজ্ঞান লাভ হয় না। লাউসেনকে বাঁধার উত্তর যোগান অবশ্য কপূর ধবল। লাউএর সাধনায় প্রয়োজন পড়ে সামুলা নামক উপাসিকার সক্রিয় সহায়তার। বস্তুতপক্ষে মনসামঙ্গলের উৎসটি বোঝার জন্য এই মহাজ্ঞান-প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে কাজ করে। মহাজ্ঞান যার অধিগত, তার ক্ষয় নেই। চঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান নাথ ঐতিহ্যের মতোই। স্বয়ং মহাদেবের দান। চাঁদের সাধের বাগান ধ্বংস করেছেন মনসা। একথা জানার সঙ্গে সঙ্গে নখরা বাগানে এসে হাজির হয়েছেন---

মহাজ্ঞান জপে মনে জয় নেত আচ্ছাদনে।

নিমিষে নাখরা জিয়াইল।

এই মহাজ্ঞান যতক্ষণ চাঁদের অধিকারে থাকবে, ততক্ষণ তার কোন ক্ষতি করা অসম্ভব। সুতরাং নেতার পরামর্শ :

নেতো বলে পদ্মবালি হইয় চাদোর শালী

ছলিয়া আনহ মহাজ্ঞান।

মহাজ্ঞানের দুটি চিহ্ন—১. জয়নেত; ২. সিদ্ধঝুলি। জয়নেত, অর্থাৎ জয়পতাকা; সিদ্ধঝুলি অর্থাৎ- জটা এবং অক্ষগুটিকা (বীজমন্ত্র পড়ার)। জটা মাথায় পরে অক্ষগুটিকার ঝুলি হাতে রেখে বীজমন্ত্রের সাধনা করে মহাজ্ঞান লাভ করতে হয়। বহু সাধনার ধন মহাজ্ঞান হারিয়ে চাঁদ সদাগর 'মৃতবৎ হইয়া কান্দে ডাকে আর্তনাদ।

মহাজ্ঞান আছে সঙ্ক ধন্বন্তরিরও। শতশিষ্যকে বিষ পুষ্প দিয়ে হত্যা করে যাবার পর মনসাকে নিন্দা করে ধন্বন্তরি মহাজ্ঞান প্রয়োগ করলেন :

শিরে জয়ন্তে ছিল তুরিতে বাড়ায়্যা দিল

ধনা মনা ধরে দুইপাশ।

শত শিষ্য বেঁচে উঠল। কমলার সখী সেজে কে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করে মর্ম জেনে নিলেন মনসা। তৎক্ষণাৎ মনসা উদয়কাল নাগকে নিয়োগ করলেন। (বিজয় গুপ্তের রচনায় আছে। শিবের তক্ষকের কথা।) উদয়কাল সূঙ্কের বক্ষে নির্ঘাৎ কামড় বসাবার পর মনসা মহান (জয়ন্তে সিদ্ধিঝুলি) হরণ করলেন। বোঝাই যাচ্ছে, মনসামঙ্গল আর নাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লৌকিক বিশ্বাস মোটামুটি এই রকম- মহাজ্ঞান যতক্ষণ সিদ্ধপুরুষের আয়ত্ত, ততক্ষণ কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। বিষবিদ্যা আর শরীরবিদ্যা যোগ ও তন্ত্র এই দুই সাধনার। ধারা এইভাবে মনসামঙ্গল ধারায় একাকার হয়েছে। কারণ বিষাধিকার দেহসাধনা- দেহের মধ্যস্থিত মৃত্যু-বিষকে নিয়ন্ত্রণ আরহ অনুশীলনের দ্বারা তা উৎপাদন করা— দুইয়ের ক্ষেত্রেই দেবী মনসা এবং তার সহচরী নেতার ভূমিকা চাঁদ সদাগর বা ধন্বন্তরির চেয়ে কম নয়। বাংলার প্রাচীন মূর্তিকলায় এর পরিচয় আছে। দেবীর হাতে পুথি আর অক্ষসূত্র-

মহাজ্ঞান। আর বীজমন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে। দেবী সরস্বতী বা মনসা, বৌদ্ধ দেবী তারাও হতে পারেন।

৩.৬ মনসামঙ্গলের পুরাকথায় পশুচারক সমাজের ভূমিকা

পশুচারণের কাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা প্রায় সমান সমান। পশুচারক পুরুষ আর পপাল ও দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী! এই ভাবসত্য কৃষ্ণকথায় চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। সুতরাং অনুমান করতে হয় পশুচারক সমাজের কাহিনিতে পুরুষ ও নারী উভয় দেবতারই প্রাধান্য। মনসামঙ্গল কাহিনিতে মনোরথের বীরত্বে মহাব্যাঘ্রের পরাজয় আরণ্যক জীবনের পরিমণ্ডল বদলে পশুচারকদের প্রাধান্যের ইঙ্গিত বলে মনে করি। তবে এর সবটাই প্রত্ন ইতিহাসের অঙ্গ নয়। দুবরাজ ব্রাহ্মণের গল্প--- নিতান্তই আধুনিক সমাজের বিষয়। ব্যাঘ্রের ডন্কুররা গিয়ে বসতি স্থাপন করল অরণ্যপ্রদেশে

গন্ধর্ব হইয়া বাঘ গেল ইন্দ্রপুরে।

যুদ্ধ জিনি মনোরথ গেল নিজঘরে

থাকিল বাঘের যুদ্ধ ঘুষিতে সংসার।

এবং

দুই গোট ছা তার পলায় তুরিতে।

সেই বাঘ সঞ্চার হইল অবনীতে ।।

এই মধ্যযুগের কবির কল্পনা। তবে কাহিনিটির উৎসে দুগ্ধ-সম্বন্ধী জনসমাজের চিন্তার ছাপ স্পষ্টভাবেই পড়েছে। কেমন করে, সেটা দেখাবার আগে বাংলার শৈব সংস্কৃতির সঙ্গে রাখালিয়া। (pastoral) কৃষ্টির সম্পর্ক কীভাবে পড়েছে একটু দেখা যাক।

বিনয় ঘোষ রাঢ় বাংলায় এক ধরনের লোককথার সন্ধান পেয়েছেন। স্থানীয় শিবমন্দিরগুলিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার আগে রাখালরা দেখত একটি সুলক্ষণযুক্ত গাভীর দুধ

কম হয়। কারণ সন্ধান করতে গিয়ে তারা লক্ষ করে গাভীটি বনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যায় আর তার বাট স্কেকে অ-ঝোর ধারায় দুধ বের হয়ে মাটিতে পড়ে। বলা বাহুল্য এই দুধ পড়ছিল অদৃশ্য কোনো শিব লিঙ্গে। তারপর স্থানীয় শিবের প্রতিষ্ঠা। বর্ধমান জেলার জনপ্রিয় শিবপূজার ক্ষেত্র জামালপুর গ্রামের 'বুড়োরাজ সম্পর্কে এই রকম একটি কিংবদন্তী আছে। যদু ঘোষ নামক গোপের শ্যামলী গাই-এর দুধ ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মতো ঝরে পড়া আর আধুনিক পুরোহিত বংশের আদি পুরুষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কার করার কাহিনি। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; বিনয় ঘোষ; প্রথম খণ্ড; প্রকাশ ভবন; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬; ১৪৩ পৃ.)। বিনয় ঘোষের মন্তব্য--- '-বোঝা যায়, একসময় রারে কোন প্রতিভাবান ব্রাহ্মণঠাকুর পরিপাটি করে' তথাকথিত অনুচ্চ সমাজের জনপ্রিয় গ্রাম দেবতাদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই কাহিনি তৈরি করেছিলেন। (সূত্র :ওই)। বস্তুত এই কাহিনি কেবল রাঢ়ে নয়— সারা দেশেই ছড়া-না! ব্রিটেন চতুর ব্রাহ্মণ থাকার কথা নয়। তবু জে. ওয়েস্টউড প্রদত্ত দৈবী সত্তার গাভীর কথা তৈরি হয়েছে কেন? বিচিত্র একদেশদর্শী মার্কসীয় বস্তুবাদের মতো এক বগা ধারণার বশবর্তী বিনয় ঘোষ এরকম ভেবেছেন। মন্বন্তরের সময় পাহাড়তলির পবিত্র গাভী সেখানেও সকলকে পাত্র ভর্তি করা দুধ দান করে। বস্তুত এসবই পশুচারক (Pastoral) বা পশুপালক (animal domercation)-এর সঙ্গে যুক্ত ভাবসত্য।

১. মেদিনীপুর জেলায় যোগীদের নিমন্ত্রণ করা হয় নতুন গোয়াল তৈরির সময়, গোয়ালের গরুদের মড়ক হলেও অনেক সময় যোগীসেবা করা হয়। সাধারণত রবিবার এই অনুষ্ঠান করা হয়। গৃহস্থ খাদ্যবস্তু দান করলে মাগী গোয়ালে উনুন গড়ে রান্না করেন'লোকচক্ষুর অন্তরালে তা শিবের নামে নিবেদন করে ভোজন করেন। ভুক্তাবশেষ গোয়ালের মধ্যেই রেখে দেন তারা। তারপর উনুনে ঐ ভুক্তাবিশিষ্ট রেখে মাটি চাপা দিয়ে-- 'যোগী তিনবার ডমরু বাজিয়ে পিছনের দিকে না তাকিয়ে ফিরে যান।

২. উত্তরবঙ্গে (জলপাইগুড়ি) এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে গোরক্ষনাথের পূজাও হয় অনাবৃষ্টি দূর করা ও গোসম্পদের রক্ষার উদ্দেশ্যে। মেদিনীপুরের শালবনী অঞ্চলে বহুদিন অনাবৃষ্টি থাকলে নাথ যোগীদের ডাকা হয়। তারা শিবলিঙ্গকে বাইরে এনে--- বংশদণ্ডের আঘাত করেন।'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত' নামক রচনায় প্রবাধচন্দ্র বসু-র সাক্ষ্য উদ্ধার করে ভবনাথবাবু এই সংবাদ দিয়েছেন।

শিবের বাহন ষণ্ড—তিনিই গোসম্পদের প্রজনন সংক্রান্ত দেবতা। তার ভক্ত গোরক্ষনাথ। নাথ যোগীদের সঙ্গে শৈব সংস্কৃতির যোগ প্রসিদ্ধ এখানে দেখালাম গো-সম্পদ রক্ষার বিষয়ে নাথ যোগীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বিনিময়ের সংবাদ ।

মনসামঙ্গল কাব্যে এইখানেই কপিলা-মনোরথ কাহিনির প্রাসঙ্গিকতা! মনসাকেও গো-রক্ষা। কারিণী ভাবা হচ্ছে। রাখালদের পালায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। কিছুটা পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনের নিজস্ব পুরাকথার উপাদান বিশ্লেষণ করে। 'মনসা বার বার গোপনারীর রূপ ধারণ করে প্রতিপক্ষকে ছলনা করেছেন গো-সংস্কৃতি, পশুচারক সংস্কৃতির সঙ্গে এই ভাবেও মনসামঙ্গলের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এ নিয়ে সামান্য কিছু উদাহরণ আনা যাক।

পুরন্দর ঘোষ বৃদ্ধার ছদ্মবেশে আসা মনসাকে তাঁর গোচারণদলের সব থেকে দুষ্ট গাভীটিকে দোহন করতে বলেছেন ; মনসা তখন মাইকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আলোচ্য গাভীটিকে স্থির। থাকতে বাধ্য করেছেন; আনা হয়েছে তার বাছুরটি :

ধামাই পাঠাইয়া দেবী বাছুর আয়।

নাগে দৃঢ় ছান্দিয়া ধরিল চারি পায় ।

এসময় পুরন্দরকে মনসা দোহন করতে বলেন--

দুইল অসাচ দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর।

নিমিখে চুপড়ি ভরি উঠিল সত্বর।

দেবী সেই দুধ ঊর্ধ্বমূখ হয়ে পান করলেন। ড. সুকুমার সেন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন— মনসা নাকি অধোমুখে দুধ পান করেছেন! ফল তার মনে হয়েছে মনসা কি সাপ? পাঠটি ভুল ছিল। দুধ। পান করে দেবী সৃছিদ্র চুপড়িটি ফেরত দিলেন ! অন্য রাখালরা সেই দুধ পান করল।

গো-সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে সাপের কাছ থেকে নানা রকম অসুবিধা হতে পারে! গোরুর দুধ খেয়ে যাওয়া নাগ সম্পর্কে কিছু কিছু লোক-প্রচলিত কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়। মনসাদেবীর। নাগাধিকার জনমানসে প্রচলিত হলে গোপসমাজ কর্তৃক তাঁর পূজা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে গণ্য হতে থাকে। পাশাপাশি জলের উপর মনসার অধিকারও জনমনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেজও রাখালরা মনসাকে শ্রদ্ধা করেছে বলে মনে হয়। বৃদ্ধা বিধবার বেশ ধরে মনসা নিজের পূজা প্রচলনের চেষ্টা করার সময় প্রথম দিকে রাখালরা তাকে মানতে চায়নি। তখন। তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাখালরা দেখেছে:

পদ্মার মায়ায় তথা নাবাল হইল।

জল পিতে সর্ব গরু নাবালে পড়িল।

গরুগুলো নড়তে পারছে না (নড়িতে চড়িতে নারে'-রাখালরা বিপত্তি থেকে মুক্ত হবার কামনা করল-

গরু বিমোচন করি দেহ শীঘ্র গতি!

আনসার কৃপাদৃষ্টি পড়ামাত্র—

আজ্ঞামাত্রে সর্ব গরু হৈল বিমোচন।

মনসা নিজেও গোপিনী সেজে শত্রু দমন করার জন্য বের হয়েছেন। আত্মপরিচয় দিয়েছেন— তাঁর পিতা মহেশ্বর ঘোষ, মাতা গৌরী, বা ওই রকম। নাটকীয় এই সমস্ত

অংশ— শ্রোতাদের মনোগ্রাহী হয়েছে নিশ্চয়। তবে এই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে গোপসমাজের সঙ্গে মনসার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। সঙ্ক-ধন্বন্তরির পাড়ায় গিয়ে মনসা পসার সাজিয়ে নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন:

দধি দুগ্ধ কে লইবে ডাকে উচ্চ করি।

তার দধির দাম অত্যন্ত বেশি (পঞ্চাশ কাহন কড়ি)— শুনে সঙ্কের স্ত্রী কমলা তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন :

এমত দধির মূল্য কভু নাহি শুনি।

লিব তোমার দধি ভ্রম মায়াবেশে।

দধি ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাসে।।

মনসা তাঁকে মধুর বচনে দ্রবিত করে, স্বামীর প্রশংসা করেছেন। কমলা তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছেন। মনসা পরিচয় দিয়েছেন :

মনসা বলে হাসি মায়ার প্রকার।

মহেশ্বর ঘোষ নাম জনক আমার ।

কমলা আমার নাম গৌরী জননী।

এই ত আমার খুড়ি বৃদ্ধ গোয়ালিনী।

কমলার সঙ্গে মনসার কথোপকথনের সূত্রে গোপ-সমাজের কিছু অন্তর্বাস্তব মেলে। মনসাকে রাত্রে থেকে যেতে বলেছেন তার রূপমুগ্ধ সঙ্ক ধন্বন্তরি---

আজি এথা বঞ্চি সানন্দে যাইয় কালি

মনসা জানিয়েছেন। তিনি রাত্রে ফিরলে ‘গতি খরতর স্বামী তাকে শাস্তি দেবেন! 'সঙ্ক ওঝ? তাকে নির্ভয়ে থাকতে বলেছে, কারণ 'সঞ্চ তাকে দিতে পারেন এমন বশীকরণ-সম্ভব বস্তু, যাতে

দাস মত তব স্বামী করাইয়া দিব।

কাজলা মালিনীকে দুলন করার জন্যও মনসার বেশ একইরকম--

'খেল দু দধি রচিয় সার।

চলিল শঙ্কর-সুতা মায়া অবতার ।।

কাজলার সঙ্গে পরিচয় দেবার সময় বলেছেন মনসা-- গ্রাম তাঁর সুগন্ধ, মাতা (গৌরী, পিতা মহেশ্বর ঘোষ; নাম কাজলা। শুনে কাজলা তাঁকে সই বলে গ্রহণ করলেন! ধনা-মনাকে। বিঘতিয়া দংশন করার পর “মনসা বললেন :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে

তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে।

বিদ্যা পরীক্ষা করার অনুমতি নিলেন।

সমুদ্র মন্থনের পরিস্থিতি রচনা করার সময় বিপ্রদাস দুধের সমুদ্রে এক টুকরো তেঁতুল পড়ে যাবার ঘটনা আর দই হয়ে যাওয়া সমুদ্র মন্থনের সময়কার সরঞ্জামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে গোপ কৃষ্টির পরিচয় কিছু অবশ্যই পাওয়া যায়। দুর্বাসার অভিশাপে টিয়ার মুখের তেঁতুল ‘আশ্চম্বিতে ক্ষীরোদে পড়িল। আর :

তেতুলিতে দুগ্ধেতে হইল এক ঠাঞি ।

ততক্ষণে মিলনে সকল হৈল দই

মন্থলের উপকরণ সংগৃহীত হল-- ক্ষীর নদী হল 'দধিভাণ্ড'; ঘোটাগড়ি হলেন 'পশুপতি স্বয়ং; মন্দার মন্থৰ দণ্ড', বাসুকি টানা দড়ি। ঘোটাগুড়ি অর্থাৎ গৌরিপট্ট সহ শিবলিঙ্গের ওপর রেখে মন্থন দণ্ড হারানে হল। বিষ্ণ কূপে পৃথিবী ধারণ করলেন। বস্তুত এই মন্থন বাংলার গোপগৃহের পর্ণছায়াতেই সংগঠিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

কপিলা-মনোরথ কাহিনির পাশাপাশি মন্থনের কাহিনি- পুরাণের বিশ্বজনীন কল্পনা (Cosinogony) আর লোকায়ন অর্থাৎ লৌকিক উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বিপ্রদাস। মনসামঙ্গল কাব্য এইভাবে revitalization-এর মারফত অগ্রসর হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাদেবীকে ঘিরে বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের সংবাদ পাই। একটি মেলার সংবাদ দিই, দইয়ের মেলা'! মুর্শির্দাবাদ জেলার ডোমকল থানার ভগীরথপুর গ্রামে জামাইষষ্ঠীর দিন প্রথম সন্তানসম্ভবা মহিলারা দই বিক্রি করতে বসেন। বিক্রেত্রী মহিলারাই দাম। নির্ধারণ করেন। ক্রেতারা দর কষাকষি করতে পারেন না। এই সময়! (পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা; দ্বিতীয় খণ্ড; ১০০-১০১ পৃ:; সম্পাদক : অশোক মিত্র; ভারত সরকারের জনগণনা দপ্তর)। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দধির দাম নির্ধারণ করেছেন মনসা স্বয়ং। সেকথা মনে পড়ছে। দেবী মনসার পূজা তিথি--- পঞ্চমী, 'দইয়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠীর দিনে।

৩.৭ মনসা সম্পর্কিত মিথ বা পুরাকথা

মনসার জন্মকথা মনসামঙ্গল-কাহিনির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরাকথা। এই পুরাকথা (myth) টিও বাংলার নিজস্ব। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে ভিন্ন ধরনের কাহিনি। সর্পভীত মানুষকে রক্ষার জন্য কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করলেন- মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে সৃষ্টি করলেন। মনসা কুমারী অবস্থায় শিবের কাছে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি শিখে নিলেন। (সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত পৌরাণিক অভিধান; উক্ত; ৪০৯ পৃ.)। জরৎকারু সম্পর্কে মহাভারতের আদিপর্বে আছে তিনি বাসুকির ভগিনী। সমনামীয় স্বামী তার--জরৎকারু।

মন্তব্য

মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা— এ অর্বাচীনকালের কল্পনাপ্রসূত— তখন তন্ত্র ও -যাগাচার সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যন্ত্রে দেবীর কল্পনা ও ভক্তের মনের মধ্যে দেবীর অনুভব-- এ সমস্ত পুরাকথার যুগের সৃষ্টি নয়।।

বাংলার মনসামঙ্গল ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মনসা শিবের স্খলিত বীর্যের পরিণতি। এ কাহিনি সমস্ত মনসামঙ্গলেই পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের কাব্যের একত্র কাহিনিটিকে সামান্য বৈচিত্র্য দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীদেবী নিজে কালিদহে বেলগাছ হয়ে উপস্থিত হন:

কালীদহের তীরে রহিল বিল্ববৃক্ষ হয়ে। বীর্যস্খলন হবার পর পদ্মপত্রে রাখেন শিব। সেই বীর্য ভক্ষণ করল 'মা' নামক পক্ষিণী। অসহ্য বোধ হল তার। ওই পদ্মপত্রেই উগরে দিল শিবের অক্ষয় বীর্য—

সহস্র নালে নামিলেক পাতাল ভূবন।

বাসুকি কুর্মের পরামর্শে নির্মাণিকে ডেকে কন্যার জন্ম দিতে বললেন। তাঁর রূপ হবে এইরকম:

চারিখান হস্ত দিবা তিন নয়ন।

শিবের লক্ষণ করি করহ নির্মাণ।

এত শুনি নির্মাণি হুঙ্কার মারিল।

ততক্ষণে পদ্মাবতী নির্মাণ হইল।।

হুঙ্কার থেকে জন্মদান নাথ যোগীদের সংস্কৃতির কথা স্মরণ করায়। 'গোরক্ষবিজয়'-এ আছে। 'আদি অনাদি প্রভ' বিষ্ণুর জন্ম দিয়েছেন হুংকারে :

হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হই (ল মুখে)

পূর্ববঙ্গের অধুনা আবিষ্কৃত নতুন (?) কবি রামবিনোদের মনসামঙ্গলে মনসার জন্মকথা সামান্য ভিন্নরকম, অনেকটাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারী।

—শিবের বীর্য এক হংস গ্রহণ করে; উগ্র বীর্য উদরস্থ করতে না পেরে মরে-- শিব তাকে বাঁচিয়ে দেন। পাখিটি শিবের বীর্য উগরে ফেলে। শিব সেই বীর্য মৃণালের মধ্যে রেখে দিলে তা সপ্তম পাতালে গিয়ে উপস্থিত হল।' কশ্যপ সেই বীর্য থেকে বেদ মন্ত্রধ্বনির সাহায্যে মনসার জন্ম দিলেন :

চন্দ্র সম্মুখে থুইয়া কশ্যপ মহামুনি।

সঙ্কল্প করিয়া কৈল চারি বেদধ্বনি।

সেহি চন্দ্রে হৈল মাংস পিণ্ডের আকার।

দেখিয়া সকল মুনি আনন্দ অপার।

উচ্চস্বরে করে মুনি চারি বেদধ্বনি।

চারিহস্ত ত্রিলোচন হৈল কন্যা খানি।

শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মিলা ব্রাহ্মণী।

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশে নারায়ণদেবের কাব্যের প্রভাব সীমার মধ্যেই রামবি-নাদ কাব্য লিখেছেন। তবে তার পুরাণ সচেতনতা যথেষ্ট ছিল। নির্মাণির হুংকারকে তিনি কশ্যপের উচ্চস্বরে বেদধ্বনিতে পরিণত করেছেন।

বিজয় গুপ্তের রচনায় হংস নেই— আছে পক্ষিণী। সে শিবের বীর্য পান করেছিল :

পদ্মপত্রে অক্ষয় ধন চমকিত ত্রি-লোচন।

পাখিনী দেখিল দূরে থাকি।

তৃষ্ণায় হইয়া অঙ্গ না বুঝিয়া ভাল মন্দ

জল জ্ঞানে পিল চক্রপাখী।

যেন মতে পিল জল টুটে আসে বুদ্ধিবল

সকল শরীরে অগ্নি জ্বলে।

অগ্নিরস বেগ পাইয়া ফেলিকেউগারিয়া

আবার থুইল পদ্ম দলে।

বিজয় গুপ্তের রচনায় পাচ্ছি মনসা নিজেই নিজেকে যেন সৃষ্টি করেছেন তিনি স্বয়ম্ভু কল্প :

পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্ধি,

পাতালে নামিল মহারস।

পাইয়া পাতালপুরী। জন্মিল নার্ণিনী নারী

দেবকন্যা দেখিতে রূপস।

এমনও মনে হয়, মনসা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই আট বছরের বালিকায় পরিণত হয়েছে :

মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরিষ।

তখনে হইল কন্যা অষ্টম বরিষ ।

ধারণা হয় এইখানে মনসার মধ্যে রাক্ষস-অনুষঙ্গ আছে। পার্বতীর বরের কথা পেয়েছি রামায়ণে-- রাক্ষসীদের গর্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসব আর প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা জননীর বয়স পাবে। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের এই মোটিফটি হয়তো মনসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এ শিবের বীর্যে মনসার জন্ম হলে মনসা, তার কন্যা। কোন-কোন মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে নিরঞ্জনের অবতার প্রতিনিধি ভাবা হয়েছে। রাঢ় বাংলার বহু স্থানেই ধর্ম ও মনসার মধ্যে সম্পর্ক আছে। বহু স্থানেই মনসা ধর্মের কামিন্যা'। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত 'ধর্মপূজা বিধি' প্রবন্ধে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখেছিলেন—ধর্মঠাকুরের বাহন উলুকের পূজার পর একসময় কামিন্যারা পূজা পান। অন্যতম কামিন্যা বিষহরী। বিপ্রদাসের রচনায় ধর্মঠাকুর সহসা এসে হাজির হলেন গঙ্গার কাছে— গঙ্গা ধবলমুখী হয়ে গেলেন। অথচ শিব তখন বল্লুকায় ধর্মেরই ধ্যান করছেন! শূন্যপুরাণ'-এ রহস্যের কোন ভেদ হয় কি না দেখি। সেখানেও আগমের পরিচয়ে দেখছি গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের রহস্যময়তা। বিপ্রদাসের কাহিনিটি যে খুব আধুনিক নয়— রামাই পণ্ডিতের এই রচনাংশ দেখলে বোঝা যাবে :

ধবল খাট ধবল পাট বল সিংহাসন।

হংশ রথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন।।

মহাদেব মহাদেব বোল্যা ডাকেন করতার।

গঙ্গা বলে কেবা ডাকে কোন জন বলরে ওঁঙ্কার।

তপস্থলে আছেন রাউ বোল্লুকার তিরে ।

আমি ত কেষোরি (= কিশোরী) হোঞা আছি হরের মন্দিরে।।

উঠিঞা ডাণ্ডাল্য গঙ্গা তেজিয়া আসন।

গোবাক্য (= গবাক্ষ) জালার পথে দেখিলা নিরঞ্জন।

অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল গঙ্গা ধবল আকার।

ঘুচাঞা দিলেন গঙ্গা কুঞ্জের দোয়ার।

[শূন্যপুরাণ : রামাই পণ্ডিত; ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। (২০১ পৃ.)

গবাক্ষ জানলা (ভক্তিমাধবের পাঠ 'গোবাক্য জালা') দিয়ে দেখামাত্র গঙ্গার অর্ধাঙ্গ ধবল আকার হওয়ার চেয়ে মুখ ধবল হলে বাস্তব হত। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্য পুরাণ'-এর ভাষা অবশ্য খুব পুরানো হতে পারে না। আগন্তুক শব্দ 'জানালা' -পার্তুগিজ

'ganella' থেকে এসেছে। অবশ্য ভাষা পুরানো না হলেও শূন্য পুরাণের বস্তু প্রাচীন হতে পারে।

পিতার বাক্যে তারা বিবাহের উদ্যোগ করলেন:

সুবর্ণের ঘট আনি স্থাপিলা তুরিত।

বসিলেন মনসা গোসাঞি বাম ভিত।

মনসার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না – ভীত-বিহ্বল মনসাকে দেখে শরীরের অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অংশের অর্ধাংশ দূরে ফেললেন— মনসা সন্তোষ হইল তাতে।

স্বলন হইল রেত। বদন হইল শ্বেত

নয়ান হইয়া গোলাগাল।

সুরতির শ্রমে মনসা নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন, ধর্মরাজ লজ্জা পেলেন (গোসাঞি মরমে লজ্জা পায়)। এবার ধর্মরাজ মারা গেলেন 'সড়াপচা' শরীর নিয়ে ভেসে গেলেন তিন পুত্রের কাছে। ব্রহ্মা তাকে চিনলেন না– বিষ্ণুও জলের হিল্লোলে তাঁকে ভাসিয়ে দিলেন। ব্যোমকেশ তাঁকে চিনে মড়া কোলে করে চললেন পাহাড়ে ক্রন্দনে আকুল হলেন। গোসাই তাকে দুঃখ করতে বারণ করলেন— এই উপায়ে তিনি মরণ-সৃজন করেছেন। তিনি তখন শিবের উদরে বাস করার অনুমতি চাইলেন :

মুখ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস।

মহেশ্বর বিভ্রান্ত। 'বাপু ইহা নাকি হয়'।

ধর্ম তাঁকে বললেন- এতে কোন সন্দেহই নেই--

তুমি আমি অর্ধঅঙ্গ হইব শূলপাণি।

মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী।।

কী আর করা :

বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।

প্রবেশ করিল ধর্ম অন্তর ভিতর ।।

মনসা তখন করুণা প্রকাশ করতে থাকলেন—

কুন অপরাধে মোর ছাড়্যা গেল পতি।

(জগজ্জীবন ; উক্ত; ১. ১. ১১-১৫৫; ৮ পৃ.)।

মনসা অনুমৃতা হয়ে আত্মবিসর্জন দিলেন। সতী হলেন, কিন্তু মরলেন না— মনসার পুনর্জন্ম হল :

চারিদিকে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।

অনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী।

অনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যাখানি।

জনম হইল কন্যা শিবের গৃহিণী।।

তিনভাই 'লোহার মঞ্জুসি'-তে ভাসিয়ে দিলেন সেই সদ্যোজাত কন্যাকে। সেই কন্যাকে সাগরে তপস্যারত হেমন্ত ঋষি পেলেন কন্যা পেয়ে খুশি তিনি। স্ত্রী মেনকাকে বললেন এই 'সোনার কমল' কন্যাকে পালন করতে হবে—'নগর-ভ্রমিয়া আস্য গর্ভ দেখাইয়া।' গেটে ধামা বেঁধে গর্ভলক্ষণ দেখিয়ে মেনকা নগর ভ্রমণ করে এলেন। শেষে এই কন্যা হলেন হৈমবর্তী গৌরী।

এই বিস্তৃত কাহিনির বহু অংশের তাৎপর্য (meaning) হারিয়ে গেছে। বাংলায় প্রচলিত মনসা-কাহিনিকে জগজ্জীবন ধরেছেন উলটো করে। ফলে আমাদের প্রচলিত মনসার জন্মকথা সম্পর্কিত সৃষ্টি-বিবরণের সঙ্গে এ কাহিনির সংগতি সাধন করা কঠিন। তবে এই

কাহিনির মধ্য থেকে মনসার পূজাচারের কিছু সুপ্রাচীন প্রত্ন ইতিহাসের উপাদান এখানে পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি একে একে লিখছি :

১, মনসা-র সঙ্গে নপুংসকদের সম্পর্ক কিছু থাকতে পারে। জগজ্জীবনের লেখায় তিনি মে নপুসংক— ধর্মঠাকুর তাঁর যোনিচিহ্ন নখর আঘাতে গড়েছেন। তার পরের ঘটনা থেকে মনে হয় ধর্মঠাকুর মনসার সঙ্গে মিলিত হবার সময় শরীরের অঙ্গচ্ছেদ (অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ/ফেলাইল অর্বখান/মনসা সন্তোষ হইল তাতে) করেছেন। এই বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যের নপুংসক-পৌরোহিত্য (mach-priestship)-এর ইঙ্গিত বহন করে। শ্রদ্ধেয় গবেষক ড. সুজিৎ চৌধুরীর কিছু রচনায় এই মতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' বিষয়টি নানা দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত হয়েছে। (প্যাপিরাস; দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৯)। বস্তুতপক্ষে নপুংসক পু-রাহিতদের সঙ্গে মনসা পূজার এর সম্পর্ক আছে।

২. মনসাকে ঘিরে বাংলার লৌকিক স্তরের যেসব কাহিনি গড়ে উঠেছে তাতে স্ববিরোধ আছে। কখনও মনসাকে আদিদেবী ভাবা হচ্ছে কখনও আদিদেবের স্ত্রী (ভগিনী → কন্যা স্ত্রী ভাবা হচ্ছে। পরক্ষণেই শিবের কন্যা ভাবা হচ্ছে, কখনও আবার স্ত্রীও ভাবা হচ্ছে। এই স্ববিরোধের মূল আদিম সমাজের kinship -এর বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কটানা-পাড়েন আর দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও মেলানস্কির মতো পাশ্চাত্য গবেষকরা।

৩. মাতৃস্থানীয়াকে কামনা বা মাতৃস্থানীয় চরিত্রের পুত্রস্থানীয়কে কামনা– ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কে বিবাহ মাতা কন্যার মধ্যে যৌন ঈর্ষা প্রভৃতির মূলে পরিবার সংগঠনের আদি স্তরের ছু সত্য থাকতে পারে। বস্তুত মনসামঙ্গলকে myth হিসেবে ব্যাখ্যার পেছনে এই কারণটি চিতভাবে বিচার করা দরকার।

৪. দেবী মনসা অযযানিসম্ভবা, স্বতন্ত্র-গম্যা, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভয়ঘর সম্পর্ক প্রভৃতির বিচিত্র ঘটনার বিবরণ আছে মনসামঙ্গলে। এই বিবরণগুলির মধ্যেও অর্থ-

টি বিশ্লেষণের কোন সূত্র থাকতে পারে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা খুব বেশি বে না। তবে এ নিয়ে আমার কিছু ছিন্ন লেখাপত্র আছে। ধীরে ধীরে এ বিষয়ে আমার একটি দাড়িয়েছে।

৫. দেবী মনসা ও তাঁর ব্রতদাসী বেহুলার কাহিনি শেষ পর্যন্ত জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জীবনের কনি— এই মৃত্যু ও পুনর্জীবনের কাহিনি কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে বিবেচিত হয় উচিত। Sir James George Frazer -এর গবেষণা ও অনুসন্ধানের সঙ্গে পরিচিত হলে

কাহিনির আদলটি সনাক্ত করা যায়। একে বলতে হয় শস্য-কর্ষণের আকাঙ্ক্ষা ফলনের প্রয় initiation বা প্ররোচনার প্রতীকী অনুষ্ঠান (Symbolic-rites) । দেবী মনসার মধ্যে মূলত জগতের অধিকার ও পাতালপুরীর বিভিন্ন শক্তি, black magic, witch craft প্রভৃতির ভূমিকা সূত্রেও ব্যাখ্যা করা যায় কি ন প্রথমে দেখতে হবে সেই সম্ভাবনার কথা। তখন মনসামঙ্গলের myth বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারবে।

W.L. Smith মনসার কাহিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তিনি মনসার উক্ত সমস্যাগুলি ঠিকমতো বুঝেছেন বলে মনে হয় না। তার বর্ণনা : ....When myth makers sought to associate newer deities with the cults of older ones by establishing familiarities, the newcomers were usually not presented as direct issue but as born in extracorporeal manner. The best known examples of this are the two sons of Siva and Parvati. Kartikeya and Ganesa, about whose miraculous births a number of myths have been recorded.' (One Eyed Goddes : Upasala, Sweden, 1980, 51 পৃ.) —নিছকই সহজ এই আলোচনা। এই আলোচনায় myth-maker -দের মধ্যে কে আগে কোন্ দেবতার সঙ্গে কার সম্পর্ক রচনা করতে চাইছেন, তার উদ্দিশ পাওয়া যায় না। অবশ্য পশ্চিমা গবেষকরা, তাদের তথ্য বিচার করার ক্ষেত্রে যতই চমৎকারিত্বের পরিচয় দিন তাদের রচনা শেষপর্যন্ত কোন

মৌলিক বিশ্লেষণের অভিমুখী না হওয়ারই কথা। আমাদের দেশজ পুরাকথা বোঝার জন্যে আমরা নিজেরাই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করবো না কেন?

এডয়ার্ড সি. ডিমোক বরং মনসামঙ্গলের তাৎপর্য বিচারের সূত্রটি যথাযথভাবে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখছেন-- 'Variation comes with the attempt to separate layer from layer of elements of myth.' (Manasa-Goddess of Snakes, E. C. Dimock, The University of Chicago, Committee of South east Asian Studies, Reprint Series no. 13 History of Religions, Winter 1961, 307পৃষ্টা) আমরাও মনসামঙ্গল কাহিনীর কিছু স্তরের পরিকল্পনা করতে পারি। আদিস্তরে মনসা আর নেতা ভিন্ন উৎস থেকে আগত দেবী হতে পারেন; পরে তারা একাকার হয়েছেন। মনসার উৎসে দুটি প্রবল সম্ভাবনা আভাসিত হয়।

১. যযাগ ও তন্ত্রের হুঙ্কার–নাদ— বায়ু সাধনার ইঙ্গিত।

২. আদিদেব আদি দেবীর পরিকল্পনা।

প্রথমটি বাংলার নিজস্ব ক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন এই দ্বিতীয় স্তরটিই আদি।

সান্ড্রা বিলিংটন ও মিরান্ডা গ্রিন খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির আগে সমস্ত ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের আদি দেবী (মহাদেবী তথা Great Mother Goddess) -দের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দেখানো হয়েছে এই সব দেবী প্রায়ই নারীপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক-পরিচয় বহন করছে। জুলিয়েট উডের প্রবন্ধে দেখছি : 'history and mythology reflect the 1996 conflict between patriarchal and matriarchal cultures coincides with an important stream in modern Goddess-studies." (The Concept of the Goddess; উক্ত ১০ পৃ.)। আদি রূপটি আড়াল হয়ে গেলেও প্রায়ই এইসব দেবী-ভাবনা নতুন সমাজ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে

নিতে অগ্রসর হয়েছেন। জুলিয়েট উড একে বলেছেন ‘revitalization। তার মতে এমনি করে নতুন নতুন বিষয়কে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই এইসব দেবতার ব্রতধর্ম সমাজক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে মন্ত্রজাতের গুরুত্ব লেখো।

২। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে পশুচারক সমাজের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা ও নেতাকাল্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেখো।

৩.৯ সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য
- বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল - অচিন্ত্য বিশ্বাস
- বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপালকৃষ্ণ বসু
- লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ - ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী।

একক ৪- মনসামঙ্গলের লোকাচার ও রীতিনীতি

বিন্যাস ক্রম

৪.১ মনসামঙ্গলের লোকাচার

৪.২ মনসামঙ্গলের বর্ননাভঙ্গি ও কথন রীতি

৪.৩ বিপ্রদাসের রচনায় বিভিন্ন কাল ও বর্গের সমাজ-বাস্তব

৪.৪ বিপ্রদাসের রচনারীতি

৪.৫ সমাজের বিভিন্ন বর্গ

৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৪.১ মনসামঙ্গলের লোকাচার

শিবকে ঘিরে বাংলার জনমানসে উর্বরতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার বিচিত্র আদি কল্প টুকরো ছিন্ন হয়ে আছে। মনসামঙ্গলে তার স্পষ্ট কিছু ছবি আছে। মথন পালায় শিব বিষপান করার পর মারা গেছেন। তবে ঘটনাটিকে মৃত্যু না বলে -যাগ ধ্যান বলেছেন বিপ্রদাস :

ভাবি জগদীশ গণ্ডুষিল বিয়

সব গেলি অভ্যন্তর

এ সমস্ত যোগীদের ভাবজগতের প্রতীক-ধর্মী পরিচয় বহন করছে। শিবের মৃত্যু নয় যোগসমাধি ঘটেছে বিষক্রিয়ায়। পরে মনসার মন্ত্রজাত শুনে শিবের যোগ ধ্যান ভাঙল।

পদ্মার আজ্ঞায় বিষ উঠে হর-মুখে।

সুবর্ণের থাল পদ্মা পাতিল সম্মুখে।

কিছু বিষ শঙ্করের থাকিল গলায়।

নীলকণ্ঠ হইলা গোসাঞি মৃত্যুঞ্জয়।

ফ্রেজার একে বলেছেন resurrection of god। তার বিবেচনায় বেশ কিছু প্রত্ন-সংস্কৃতির দেবতাদের মৃত্যু ও পূনর্জাগরণ ঘটেছে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পটভূমিতে কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট আদি-ভাবনার ধারাবাহিকতায়। মিশরীয় শস্যদেবী আইসিস, ফ্রিজীয় মাতৃদেবী সিবিলিকে Corn Mother' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি।

উত্তর আফ্রিকার সিবিলি-আত্তিস, গ্রিসের আফ্রোদিতে-অ্যাডোনিস বা মধ্যপ্রাচ্যের ইস্টার তাম্বুজ-এর মিল-নাৎসবে মুক্ত যৌনাচারের অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে। ইলিউসিসের নরনারী এভাবেই মুক্ত, যথেচ্ছ, প্রকাশ্য দেহ সম্ভোগ করতেন। ডেমিটার আর জিউস-এর মিলনের উৎসবটিকে উপলক্ষ্য করে তারা এসব করতেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমিকে উর্বর করা ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে এসব অনুষ্ঠান হত বলে জানা যায়। পশ্চিম এশিয়া বা মিশরের নানা অঞ্চলে, দেশে এরকম বহু লোকাচার প্রচলিত হয়। স্বর্গীয় বেশ্যা (sacred prostitution) দের কথা ভাবা হয়েছে অ্যাডোনিস (তাম্বুজ), আত্তিস বা ওসিরিস-কে কেন্দ্র করে অনুরূপ ব্যাপার দেখা গেছে। এদের ভাবা হত এইসব দেবতাদের পুত্র, ভ্রাতা বা আত্মীয়। তাদের সঙ্গে আফ্রোদিতে, ইশতার, সিবিলি বা আইসিস প্রভৃতি দেবীদের একবছরের শর্তে ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া হত। বৎসরান্তে তাদের মৃত্যু হত। আসলে তাদের বলি দেওয়া হত। শরীরের নানান অংশ টুকরো টুকরো করে চষা জমিতে ছড়াবার কৃত্য ছিল। ভাবা হত এইসব পুরুষ সঙ্গী, তাঁরাও তো স্বর্গীয় বেশ্যারই মতো, মারা যাচ্ছেন

না বা আবার বেঁচে উঠবেন। তাদের বৎসরান্তিক মৃত্যু আর পূনর্জন্ম শস্য উৎপাদনের বর্ষ চক্রের প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে সব যুগ্ন দেবদেবীর কথা ভেবেছেন ফ্রেজার বাংলার মনসামঙ্গল myth-এ তাদের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ ঘটেছে, কীভাবে, জগজ্জীবন ঘোষালের আদ্যকথা বিচারের সূত্রে তা এর আগে সামান্য লিখেছি। বাকি আরও কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। আদ্যের কথা বলে যা বাংলার কব্বি উপস্থাপন করেছেন সেখানে আদিম সমাজ ভাবনা, পরিবার সংগঠন, কৌম-সমাজের বিচিত্র বিসত্য যেমন আছে, তেমনি আছে যুগপরিবর্তনের অভ্রান্ত ইশারা। যুগ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহণ। এসব ক্ষেত্রে পুরাকার আড়ালে মানব সমাজের। নতুন নতুন দুকে প্রবেশের সংবাদও ভিন্ন রূপ ধরে উপস্থিত। তেমন কিছু উপাদানের মধ্যেই পশ্চাত্য পণ্ডিতর! উর্বত সম্পর্কিত -লাকাচার খুঁজে পেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আমাদের। বিশ্লেষণটি সন্নিবেশ করা দরকার। শিবের সর্বাঙ্গীণ কামুকতা ও দুর্গার সঙ্গে তার নানা রূপে বিহারের কাহিনি নিশ্চয় প্রমাণ করে এই দেব-দেবীর মধ্যে কৃষিকর্মের সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলায় এই দেব-দেবীর তাড়ালে সমাজ-সাংস্কৃতিক (Sig-cuitara) ভাবনা বিমিশ্র হয়ে আছে। শিব তার মাতৃস্থানীয় কেতকাকে পিতার পরামর্শে বিবাহ করছেন; গোঁসাই-এর মৃত্যু ঘটার পর মনসা অনুমৃত হচ্ছেন আর তঁার শরীর থেকে জন্ম নিচ্ছে এক শিশুকন্যা! এই শিশুকন্যা হেমন্ত ঋষি ও মেনকার দ্বারা পালিত হচ্ছেন-- নাম হচ্ছে গৌরী! এই হল জুলিব ঘাোষালের আদ্যের কথা'র সময় পুরাকথার একাংশ। সুতরাং এ কাহিনিগুলির মারত সহজেই হর-পার্বতী শ্রদিদে-আদিদেবী লক্ষণ প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তাঞ্চলের কিছু পূজা-পার্বণ তানুষ্ঠানের বিবরণ পরীক্ষা সুর দেখাচ্ছি। বোঝা অসম্ভব নয়, বাংলার কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষকদের চেয়ে মোটেই ভিন্ন রকম নয়। বিশেষত বালি-লোমবোকের বিশেষত বালি-লামোকের কৃত্যে ১০৮টি ধানের শিষ রক্ষার রীতিটি একান্তই ভারতীয় মনে হয়!

১. কোচবিহারের শীতলকুচি গ্রামের (শীতলকুচি থানা) কাচারির দিঘি বা খাড়াহাত দিঘি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি শুনিয়েছিল ছাত্র শ্রীসন্তোষকুমার রায়। স্থানীয় এক দেবী সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনি হল, দেবী সেই দিঘির কিনারে এক শাঁখারির কাছে শাখা পরে টাকা নিতে বলেন পুরোহিতের কাছে। পুরোহিতের কোন মেয়ে নেই। দেখতে এসে শাঁখারি আর পুরোহিত বিস্মিত হয়ে দেখেন— দিঘির মধ্য থেকে উঠে আছে একজোড়া শঙ্খ পরা হাত। এই থেকে পুকুরের নাম 'খাড়া হাত দীঘি'।

২. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি থানার আমলাহার গ্রামে নবান্ন উপলক্ষ্যে মনসা পূজা হয়। দেবীর নাম মনসাবুড়ি। মূর্তি অষ্টনাগ খচিত শিলা। সেবায়েত হলেন হাড়ি ও উইমালী সমাজের মানুষ। এই গ্রামের পুকুরের কাছে গেলে বাসন পাওয়া যায় বলে জনপ্রিয় কিংবদন্তির কথা জানা যায়।

৩. মুর্শিদাবাদ জেলার বরঞা থানার ঝিকরহাটি গ্রামের মনসা পূজা নানা কারণে বিশিষ্ট। ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় পূজা শুরু, শেষ হয় সপ্তমীর দিন। তৃতীয়ার দিন নাকি মনসার জন্য; দেবাংশী সেদিন পুজো দিতে দিতে অচৈতন্য হয়ে যান। মন্দিরের দেয়াল দরজা কাদামাটি নিয়ে রুদ্ধ করা হয়। পঞ্চমীর দিন আপনা থেকে দরজা খুলে যায়। তখন মনসার 'জিয়ান গান গাওয়া হয়। দেবাংশী তখনও অচৈতন্য থাকেন। বলি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার কুমারপুর গ্রামে শিব গাজন হয় মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে। গ্রামের একটি বটতলায় ভক্তরা মিলিত হয়ে বসেন। একজনের উপর শিবের ভর হয়। তার চাছে, গ্রামবাসীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জেনে নেয়। সপ্তমীর দিন একজন কৃষক শিব' হন-- চাষবাসের অভিনয় করা হয়। ধান-বানা, নিড়ান, কাটা সমস্তই অভিনয় করে দেখানো হয়।

৫. পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে শ্রাবণ মাসের শনি-মঙ্গলবারে 'ইচেরা বলে এ নুষ্ঠান হয়। কৃষকরা এদিন চাষ বন্ধ রাখেন। সিজ মনসার গাছ তুলসীতলায় রেখে মস করেন গৃহকর্তা। আমলকি পাতা, বেলপাতা, করবী ফুল প্রভৃতি সাধারণ কিছু উপকরণ ব্যবহার করেন তারা কেতকাদাসের মনসামঙ্গল পড়া হয় ।

৬. মালদহ-মুর্শিদাবাদের চাই-মণ্ডল সমাজে বিবাহ সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান আছে– ডুমনী কাচ' ছেলেদের বোন, বউদি ইত্যাদি চাল-পয়সা সংগ্রহ করে কয়েকদিন আগে বরযাত্রী। ফৈরার আগে তারা গীত করে মাতিয়ে রাখে। একজন ঘাঘরা পরে সেজে বেশি মাত্রায় নাচ করে।

৭. মালদহ জেলার মালদহ থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রামের আড়াই মাইল দূরে বুড়িতলা।। বৈশাখ সংক্রান্তিতে চণ্ডী বা কালী পুজো হয়। মেলা বসে। মেলার নাম 'বুড়িতলার মেলা। ১০০ থেকে ১৫০টি পাঁঠা বলি হয়। বুড়িতলা দেবীর পূজা না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের চাষীরা ক্ষেতের জমি হইতে ধান কাটেন না।' ।

৮. জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি থানার পাতাকাটা গ্রামে গ্রামরক্ষী হিসেবে আষাঢ় মাসে বিষহরির পূজা দেওয়া হয়।

৯. জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার সুখানী গ্রামে হাট ঘুরনী' নামক একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, মড়ক হলে স্ত্রী-পুরুষেরা কাছের হাটে যায়। সাতবার হাট প্রদক্ষিণ করে— দুধ ও চাল ছিটাবার অনুষ্ঠান করেন। উলুহরিনাম-পতাকা নিশান সহ পরিক্রমা করা হয়। অনুষ্ঠানের আগে এই উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা হাট হইতে ফিরিয়া গ্রামের কাছে কোন খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চন্দ্রকে প্রণাম জানাইয়া স্ব স্ব গৃহে পূজা করিলে সুবৃষ্টি ও ভাল ফসল পাওয়া যায়।

১০. উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় গ্রামের মেয়েরা কোন রাত্রিতে (অমাবস্যা বা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই প্রশস্ত') একত্রিত হয়ে চাষের জমিতে হুদুম-দ্যাও-এর পূজানুষ্ঠান

করে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মেয়েই সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা' হয়ে মুক্তকেশে পূজানুষ্ঠান আরম্ভ করে। ব্রতিনীদের মধ্যে একমাত্র পুত্রসন্তানের জননী একটি ছোটো কলাগাছ তুলে আনে— অন্যরা আনে একটি বড়ো কলাগাছ। দুটিই মাঠের মধ্যে পুঁতে ছোটো কলাগাছটার জরপাশে সমবেত নৃত্য গীত করে। কোন কোন গ্রামে ওই পুত্রসন্তানের জননীর স্থানে এক কুমারী মেয়েক্তে ছোটো কলহ আনতে হয়। এক্ষেত্রে কলাগাছটিকে আলিঙ্গন করতে হয়। কোন কোন গ্রামে বিবস্ত্র নারীরা কৃষিকর্মের অভিনয় করে। এসময় বাড়িতে পুরুষরা থাকে না।

১১. ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিটিকে বলে 'বগা পঞ্চমী' কিংবা 'বাক পঞ্চমী'! বীরভূম জেলার বহু মনসা-থানে মনসা পূজা করা হয়। কোন কোন মন্দিরে তিন চারদিন আগে থেকে মন্দিরে দোসী প্রবেশ করেন, একমাত্র প্রবেশপথটি বন্ধ করা হয় । লোকেরা মনসামঙ্গল গান করে ভিতরে নাকি আর মন্দিরের দরজা খুলে দেয়। মন্দিরের ভিতর থেকে দেয়াসীর অচৈতন্য, দেহটিকে বের করা হয়।

১২. হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার হীরাপুর গ্রামে মনসাদেবার সাপ্তাহিক পূজা প্রতি রবিবারে প্রচুর হাঁস উৎসর্গ করা হয়।

১৩. হাওড়া জেলায় আছে গোপদের দ্বারা পূজিতা 'রাখাল মনসা'! The Cowherd boys go round begging and collect money for the offerings.'

১৪. নদীয়া জেলার একটি অদ্ভুত পূজাচারের খবর দিচ্ছেন ড. মাইতি মনসা পূজার চারপাঁচদিন আগে মেয়েরা স্নানান্তে -ছাটো পাত্রে শস্য বপন করে ; পরে এ থেকে সামান্য কিছু অঙ্কুর নিয়ে চাষের জমিতে চাষ করে তারা। গোটা ব্যাপারটা তারা পুরুষদের দৃষ্টি সীমার বাইরে রাখতে চায়। ('The sown area is then covered by a screen.) কয়েকদিন পর এই গাছগুলিকে নিয়ে সাত-ভাগে ভাগ করে মনসার থানে আনা হয়। এসময় মনসার মূর্তিটিও ঢেকে রাখা হয় (placed inside the house under a screen'}। আর তখন উচ্চস্বরে মনসামঙ্গল গান করা হয়।

১৫. নদীয়া জেলার হিজুলি থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে হালা-বিয়া'-র অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান ত্রিপুরার 'জালা-বিয়ার অনুরূপ। গ্রামে দুই অবিবাহিত কিশোরীকে নিয়ে প্রতিটি বাড়িতে ছদ্মবিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়।

১৬. সাবেক পূর্ববঙ্গের বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার "রয়ানী" অনুষ্ঠান বিখ্যাত। সাধারণত বিবাহের পূর্বে বর বা কন্যাপক্ষ মূর্তি গড়িয়ে মনসা পূজার অনুষ্ঠান করতেন। এ অনুষ্ঠানে রাত্রি ব্যাপী মনসামঙ্গল গান করা হত। সাধারণভাবে প্রত্যেক গৃহে সিজ-মনসার ডাল রাখা হত- নিত্যপূজা হত।

১৭. ঢাকা জেলার সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে মনসা পূজার বর্ণনা দিয়েছেন রিসলে । সিজ মনার ডাল প্রতিষ্ঠা করা হত নাগপঞ্চমীর দিন; পরের প্রত্যেক পঞ্চমীতে পূজা আর বিজয়া শমীর দিন বিসর্জন দেওয়া হত । বিক্রমপুর পরগনার কুলীন ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দেবী পূজাতে অংশ নিতেন। বিক্রমপুর। পরগনায় 'মনসবাড়ি ছিল খুবই জনপ্রিয়। নৌকাবাইচ ছিল এই পূজার অন্যতম অঙ্গ।

১৮. ফরিদপুর জেলার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় জানা আছে সাদা পাঠা খুব ভালোভাবে কুক্ষা করা হত- "as they are believed to be the sacrificial victims most favoured by the goddess.'

১৯. যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার দিনাদাহাট গ্রামে মনসা পূজার দিন সাপুড়িয়ারা মিলিত হত। অনুষ্ঠিত হত তাদের প্রতিযোগিতা-- ওঝাদের মন্ত্রশক্তি পরীক্ষার জন্য হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হত।

২০. ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমানরা একসঙ্গে মনসা পূজার দিন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

২১, চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী, গ্রামে জনপ্রিয় মনসা পূজার স্থান ছিল- দেবীর নাম। লকুমারী। পাঁচটি দেবীমূর্তি এখানে ছিল-- দেবীদের অন্যতম ছিলেন মনসা। জলকুমারী বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী হিসেবে পূজিতা হতেন।

৪.২ মনসামঙ্গলের বর্ননাভঙ্গি ও কথন রীতি

মনসামঙ্গলের কথন-ভঙ্গি {ariaticin) বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা দরকার। বিপ্রদাস (এবং পরবর্তীকালের গায়েনবর্গ) পুরাণ-চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন কাহিনি গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে একথা -বাঝা যায়। পাশাপাশি যে জনগোষ্ঠী বিপ্রদাসের কাহিনি শুনতেন, তাঁরা ছিলেন পুরাণ-সাহিত্যে অদীক্ষিত। তাঁদের একটা বড়ো অংশ নিরক্ষর ছিলেন— পুরাণ তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের পরিবর্ত (substitute) হিসেবে গণ্য ছিল। সুতরাং বিপ্রদাসের কথনভঙ্গিতে তিনটি মাত্রা ও চারটি সূত্র তথা ধারাপ্রবাহ লক্ষ করা যায়।

লেখক/গায়েন বর্গ ।

পুরাণ + শাস্ত্র-স্মৃতিভাষ্য

পুরাণ + লৌকিক কাহিনি

সাধারণ শ্রোতা

লেখক (বা গায়েনবর্গ) চেয়েছেন পুরাণ প্রসঙ্গ ও শাস্ত্র-স্মৃতির ভাষ্য (discourse)- কে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে গেঁথে দিতে; সাধারণ শ্রোতারা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন লোক প্রচলিত উপাদান (Folk elements) যুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। এই আবর্তনের প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের কাহিনি। এই প্রক্রিয়াটি অন্তর্গত থাকার ফলে মনসামঙ্গল ব্যক্তিগত সাহিত্য না থেকে সমাজের নিশ্চেতনা (unconscious) বা অবচেতনা (subconsious) থেকে উঠে আসা যুগ-সাহিত্য। সামান্য কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

১. মহেশ্বরী সম্পর্কে বিপ্রদাসের স্তুতি এইরকম---

বান্দো মাহেশ্বরীরে ত্রৈলোকে করে পূজা।

মৃগরাজ ধ্বজা তেজা অষ্টাদশ ভুজা।

২. নবগ্রহ সম্পর্কে বিপ্রদাস বলেছেন-

রবি শশী ভৌম বুধ শুরু শুক্র শনি।

রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দো পুটপানি।

বোঝাই যায় বিপ্রদাস সংস্কৃত ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অমরকোষ তার পড়া ছিল। বস্তুত প্রচলিত শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করার মাধ্যমেই তার পুরাণ-চেতনা গড়ে ওঠে।

৩. প্রথম পালাতে বিপ্রদাস মনসার বেশ কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন; তুমগুলি মনসার কোন-না-কোন কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। একটু উল্লেখ করছি।

জনম পাতালপুরী অযোনি সম্ভবা।

নির্মাণি জননী মহাদেব তেজসভবা!

৪. বিশ্বকর্মা বা বিশাই-কে বাংলা সাহিত্যে দেবসমাজে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে মনে হয়। যে-কোন অবকাশে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। যেমন মনসা তার পুরী নির্মাণ করানোর সময় স্মরণ করেছেন বিশ্বকর্মা আর হনুমানকে। ভল্লুক বাহনে বিশাই অন্তরীক্ষপথে এসে হাজির। হয়েছেন :

বিশ্বকর্মা প্রতি তবে পদ্মা কহে কথা।

পুরী নির্মাইয়া দেহ বঞ্চি আমি হেথা ।।

কালিদহে জলের মধ্যে পুরা নির্মাণের ক্ষেত্রেও একইভাবে ডাক পড়েছে বিশ্বকর্মার। মধ্যযুগের অনুকবোহন বিশ্বকর্মা আধুনিক সময়ে হস্তী-বাহন হয়েছেন।

৫, অঙ্গরা বীণালতাকে দেখে ব্রহ্মার শুক্রপাত ঘটার শহিনি পুরাণের চরিত্রকে মনসামঙ্গলের

লৌকিক কাহিনির আদলে উপস্থাপিত করার চেষ্টা। উত শুক্রপাত হবার পর ব্রহ্মর অক্ষয় শক্তি থেকে সাতজন ঋষি জায় তাদের আকার ।

৬. দেবতাদের সিদ্ধযজ্ঞে' রন্ধনকর্মে এসেছিলেন দেবী চণ্ডী, তিনি যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন আর তার 'বসনের বারি ছিল কনেষ্ঠ অঙ্গুলি। তাকে দেখে কাম-মোহিত হলেন ব্রহ্মা :

রূপ নিরক্ষিতে ব্রহ্মার চন্দ্র টলে।।

প্রবেশ চণ্ডীর গর্ভে হৈল হেনকালে ।

চণ্ডী সেকথা ধ্যান-যোগে জানলেন, তিনি নাথযোগীদের নিমন্ত্রণ করে আনলেন। তাঁদের কামমোহিত করার চেষ্টা করলেন। যোগীরা তো শিবভক্ত, তাদের ডেকে আনার কারণ স্পষ্ট। হয় না। যাই হোক, বিশেষত গোরখনাথ দেবীকে বেশ কতকটা শিক্ষা দেওয়ায় দেবীর আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। তবে এখানে মনসামঙ্গল আর নাথ সাহিত্যের ঐতিহ্য একাকার হয়েছে। পরে বন্দুকা নদীর তীরে গর্ভমোচন করলেন তিনি। বিপ্রদাস জানাচ্ছেন :

সেই হৈতে গর্ভপাত হয় ত সংসারে।

চণ্ডীর স্খলিত-গর্ভ, ব্রহ্মার অক্ষয় শক্তি তৃষ্ণার্ত কপিলা পান করলে তার মহাশক্তিশালী পুত্র মনোরথের জন্ম হল। এরপর মনোরথ আর ওই মহাব্যাঘ্রের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ব্বিরণ দিয়েছেন বিপ্রদাস। গোটা কাহিনিটি পুরাকথার লক্ষণাক্রান্ত। একই উৎস থেকে জাত বিভিন্ন প্রাণসত্তার দ্বন্দ্ব-- পুরাণ কথার, আদিকথার বৈশিষ্ট্যটি বহন করছে। নীচের ছকটি থেকে এই দ্বান্দ্বিকতার ছবি স্পষ্ট।

৭. মনসার নাগ আভরণ দেখে ভয় পাওয়া আর জরৎকারুর শঙ্খের মধ্যে লুকিয়ে থাকার কাহিনির পটভূমিতে চণ্ডীর পরিকল্পনা, মানবিক ব্যবহার যুক্ত করে দিয়েছেন বিপ্রদাস। চণ্ডী গিয়ে জরৎকারুকে বলেছেন :

নাগরূপী কন্যা এই নাগ অবতার।

মনি রত্ন এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার।

আজি নিশি নাগভয় থাকিহ সত্বরে।

অন্যদিকে মনসাকে পরামর্শ দিলেন চণ্ডী, তিনি যেন নাগ আভরণ পরে বাসর ঘরে যান।

নাবুঝি চণ্ডীর মায়া মনসা কুবুদ্ধি।

নাগ আভরণ পদ্মা করি নানা বিধি ॥

মনসার আভরণ নাগগুলিকে চঞ্চল করার জন্য উপরন্তু চণ্ডী ছুঁড়ে দিলেন কিছু ব্যাং

হেনকালে চণ্ডিকা চলিয়া ধীরে ধীরে।

দুয়ারে থাকিয়া ভেক পেলি দিল ঘরে।

ভেক দেখি সর্ব নাগ গর্জয়ে সঘন।

উঠিয়া বসিল ঋষি চমকিত মন।

কাহিনি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি এখানে পুরাণের গাম্ভীর্য অতিক্রম করে লোকায়ত লঘু ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন।

৮. স্বামী জরৎকারু নাগ ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন শঙ্খের ভেতর। মনসা তখন কুরলপক্ষীর রূপ ধারণ করে গেলেন দূর গভীর সমুদ্রে

নিমেষে সব জানি। সমুদ্রে আছে মুনি

শঙ্খের গর্ভে লুকাইয়া।

চলি সসপ্তাপে কুরল-পক্ষ রূপে।

ডাকিয়া অন্তরীক্ষ হৈয়া

শুনিয়া পক্ষ ডাক ভাসিয়া উঠে শাখ

ছুইয়া তুলিলেন তীরে।

৯. সঙ্ক ধন্বন্তরিকে মনসা কৌশলে নিহত করার পর ‘গাড়র মূর্তি করে রেখে দিয়েছেন :

জিয়াইয়া ধরি গাড়র এত করি

যত রাখিলা রসাতলে ।

এই কাহিনি-সূত্রটি পরে আর ব্যবহার করা হয়নি। লখিন্দরের বিবাহ যাত্রার শেষে তার শ্যালকরা একটি বৃহৎ লোহার ঘণ্টা ও গাড়র মূর্তি রেখে দিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ লখিন্দর এসময় অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সম্মুখে দেখিল বালা লোহার গাড়র।

দক্ষিণে ধরিল মুণ্ড কর্ণে বাম কর।

মেড়া ধরি লখিন্দর মারে একটান।

ছিড়িয়া গাড়র মুণ্ড করে খান খান।

এই গাড়র-মূর্তির সঙ্গে সঙ্ক ধন্বন্তরির সম্পর্ক নির্ণয় করার মতো স্পষ্ট উপাদান আমাদের হাতে নেই। এই সামান্য একটি ইঙ্গিত থেকে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না। ধারণা হচ্ছে এখানে কোন সূত্র হারিয়ে গেছে। ধর্মমঙ্গলে কানড়া সুন্দরীকে বিয়ে করার আগে লাউসেনকে এক কোপে দেবী চণ্ডী প্রদত্ত লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করতে হয়। বেহুলাকে লাভ করার পূর্বশর্তও কি তেমনি কিছু ছিল?

১০. ‘গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’-এ একই ধরনের কাহিনি উপস্থাপনের রীতি লক্ষ করা যায়। আমার লেখা একটি প্রবন্ধের একাংশ উল্লেখ করি : “.. সত্যের পাশা’ ঝুলিয়ে রাখা হল,

একটি পাত্রে সামান্য পরিমাণ দুধ আর চাল রেখে দেওয়া হল; জোড়া দামামা টানিয়ে রাখা হল। বলা হল এক জোড়া প্রদীপ জ্বালানোর কথা।

এ কড়ায় তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি।

এই প্রদীপ জ্বলিবে তোমার কিবা দিবা রাতি ।

বার বছর পর, গোপীচন্দ্র যেদিন মহলে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে

দুয়ারের জোড়া নাগরা বাজিয়া উঠিল।

দেখা গেল সেই প্রদীপ আজও জ্বলছে। রান্না হয়েছে সেই দুধভাত, বিনা আগুনেই! ডালিম রাজকুমারের গল্প ডালিমকুমার অভিযানে বের হবার পর পুঁতে রেখে ছে, একটি ডালিম গাছ। বলে গেছে তার বিপদের চিহ ধরা পড়বে এই গাছে।

১১. লখিন্দর বেঁচে ওঠার পর দেখা গেল নিজের পায়ে তিনি দাঁড়াতে পারছেন নোতঁর 'আঁটুচকি খেয়ে গেছে একটি রাঘব বোয়াল। বিপ্রদাস লিখেছেন :

রঘু বোদালি খাইল লখাইর আঁটু চাকি!

ঘুরে পদ্মার স্থানে আইল শশিমুখী !

এই রকম অভিপ্রায় ব্যবহার করেছেন কালিদাস। অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে,অনুরূপ কাহিনি আছে! বাংলার বেশ কয়েকটি মনসামঙ্গলে একই রকম কাহিনি বিদ্যমান। লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদান এখানে একাকার হয়ে আছে।

১২. পুরাণ কাহিনি বিপ্রদাস জানতেন। কখনো চিৎ তাঁর কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা পুরাণ। প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। বেহুলা সাবিত্রী-সত্যবানের কথা বলেছেন একসময়। তবে সে কাহিনী সরাসরি পুরাণ থেকে আসেনি-- এসেছে মৌখিক পরম্পরা (oral tradition) থেকে :

সত্যবতী নামে কন্যা সতী পতিব্রতা ধন্যা

তার কথা কর বধান।

আঠার বাঁকড়ার প্রসঙ্গে পুরাণকথা স্মরণ করেছেন বিপ্রদাস--- খুদিয়া ডিঙ্গর নামক বামনবীরের মুখে পুরাণ কীর্তিত সতেরো জন বীরের কথা পাওয়া যায়। এইসব চরিত্রের কথা পুরাণ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেবলমাত্র শেষ যে বীর সেই-ই আধুনিক উক্ত খুদিয়া ডিঙ্গর।

৪.৩ বিপ্রদাসের রচনায় বিভিন্ন কাল ও বর্গের সমাজ-বাস্তব

বিপ্রদাসের বলা লোকসংস্কারের একটি বড় অংশ আজও অপরিবর্তিত হয়ে সমাজে প্রচলিত। বস্তুত মানুষের জীবনভঙ্গি যত তাড়াতাড়ি বদলায় তত তাড়াতাড়ি লোকসংস্কার বদলায় না। ফলে বিপ্রদাসের রচনায় বাংলার সমাজ-মনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পরিচয় এগুলিতে মিলতে পারে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি--

১. পিতৃশ্রাদ্ধের বাৎসরিক উপলক্ষে মাছ খাবার প্রসঙ্গ আছে চাঁদ সদাগরের গুরুকৃতা বর্ণনার অবকাশে :

চাঁদো রাজা গুরু কৃত্য করয়ে হরিষে।

মৎস্য আনিবারে রাজা কলি আদেশে ।

রীতিটি বাঙালির নিজস্ব

২. শনিবারে অমাবস্যা তিথিতে ব্রত উদ্যাপনের বর্ণনা পাই বিপ্রদাসের রচনায়। সনকা। তার দুই পুত্রবধূ নিয়ে ব্রত পালন করছেন :

এথায় সনকা ছয় বধূ লৈয়া ঘরে ।

মনি অমবস্যা ব্রত হরষিতে করে ।।

মন্তব্য

শনি-মঙ্গলবার ভয়াবহ, ক্ষতিকারক, বিপদ ঘটাতে পারা দেবদেবীর পূজার জন্য প্রশস্ত। ঘটনাচক্রে সেই দিনটি মনসা পূজা করছিল, জালুমালুর মা নিছনি। জোড়া বারি নিয়ে পূজা। হাথে কাখে দুই বারি নিয়ে পূজা তাদের। সনকা নিছনির কাছে পূজাপদ্ধতি শিখে নিয়েছেন- মনসাও নিছনিকে নির্দেশ দিয়েছেন- হরষিতে দেহ দুই বারি। মনসার বারি বারা-র পূজা বাংলার সর্বত্র বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচলিত।

৩. মন্ত্রতন্ত্র তথা গুণিনদের বিচিত্র প্রভাব বিশেষত নারী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনসা সঙ্ক ধন্বন্তরির স্ত্রীর সখী হয়ে যাবার পর রূপাকৃষ্ট সঙ্ক ধন্বন্তরি তাকে রাত্রে থেকে যেতে বলেছেন। মনসা প্রথমে রাজি নন—

অতি খরতর মোর স্বামী দুরাচার।

আজি যদি বঞ্চি শাস্তি করিব আমার।

ধনা-মনার জননী কাজলা মালিনীর সখী সেজে মনসা ধনা-মনার প্রাণ ফিরিয়ে দেবার অবকাশে বলেছেন, পিতার কাছে তিনি সামান্য কিছু মন্ত্র শিখেছেন। সেই মন্ত্র প্রয়োগ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন মনসা। শর্ত, প্রাণ ফিরে এলে ধনা-মনাদের তার চাই। মনসার কথা :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে।

তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে ।।

বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি।

জিয়ে বা না জিয়ে তাহা দেখিব এখনি ।

সৃঙ্ক ধন্বন্তরির মৃত্যুর পর কমলাও মন্ত্রজাত করবার চেষ্টা করেছেন। এসব থেকে বুঝি মন্ত্রশক্তির প্রতি সার্বিক বিশ্বাস বিপ্রদাসের পরিচিত সমাজে ছিল।

সর্পবিদ্যকদের মৌখিক পরম্পরা-- চৌষট্টি বিদ্যা, জীব সঞ্চারিণ' বিদ্যা, 'অমৃত করণ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে বর্তমান কাহিনিতে; এ সমস্তের বাস্তব ধারাবাহিকতা ছিল কি না জানি না বিশ্বাসের পরম্পরা নিশ্চয় ছিল। সাধারণ মানুষ এ-সবে অগাধ ও পরম নির্ভরতা বোধ করত।

৪. সঙ্কের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন তার শরীর ৮টি টুকরো করে

হইলে মোর নিপাতন নাহি দিবা হুতাশন

কাটিয়া করিহ অষ্টভাগ।

অষ্ট দিগে স্থানে স্থানে পুতিহ হে সাবধানে

সঞ্চারিতে নারিবেক নাগ ।

ইরকম রাতি স্বাভাবিক সৎকার বিধি নয়। ব্রাহ্মণের বেশে মনসা গিয়ে বলেছেন, এই যবন লত রীতি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। গুরুর নির্দেশ মেনে তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কেটে নিয়ে পুতে ফেলা হোক। চাঁদ সদাগর রীতিমতো কলার মান্দাসে করেই ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছয় পুত্রের শব এবং লখিন্দর ও বেহুলাকে। মনসার উচ্ছিষ্ট মৃতদেহের ধোঁয়া চম্পকনগরে ছড়িয়ে পড়ুক, তিনি চাননি ।

৫. সাপের বিষক্রিয়া বেড়ে যায় রোগীকে তেঁতুল খাওয়ালে বা আগুনের সেঁক দিলে। পুত্রের উন্মত্ত প্রায় ব্যবহার দেখে সনকা ভেবেছেন তারা নিশ্চয় সিদ্ধি বা ভাঙ সেবন করেছেন, তখন তিনি তেঁতুলি গুলিয়া দেয়/অনল জ্বালিয়া দেয় তাপ। তখন 'তেতুলি-অগ্নিস্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বলিল বিমে ছয় ভাই হরিল চেতন। এই রকম দ্রব্যগুণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে ওষধি প্রয়োগের বিধিনিষেধের চিহ্ন বিপ্রদাসের রচনায় আরও কিছু পাওয়া যায়।

৬. যাত্রাকালে হাঁচি জেটী' পড়া অমঙ্গলজনক। চাঁদ সদাগরের নৌ-যাত্রার পূর্বে অনুরূপ বিপত্তি ঘটেছে।

হাঁচি জেটা পড়ে যবে যাত্রা করে রায়।

সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়!

৭. সন্তান জন্মাবার সময়কার বহু বিচিত্র কৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন বিপ্রদাস ! ন-মাস গর্ভকালে স্নকার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সন্তান জন্মাবার সময় দাওন পাততে হবে প্রসূতিকে, দাওন— বিশেষ রকম আসন বলে মনে হয়। জাতক জন্মাবার পর তার অঙ্গ মার্জনার পর মস্তক ও নাসা উপরের দিকে তোলা হবে। তারপর হবে নাভিকনি ও হুলুধ্বনি। কুমারিকা লতায় সুতিকাগৃহের চারপাশে বেড়া দেওয়া হবে। দ্বারে রাখতে হবে গোমুণ্ড। তাতির সাহায্যে কুমার-জাতকের নাড়ি নিবন্ধন করাতে হবে। প্রভাতে সুতিকাকে দেওয়া হবে পাচন। খুব সংক্ষেপে যথাযথভাবে বিপ্রদাস এইভাবে লখিন্দরের জন্মকথা বলেছেন।

৮. বিবাহের পূর্বে 'ইল পিঠালি' অনুষ্ঠান, গণেশ পূজা—-যাড়শমাতৃকা পূজা বসুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। এসব জায়গায় গায়েনদের প্রপে প্রচুর পরিমাণেই পড়েছে। কিছু কিছু লোকাচারের মধ্যে স্থানীয় রূপি ক্ষয় করা যেতে পারে! পড়া আঁখা, তণ্ডুল মঙ্গল', 'শ্রীতোলা হয়তো তেমনি অনুষ্ঠান। কনের বাড়ির লোক কুম্ভকারের ঘর থেকে মঙ্গল কলস নিয়ে আসবে, আসার পথে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে-- এই কৃতের নাম শ্রীতোলা !

৪.৪ বিপ্রদাসের রচনারীতি

তালিকা প্রণয়ন প্রণালী (cataloguing) মধ্যযুগের কবির সাধারণ লক্ষণ। তালিকা একবার নয়, বার বার দেওয়া হয়। ফলে এগুলি হয়ে ওঠে গায়েন সমাজের নিজস্ব উপকরণ। এই রীতির বিশ্লেষণে সুফল পেয়েছেন প্রয়াত গবেষক অমিয়শঙ্কর চৌধুরী মহাময়। সিজুয়াতে মনসার রাজ্য, সেখানে ছত্রিশ জাতির বাস। তাদের তালিকা :

১. ব্রাহ্মণ, ২. মেরুলি, ৩, বৈশ্য, ৪. বৈদ্য, ৫. কায়স্থ, ৬. ভট্ট, ৭. দৈবজ্ঞ, ৮, গোপ, ৯. বারই, ১০. কুমার, ১১. পঞ্চবণিক (অর্থাৎ, ১১. স্বর্ণবণিক, ১২, গন্ধবঙ্কি, ১৩. কংসবণিক, ১৪, শঙ্খ বণিক, ১৫. গ্রামিক বণিক), ১৬. কর্মকার, ১৭. বাদ্য (কার), ১৮, পূরক, ১৯, কলু, ২০. কুশলি, ২১. কাঠুর্যা, ২২. শাখারি, ২৩, কাসারি, ২৪. তামলি, ২৫. সেকরা, ২৬. তাতি, ২৭. যুগী, ২৮, মালাকার, ২৯. রজক, ৩০. নাপিত, ৩১. ছুতার, ৩২. গাড়ার, ৩৩, ধীবর, ৩৪. তির, ৩৫. মালা ! এখানে একটি জাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে না। ৩৬ জাতি শব্দটিকে যদি যথাযথ বলে গণ্য করা হয় সেক্ষেত্রে একটি জাতির নাম পাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল! পঞ্চবণিক নিশ্চয় বিশেষ কোন জাতি নয়।।

দ্বিতীয় পালার দ্বিতীয় গানে মনসার জলবিহার বর্ণনার ছলে বেশ কিছু পাখির নাম লেছেন তিনি। একাদশ পালার ষষ্ঠ গান মুকুতা সরোবরে বেহুলা সখিদের সঙ্গে স্নান করার সময় একই তালিকা পূনরাবর্তিত করেছেন বিপ্রদাস, এই দুটি তালিকার তুন ইর! যাক।

দ্বিতীয় পালা/দ্বিতীয় গান	**একাদশ পালা/ষষ্ঠ গান**
রাজহংস; কারণ্ড; সরল; কুরল ;	রাজহংস; সরল; কুরল ;
চকয়া; ডাহুকা; চাকোয়া ;	চকয়া; ডাহুকা; চাকোয়া ;
'ডাহুকা; সামুখাল; কোড়া" ;	সামুখাল; কামী; কোড়া;
গাড়াপোল; সারস; কামি;	গাড়াপোল; সারস; কামি;
গাঁড়াপোল; সারস; বক; কঙ্ক;	বক; কঙ্ক; সরালি; মৎস্যরঙ্গ;
চিল; তিথির, সরালি; মৎস্যবন্ধু	চিল; তিথির, সরালি; মৎস্যবন্ধু ;
শঙ্খচিল; তিথির; ময়ূর।	শঙ্খচিল; তিথির; ময়ূর।

মন্তব্য

বিপ্রদাসের রচনারীতিতে পরিকল্পনার ছাপ এখানে সুস্পষ্ট। ১০০ জনের কথা বলতে চান তিনি। শততম ব্যক্তি হাসন স্বয়ং। মুসলমানদের বিবিদের একটি তালিকা দিয়েছেন কবি। সে তালিকা ছোটো !

১. জিরাবিবি, ২, হারি, ৩. কালাফুলি, ৫. দুলদুলি, ৬. নাজিরি, ৭. টগরি।

—এরা সাতজনই হাসনের বাঁদি।

হাসনের সৈন্যদলের সকলেই মুসলমান নয়। তাদের তালিকা :

১. ছৈয়দ, ২. মোল্লা, ৩. কাজি, ৪. মির, ৫. মজলিস, ৬. খোজা, ৭. পয়দল, ৮. নস্কর, ৯. সিফাই, ১০, ঘোড়া, ১১. হাথি, ১২. উট, ১৩. খর, ১৪. তরকি, ১৫. ধানকি, ১৬. রায় বাশিয়া, ১৭. জুবার, ১৮, গাহুল, ১৯. বম্বুল, ২০, বানা (?), ২১. চোঙ্গদার, ২২. হাজরা,

২৩. পহলান।।

—এদের মধ্যে হাজরা কোঠাঞি আর জুঝার ধানুকি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। | সনকা বা ঝাউয়াদাসীর সঙ্গে বিবাহ-মঙ্গলকর্মে যাওয়া প্রচুর এয়োতির একটি বড়ো। তালিকা আছে বিপ্রদাসের রচনায়। এগুলি মধ্যযুগের নামমালা হিসাবে গণনীয়। তালিকাটি উল্লেখ করছি :

১. কমলা, ২. বিমলা, ৩. 'চন্দ্রকলা, ৪. শীলা, ৫. অমলা, ৬. তিলা, ৭. শীলবতী, ৮. সুশীলা, ৯. মঙ্গলা, ১০. প্রবলা, ১১. চঞ্চলা, ১২. সুমঙ্গলা, ১৩. মালাবতী, ১৪. যোশাদা, ১৫. প্রবোধা, ১৬. বরদা, ১৭. প্রমদা, ১৮, সারদা, ১৯. + ২০, মিতানুয়তি (মিতা, অনুমতী), ২১. সুমতি, ২২. শ্রীমতী, ২৩. ভাগীরথী, ২৪. সতী, ২৫. ইন্দ্রবতী, ২৬. জাম্ববতী, ২৭. অভয়া, ২৮. বিজয়া, ২৯. সদয়া, ৩০. নিদয়া, ৩১. সর্বজয়া, ৩২. ছায়াবতী, ৩৩, শুভা, ৩৪. স্বর্ণ রেখা, ৩৫. উষা, ৩৬. চিত্রলেখা, ৩৭. সনকী, ৩৮, মেনকা, ৩৯, শিবানী, ৪০. ভবানী, ৪১ রুদ্রাণী, ৪২. ইন্দ্রাণী, ৪৩. ব্রহ্মাণী, ৪৪. মালিনী, ৪৫. রমা, ৪৬, অপছরী, ৪৭. কিন্নরী, ৪৮, দারী, ৪৯. বিদ্যাধরী, ৫০. মনোরমা, ৫১, তিলোত্তমা।

বিভিন্ন সময়ে বাদ্যযন্ত্রের একটি তালিকা রচনা করেছেন বিপ্রদাস : সেগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম, পাঠভেদ দেখা যাক।

দুন্দুভি, মরুজ, পড়া, বীণ, করতাল, ঝাঝরি, মুহুরি, মৃদঙ্গ, রসাল, ভেউর, করনাল, ভিণ্ডিম, কাহাল, দুগরি, কপিলাস, ঘণ্টা, মন্দিরা, দুসরি, মঙ্গলা, সপ্তস্বরা। (৩/১৪)। দগড়, দামা, দড়মাসা, ঢাক, ঢোল, সানি, পড়া, ঠমক, বরগোল, কাড়া, ভেউর, করনাল, ধুসরি, মহরি, ফাসি, কপিলাস, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, পাখজ, রণশিঙ্গা (৪/২০) মৃদঙ্গ, বিষাণ, (ভেরি, সানি, বরুগো, দগড়, কাড়া, রবাব, পাখজ, পাড়া, কপিলাস, করতাল, ঘুসরি (ধুসরি-র ভ্রান্ত পাঠ) মুহরি, খেমক, জোড়া-দামা, দড়মসা ঢাক, ঢোল, সানি, বেনি, দড়মসা, দগড়, ভেউর, কর্নাল, সপ্তস্বরা, রসাল, মৃদঙ্গ, বীণ, কপিনাস, কাড়া, পড়া, কাহাল ।

পূজার উপকরণ হিসেবে দশফলের নাম এসেছে বারবার। যথা :

কদলী কর্কট ফুটী নারিকেল জাম খাজুর পনস ।

তাল পৃগ আম

ত্রয়োদশ পালার অষ্টম গানে তালিকাটি আছে এইভাবে :

কলি, কট, ফুটি, নারিকেল, জাম্র, খাজুর, পনস, তাল, পুগ, আত্র। -- পূগ অর্থাৎ 'সুপারি।।

চাঁদের নাখরা-বনে যেসব গাছ লাগানো হয়েছে তার তালিকা উল্লেখ করা যাক :

১. চ্যুত ২. নারিকেল, ৩. তাল, ৪. রসাল পনস, ৫. গুবাক, ৬. আমলকি, ৭. চেউরি, ৮. তেঁতুলি, ৯. কদলী, ১০. ইক্ষুবন, ১১. (৭ রকম লেবুর বন, ১২. কলম্বগ, ১৩. ছোলঙ্গ, ১৪. বাতাবি, ১৫. নারঙ্গি, ১৬. পাতি, ১৭. গোঁড়া, ১৮. কাল (কালমেঘ?) ১৯. আমড়া, ২০. নিম্ব, ২১. বকুল, ২২. কদম্ব, ২৩. শেফালিকা, ২৪. জুতি, ২৫. কুন্দ, ২৬. চম্পক, ২৭. মল্লিকা, ২৮. নাগেশ্বর, ২৯, আউচ, ৩০. রঙ্গন, ৩১. সারুলি, ৩২. পারুলি, ৩৩. ঝাটি, ৩৪. জাতি, ৩৫, জবা, ৩৬. মাধবীলতা, ৩৭. করবী, ৩৮. অপরাজিতা, ৩৯. দোপাটী, ৪০. দোমুখি, ৪১.

গন্ধরাজ, ৪২. কাঞ্চন, ৪৩. মালতী, ৪৪. টগর (ধবলমুখী), ৪৫. বক (শ্বেতলোহিত), ৪৬. সুগন্ধী, ৪৭. কেতকী, ৪৮, কোড়া, ৪৯. কৃষ্ণকলি, ৫০. সূর্যমণি, ৫১. বাসক, ৫২. অশোক, ৫৩. কপিথ, ৫৪. পাকড়ি, ৫৫. ভেলা, ৫৬. হরতকি, ৫৭. বহেড়া, ৫৮. গিলা,

৫৯. জলপাই, ৬০. কাম-রাঙ্গা, ৬১. রক্তচন্দন (৫/১২) |

সায়বেনে লখিন্দরের জন্য যেসব যৌতুক সামগ্রী দিয়েছেন, তার তালিকা :

আসন বসন ধেনু রতন কাঞ্চন অঙ্গদ কেয়ুর হার অঙ্গুরি মঞ্জরি বাটি খুরি বাটা ঝারি খাল

ডাবর খাট বিচিত্র অম্বর চতুর্দোল হস্তি ঘোড়া সৈন্যদল দাস দাসী (১২/১২)

বিবাহ যাত্রার সময় যে-সব বাজি-পটকা ফাটিয়েছেন লখিন্দর ও চাঁদ সদাগরের দল: হাউই, উঁই চাপা, তুবড়ি, চরখি, চাঁদর, কুমুরিকা প্রভৃতি।

বেহুলার কাচুলির ডানদিকে প্রচুর পশুর নাম পেয়েছি। তালিকা :

গণ্ডার, শার্দুল, সিংহ, কপিবর, মহিষ, কুঞ্জর, ভল্লুক, কৃষ্ণসার, বরাহ, জমুক, সুরঙ্গ, কুরঙ্গ, সাড়য়াল, নেগরু, ভাম, ইন্দুর, বিড়াল, দদ্ধক, গুধিকা, কাকলাস, ভেক, ধেনু পাল (বৎস্য-সহ)। —এইসব তালিকার মাধ্যমে মনসামঙ্গল রচনাকালের পরিবেশ-পরিস্থিতি সমাজ ও বাস্তব সম্পর্কে ধারণা নিশ্চয় পাওয়া যায়!

৪.৫ সমাজের বিভিন্ন বর্গ

চাঁদের লাঞ্ছনাপর্বে বিভিন্ন জাতি-গাষ্ঠীর বিবরণ পাই। পশম পালর সেই জাতিগুলির পেশাগত পরিচয়টুকু পরবর্তী প্রক্ষেপ হতে পারে। বিপ্রদাস এই কাহিনির মূল রূপটি নিশ্চয় লিখেছিলেন, তবে আসরের অনুরোধে কিছু কিছু বৃত্তির কথা, কিছু কিছু পরিস্থিতির সংযোজন ঘটেছে মনে হয়। দেখাই-

কাঠুরিয়া :

লাঞ্ছিত চাঁদসদাগর কাঠুরিয়াদের সঙ্গে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গেছেন। মনসার মায়ায় নাগরা কাঠের রূপ ধরে থেকেছে—

কাঠ বলি চাঁদো রাজা নাগেরে কুড়ায়।

প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করার পর বোঝা মাথায় তুলতে পারেননি চাঁদ। ধামাই নররূগ ধরে সেই বোঝা তাঁর মাথায় তুলে দিয়েছেন :

ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি কাষ্ঠ বোঝা বাঁধে।

চলিতে না পারে চাদো দাঁড়াইয়া কাঁদে।।

অন্যান্য মনসামঙ্গলে কবিরা এই অবকাশে বিভিন্ন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। চাঁদ বনের ভিতর চন্দন কাঠ সংগ্রহ করেছেন এই রকম কিছু ঘটনা ।

কুমার :

কুম্ভকারদের পল্লির বাস্তব বিবরণ পাওয়া গেছে বিপ্রদাসের রচনায়। কুমারদের সঙ্গে দর হল 'কড়ি চারি পোণ' পেলে কাষ্ঠ বিক্রি করবেন চাঁদ। কিন্তু ভার বহনে অভ্যস্ত চাঁদ সদাগর মাথার বোঝ ফেলেছেন কুমারদের সারি করে রাখা হাঁড়ির ওপর :

শিরে বোঝা চাঁদো রাজা হইল কাতর।

দারু বোঝা ফেলে হাঁড়ি পাখই উপর।।

কুমারদের ক্ষতি হল চাঁদকে তারা লাঞ্ছনা করল। লাঞ্ছিত চাদো রাজাকে চোখে-মুখে জল দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনল কুমারের স্ত্রীরা। তারা মধু বাক্য বলি কড়ি দিল চারি পান। এদিকে কাঠরূপ ত্যাগ করে নাগরা পালাল দেখে কুমাররা যথারীতি খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হল :

চারিভিতে নাগ দেখি কুমার সভয়।

বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়।

তারা চঁদকে তাতিপাড়ায় গিয়ে ধরে আবার লাঞ্ছনা করল।

তাঁতি :

তাতিদের পাড়ায় চারিপণ কড়ি নিয়ে কাপড় কিনতে চাইলেন চাঁদ। তাঁর কথা শুনে তাঁতিরাও তাকে লাঞ্ছনা করেছে।

ব্যাধ :

পাখি ধরছিল ব্যাধরা। তাদের পাতা ফাঁদের কাছে লাঞ্ছিত চাঁদ। উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন:

নিকটে দাঁড়ায়্যা তবে কান্দে উচ্চরায়।

পড়াছিল ফাদে পক্ষ উড়িয়া পালায়

বাধরা তাকে উত্তম-মধ্যম দিল। চাঁদ বড়েই বিপন্ন, তার বক্তব্য তিনি ছে! কোন দোষ করেননি। ব্যাধরা তাকে বলল, এবার তিনি যেন অন্য কথা বলতে থাকেন :

ঝাক সহ আসি হেথা অবিলম্বে শাড়

চাঁদ তাই বলতে থাকলেন। অকস্মাৎ সেখানে এসে পড়ল কিছু দস্যু! তারা ভাবল তাদের উদ্দেশ্যেই চাঁদ একথা বলছেন। যথারীতি আবার তীব্র লাঞ্ছনা হল চাঁদের।

কৃষি শ্রমিক :

উক্ত ঘটনা-পরম্পরার পর চাঁদ এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ি কৃষকের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। চাঁদ দাবি করলেন— ত্রিসন্ধ্যা -ভাজন, চারটি বস্ত্র আর আর এক তঙ্কা মাসে' মাহিনা চাই। ব্রাহ্মণ রাজি। নিড়া-নার কাজ করতে বলেছেন চাঁদ--- এক পথিক পাশ দিয়ে চলেছে, বলছে সেই পথিক :

ভালো ধান্য কড়া বিষহরি।

মনসার নাম শুনে ক্রোধে চাঁদের কাজকর্মে ভুল হয়ে গেল :

বিবর্ণ বদন হইয়া দুই আঁখি পাকালিয়া

তৃণ এড়ি কাটে সব ধান ।

ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধানক্ষেত থেকে সরিয়ে নিয়ে গোরু চরাতে পাঠালেন। চাঁদ একাজেও চরম অবহেলার পরিচয় দিলেন—

গরু রাখে নৃপবর দিন দুই অপসর

কুবুদ্ধি দিলেন পদ্মাবতী

চাঁদো হইল হতজ্ঞান গরু এড়ি দিল থানে।

হাথে বাড়ি নাচে নরপতি।

এই লাঞ্ছনার বিবরণে তদানীন্তন সাধারণ বৃত্তিধারীদের অবচেতন স্তরের ইচ্ছা পূরণ ঘটে থাকবে। এজন্যই লিখেছি বাস্তব এখান সুস্পষ্ট নাও হতে পারে কিছুটা জন-মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এখানে থাকা সম্ভব। হয়তো অতিশয়নের কিছু আবেগ এখানে কাজ করেছে।

যোগী :

যুগী-সম্প্রদায়ের ছবি মনসামঙ্গলে সামান্য আছে। তাতি এবং যুগী জাতির বিবরণ পাশাপাশি আছে মনসার সিজুয়া-পত্তনের সময়। ধারণা হয় যুগীদের প্রাথমিক বৃত্তি তাঁত চালানো ছিল। গোসানী মঙ্গল' নামক অর্বাচীন অপ্রধান মঙ্গলকাব্যে এক যুগী তাঁতির বর্ণনা পেয়েছি :

ভৈরব নামেতে তাঁতি জাতিতে সে যুগী।

তাতি কাজ করে কিন্তু সতত বৈরাগী।

রাজার যোগায় বস্ত্র রাজা ভালবাসে।

দেখি সেনাগণ তারে জোলা বলি হাসে।

ভাঙ্গি ফেলে তাত খোট ভৈরব রুধিল।

খুঁটা হস্তে করি তাঁতি যুদ্ধ আরম্ভিল।

মনসামঙ্গলের শেষে পেয়েছি যোগী-সন্ন্যাসীর বেশ ধরেছেন বেহুলা ও লখিন্দর :

বেহুলা লখাই দোহে যুণিনীর বেশ।

আচ্ছাদিলো শিরোপরে দীর্ঘ জটা কেশ।

লাউয়া লাটা থাল বুবি দোয়াদশ করে।

শ্রবণেতে কুণ্ডল বিভূতি কলেবরে ।

সাহের নগরে কৌতুকে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা; কারও ভিক্ষা গ্রহণ করেননি। সুমিত্রা তাদের জন্য। ভিক্ষা নিয়ে এসেছেন :

হেথালে ভিক্ষা লইয়া আইলো ধাইয়া।।

সুর পঞ্চ কড়ি তথা পর লয় ।।

দেখিয়া দুহার রূপ তথি নেই যায় !!

বেহুলা লখিন্দরকে থাকতে অনুরোধ করলেন সুমিত্রা। আত্মপরিচয় দিয়ে বিদায় নিয়ে চললেন ফিরে— বেহুলা-লখিন্দর।

যোগিদের বেশ ধারণ করার মধ্যে দিয়ে একরকম আদর্শায়ন (idealization) ঘটে থাকবে। কাহিনির বাস্তবতা স্মরণ করলে মনে হয় বিপ্রদাস যখন কাহিনিটি পেয়েছেন,

তখন যোগীরা সমাজে খুব সসম্মান আদর্শ-অবস্থানে ছিল না। বেহুলার ভাসান যাত্রায় দেখেছি বুড়নিয়ারা যোগী-বেশ ধারণ করেছে। তাদের বৃত্তি দস্যুতা ও লুণ্ঠন—

যত বুড়নিয়া তথি নিবসতিন্ত দুষ্টমতি

ভ্রমতি কপট মায়াবেশে ।

ললাটে উজ্জ্বল ফোটা কান্ধ শোভা যোগপাটা

পদ্মবীজে জপমালা করে।

মিছা মন্ত্র জপ করে। গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে

নিশি হইলে দুষ্ট বিত্তি করে।

ফেরার পথে লখিন্দর তাদের ধরে শূলে চড়িয়ে শাস্তি দিয়েছেন :

বুড়নিয়া যত কথা কহিলা লখাই তথা

শুনিরা হইল ক্রোধমুখি।

শীঘ্রগতি কূলে উঠে বুড়নিয়া যত কাটে

শুলে দিলা করি ঠেকাঠেকি।

বোঝা যাচ্ছে যোগীদের অবস্থা এই কাহিনি রচনার সময় মোটেই শ্রদ্ধাজনক ছিল না। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় যোগীদের ভূমিকার স্পষ্ট দুটি মাত্রা বেহুলা-লখিন্দর যখন যোগী বেশ ধারণ করেছেন তখনকার ধারণা যোগীদের জীবন ও সাধনা উচ্চমার্গের সম্মানজনক। পাশাপাশি যোগীরা যখন ভণ্ড - তখন সাধারণের দৃষ্টিতে তাদের কৃত্য মোটেই উচ্চমার্গের নয়। ভৈরব নামক যোগী কবির চোখে সম্মানিত হলেও কেউ কেউ তাকে ভালোচক্ষে দেখে না। এভাবে বিচার করলে এই কাব্যধারায় বাস্তবের দুটি অভিমুখ লক্ষ করা যাচ্ছে।

গণক :

স্ত্রীগণকের কথা লিখেছেন বিপ্রদাস। কাব্যের চতুর্থ পালায় দেখছি নেতা খড়ি হাতে গণনা করতে বসেছেন :

শুনিয়া পদ্মর বাণী করে লৈল খড়িখানি।

গণে নেতো এ তিন সংসার।

আমাদের মনে হয় না এটি কো-না বাস্তব চিত্র। মধ্যযুগে অনুরূপ পেশায় নারীর পক্ষে থাকা অসম্ভব ছিল। খনার কিংবদন্তির পিছনে সত্যস্পর্শ যদি কিছু থাকে, তা তুর্কি আক্রমণ পূর্বের সত্য বলেই মনে হয়।

দাস :

দাসপ্রথার পরিচয় মনসামঙ্গল কাব্যে অল্পবিস্তর পেয়েছি। গোরা মিনার গোলামের সংবাদ আছে হাসন হাটির বিবরণে । হাসনের বিবির সঙ্গে সাতজন বাদীর কথা জানিয়েছেন বিপ্রদাস। তাদের নানারকম কাজ, কেউ জল আনে, কেউ গো-মাংস পরিষ্কার করে আনে। উদের ছয় পুত্রের বস্ত্র যোগানোর দায়িত্বে ছিল দাসরা। স্নান সেরে আসার পর 'যার যেই গ্য বস্ত্র দাসেতে যোগান মুসলমান সমাজের গোলামদের ব্যবহার নিয়ে সামান্য আমোদ-কৌতুক করেছেন বিপ্রদাস। বিঘতিয়া সাপ যখন হাসনহাটির লোকজনকে নির্বিচারে বধ করছে, তখন এক গোলামের সাধ। হয়েছে মালিকের বিবিকে নিয়ে পালাবে :

মিঞা যদি ফৌত হইল গোলামের খোষ পাইল।

বিবি লইয়া পলাইতে চায়।

মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ বাস্তবের কিছু নিদর্শন মনসামঙ্গলে আছে। বোঝা যায়, হাসন- হাটির বর্ণনা দেবার সময় মুসলমান সমাজ বাংলায় রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত সৈয়দ হাসনকে কপূর তাম্বুল যোগান দেয় গোলাম, হাসনের শত বিবি, তিনি তাদের সঙ্গে আনন্দে রঙ্গ-তামাসায় দিন কাটান। কাজিরা মজলিস করে', 'খাতা তজবিজ করে।' সৈয়দ

মোল্লারা ধর্মপ্রাণ, তারা 'বিসমিল্লার নাম নিয়ে কাজ শুরু করে সদাই মক্তবে রুজু থাকে। এসব বর্ণনায় মুসলমান সমাজের আন্তরিক পরিচয়ের প্রমাণ পাচ্ছি। সাদিয়া গোলামরা বিশ্বস্ত, খাস চাকরের দায়িত্ব নিত। হাসান তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন নস্করদের ডেকে আনতে। সাদিয়া গোলাম তাই করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভাড়ু দত্ত চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিপ্রদাস একজন ভাড়ুর কথা বলেছেন। কৃষাণদের মণ্ডল জাতীয় চরিত্র ভাণ্ডু। মনসা গোরামিনার ৯৯ জন গোলামকে বন্ধ করে একজনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—সে ভাড়ু। উদ্দেশ্য হাসনের কাছে দুঃসংবাদ বহন করবে সে। এই ভাড় নামটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাড়ু দত্তকেই স্মরণ করায়। দরিদ্র মুসলমান চরিত্রও বিপ্রদাসের নজর এড়ায়নি। বিঘতিয়ার আক্রমণে নকড়ি নামক দরিদ্র মুসলমান যখন কেঁদে ওঠে-

মুরগী করিয়া কোলে নকড়ি কান্দিয়া বলে।

আজি কালি বদা পাড়িত।

নিঃস্ব দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের সংবাদ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। নকড়ি সেক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়।

শুধু মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দু সমাজেও পুরুষের বহুবিবাহ চালু ছিল, তার বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসা চণ্ডীকে পুনর্জীবন দান করবেন না, শিবকে আশ্বস্ত করে বললেন :

মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষমা।

আর একশত বিভা করাইব তোমা ।

নিছক সৎ-মায়ের প্রতি ক্ষোভ হলেও এখানে হিন্দু সমাজের বাস্তব ধরা পড়েছে বলেই মনে বাল্যবিবাহ ছিল সে সময়কার আর এক প্রথা। অতি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার কিছু

পরোক্ষ প্রমাণ আছে কাব্যের মধ্যে মনসা সনকার বোন মেনকা সেজে চাঁদ সদাগরের গৃহে প্রবেশ করার সময় শিরে কর হেনে বলেছেন :

সনকা চাঁদের রানী এর ভগিনী ।

পালাইল প্রভু : মোরে রাখি একাকিনী

সনকা অতি শৈশবকালেই চাঁদ সদাগরের পরিবারে এসেছেন, মেনকারও বিয়ে হয়েছে শৈশবে। তেমন ঘটনা না ঘটলে এরকম কাহিনি পরিকল্পনা সম্ভব হত না।

পুরুষের বহু নারী সম্ভোগ এবং নির্লজ্জ কামুকতার পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। শিব কালিদহে ডোম-নারীকে ভোগ করতে চেয়েছেন। পরে কুশলী রিপুকার সেজে চণ্ডীর কাঁচুলি সেলাই করে তাকে ভোগ করতে চেয়েছেন। পার্বতী শর্ত রক্ষার জন্যে তা স্বীকারও করেছেন। দেবতাদের যৌনজীবনে অনুরূপ স্বেচ্ছাচার অবশ্য পুরাণ সাহিত্যেও আছে। বিপ্রদাস সামান্য অভিনব পরিকল্পনার পরিচয় রেখেছেন— মহাব্যাঘ্র আর মনোরথের জন্মের পটভূমি প্রস্তুতিতে। ব্রহ্মার নির্লজ্জ কামুকতা সেখানে উপস্থিত। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। যে-কোন স্ত্রীলোককে ভোগ করার ইচ্ছা, নিজের স্ত্রীর কাছে শ্যালিকাকে ভোগ করার বাসনা জ্ঞাপন চাঁদসদাগরের চরিত্রের পক্ষে চরম অবনতির প্রমাণ। সনকা এই পরিস্থিতিতে নিজের বোন মেনকাকে বলেছেন :

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।।

মদনে কাতর হয়্যা চাহে আলিঙ্গন।।

কেমনে বলিব হেন ছার কুবচন

চাঁদ অবশ্য তার বাসনা স্পষ্ট করেই বলেছেন :

গুপ্তে সনকায় ডাকি বুঝাইয়া বলে।

তব ভগিনী দেখি অঙ্গ দহে কামানলে ।

তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার।

মনসাও সহজ ভাবেই বলেছেন : 'তুষিব নৃপতি তব পিরিতি কারণ'। বস্তুত মনসার অন্য পরিকল্পনা ছিল— চাঁদকে কাম-মোহিত করে মহাজ্ঞান হরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই তিনি সহজে চাঁদকে তুষ্ট করতে চেয়েছেন।

মহাজ্ঞান হরণের উদ্দেশ্যে সঙ্ক ধন্বন্তরির সঙ্গেও প্রায় একই রকম কামোত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন মনসা। সেখানেও সঙ্ক তার স্ত্রী কমলার সখীরূপী মনসাকে রাত্রে তাদের গৃহে থেকে যেতে বলছেন। স্বামী দুরন্ত দুরাচার ক্রোধী– একথা জেনে সঙ্ক বলেছেন ওষুধ দেবার কথা-- সেই ওষুধের প্রভাবে তার স্বামী দাসবৎ ব্যবহার করবেন তাঁর সঙ্গে!— সামগ্রিকভাবে মনসামঙ্গলে পাচ্ছি পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা আর যৌনজীবনে স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নির্লজ্জ কামুকতার পরিবেশ।

সহমরণ, স্বামীর চিতার আরোহণ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ বা সতীত্ব বিপ্রদাসের রচনায় কয়েকবার এসেছে। শিব দ্বিতীয় মন্থনজাত বিষ পান করে মারা গেল পার্বতী দেবতাদের অনুরোধ করেছেন :

'যদিমোর হিত চাহ চিতা সাজাইয়া দেহ

দেবতারা অনুরোধমত চিতা সজ্জা করেছেন :

তবে সর্ব দেবগণ চণ্ডিকার বোলে।

করিলা বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।

দিলেন চন্দন কাষ্ঠ ধৃত বহুতরে।

করাইয়া স্নান শোয়াইলা গঙ্গাধরে

কমলাও সঙ্ক ধন্বন্তরির মৃত্যুর পর চিতারোহণে প্রাণত্যাগের বাসনা জানিয়েছেন :

তেজিব জীবন আজি আনহ আগুনি।

এই বাস্তব মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিরূপটি যখন গড়ে উঠেছিল তখনকার হয়তো নয়; কারণ বেহুলা তাঁর দাদাদের স্পষ্টভাবেই বলেছেন- বৈধব্য সংস্কার মান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একদিকে নারীর সংযম, আত্মদহন আর অন্যদিকে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামী মনোভাব- দুই বিপরীত জীবনসত্য এই কাহিনিতে ধরা পড়েছে।

বাস্তুবিদ্যা :

বাংলার লোকায়ত শিল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করি মনসামঙ্গলে। বিশ্বকর্মা মনসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য শিল্পীদলকে নিয়ে যে-গৃহ নির্মাণ করেছেন, তাতে বাংলার লোক প্রচলিত শিল্পকলার পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে। পঁচিশ বর্গ হাত (৫ x ৫ হাত) পরিমাণ স্থানে 'পোতা' তৈরি করে কাথ নিবিড় করা, স্ফটিকের স্তম্ভ পুঁতে পাষাণের সাড়ক রুয়ে ভায়ানি চৌকাঠ, কপাট ও প্রাচীর রচনা-- উপরে সুবর্ণ কলস স্থাপন এবং সবার উপরে নেতের পতাকা উড়িয়ে এই গৃহ নির্মাণ করা হল। এই নির্মাণ-প্রণালী বাংলার লোকোপ্রচলিত ঐতিহ্যানুসৃত বাস্তুবিদ্যার ফল বলে মনে হয়।।

হাসন মনসার মন্দির নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। তার অর্থে তৈরি হয়েছে মন্দির। বাংলার আটচালা মন্দির স্থাপত্যের বিবরণটি সে যুগের বাস্তুবিদ্যার আর একটুখানি উপাদান বলে মনে করি। প্রথমে চারিধারে সূত্র দিয়ে মাপজোখ করে নেওয়া হল :

আজ্ঞা মাত্রে শিল্পকার সূত্রধরে চারিধার

এ পাষাণে গাঁধয়ে মনোহর।

করিয়া বিচিত্র চিত্র মন্দির গঠয় তত্র

দেখি হরষিত নৃপবর।

এবার দেওয়াল গাঁথা, চিত্রবর্ণ লাগানো, চারিদিকে স্ফটিক স্তম্ভ বসানো, দেওয়াল 'নিবাড়' করে দীর্ঘ চালের পত্তন করা হল :

দেয়াল নিবড় করি শিল্পকার ত্বরাত্বরি

করে দিঘ চালের পত্তন।

রুয়া পাতা, সাড়ক প্রস্তুতি, বন্ধন দান। 'ছিটনি' প্রস্তুত করার পর ঝুমকি দিয়ে চাল নিবাড় করে স্তম্ভের উপর দেওয়া হল 'স্বর্ণপাড়ী। তিলাটে তীর বসানো হলে তার উপর বাওলা' রেখে উপরে ভাণ্ডার' গেড়ে দেওয়া হল। ছাউনি তৈরি হল ময়ূরের পালকে ; দূর থেকে করা হল আয়তন :

বিচিত্র ময়ূর পাশে ছাওনি করিল সুখে

দেখি লাক ঝুরে অতিশয় ।

বেড়িয়া অনেক দূর। আয়তন কৈল পুর

যেন লেখি কৈলাস ভুবন !

লোহার বাসর গঠনের সময়ও এই রকম বাস্তকলার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাস্তবিদ্যার আর একটু পরিচয় পাওয়া গেছে নৌকা নির্মাণের অবকাশে দুর্লভ কান্ডারিকে ডেকে চল সাগর পুরানো নৌকো 'ডুবারু' দিয়ে গুড়ির জল থেকে তুলে আনিয়েছেন। তারপর সেই নৌকাগুলি দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। নৌকার গাব ধুনা দেওয়া হয়ছে-- তোলা হয়েছে 'মালুম কাঠ'।

৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজের লোকাচারের বর্ণনা দাও।

২। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষের জীবনের বর্ণনা দাও ।

মন্তব্য

৩। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণনাভঙ্গি ও কথনরীতি সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৪.৮ সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য
- বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল - অচিন্ত্য বিশ্বাস
- বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপালকৃষ্ণ বসু
- লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ - ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী।

একক ৫-লোরচন্দ্রানীর প্রেক্ষাপট ও কাব্য পরিচয়

বিন্যাস ক্রম

৫.১ ভূমিকা

৫.২ প্রেক্ষাপট ও স্বাতন্ত্র

৫.৩ কবিপরিচিতি ও কবি দৌলত কাজী

৫.৪ কবি সৈয়দ আলাওল

৫.৫ কাব্যরচনাকাল

৫.৬ কাহিনি পরিকল্পনা

৫.৭ নামকরণ

৫.৮ লোক উৎস ও লোক প্রভাব

৫.৯ অন্যান্য প্রভাব ও মঙ্গল কাব্যের প্রভাব

৫.১০ রামায়ন মহাভারত পুরাণ প্রসঙ্গ

৫.১১ বৈষ্ণব পদাবলী

৫.১২ সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যান্য কাব্যের প্রভাব

৫.১৩ সূফী প্রভাব

৫.১৪ নির্বাচিত প্রশ্ন

৫.১৫ সহায়ক গ্রন্থ

৫.১ ভূমিকা

দেববাদ নির্ভর মনুষ্যত্ববোধ এবং দেবপ্রশস্তিমূলক কাহিনিকাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয়। প্রথানুগত্যের ফাকে ফাকে হয় তো কবিরা সামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বিশুদ্ধ মানব বন্দনায়। কিন্তু সে অতি সামান্য। তা না হলে বিষয়ে, চরিত্রে, আখ্যান পরিকল্পনায় সর্বত্রই দেবতার কৃপা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে বর্ষিত হয়ে বিকাশের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করেছে। একই খাতে ও ধারায় চলতে চলতে কাব্যধারা হয়েছে মন্থর এবং অনেকটাই শিথিল। প্রেমের কিংবা আদিরসের মত বিষয়কেও. কবিরা ভক্তির মোড়কে পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এটাই কিন্তু শেষ পরিচয় নয়। নদীর গতি পরিবর্তনের মত তারও গতি পরিবর্তন এবং বাঁক ফেরার ইঙ্গিত আছে। আখ্যানকাব্যের কোন কোন বিষয়ে, কোন কোন চরিত্রে রক্তমাংসের বাস্তব মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট মানুষ উঁকি দিয়েছে। বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিপুল ধারায় যেখানে রাধা কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম কীর্তিত; সেখানে ভক্তি আবরণ সরালে তো বটেই, না সরালেও কবিরা যে তাঁদের চোখের সামনের মানুষের প্রেমসম্পর্ককেই রূপ দিয়েছেন, সন্দেহাতীতভাবে তা স্পষ্ট। সামান্য হলেও এইভাবে বাস্তব মানুষের প্রেম চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাও ভক্তির আড়ালে, দেবতাশ্রয়ী রূপকের আবরণে। রক্তমাংসের মানুষের কথা, তার ভাবনা-চিন্তা প্রেমাকুতির কথা তখনও পর্যন্ত অধরাই। এই সংশয় এবং অক্ষমতা দূর করতেই যেন চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা কলম ধরেছিলেন। রাতারাতি মধ্যযুগীয় দেববাদের আড়াল ও চাপকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রচনা করেছিলেন দেহবাদমুখর মুক্তপ্রেমের জয়গান। পূর্ববর্তী আখ্যান কাব্যের প্রথার প্রভাবে এই কবিরাও

হয়তো দেবতার উদ্দেশ্যে, পৃষ্ঠ-পোষক রাজা ও রাজ অমাত্যের উদ্দেশ্যে প্রশক্তিমূলক বন্দনা গেয়েছেন। কিন্তু কোনোভাবেই মুক্ত প্রাণের প্রতীক রোমান্টিক প্রেমের পথরোধ করে মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতাকে মুখ্য করে তোলেননি। মানুষই কাব্যের নায়ক -- এই ভাবনার প্রথম প্রবর্তকধর্মী সার্থক কবি চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার মুসলমান কবি দৌলত কাজী। তাছাড়াও আর একজন প্রতিভাধর পণ্ডিত কবির আবির্ভাবে আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত বোধ করেছিল। তিনি কবি সৈয়দ আলাওল। কবি আলাওলই দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' সমাপ্ত করেছিলেন। এঁরা দুজনই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

৫.২ প্রেক্ষাপট ও স্বাতন্ত্র্য

কবি দৌলত কাজী একেবারে রাতারাতি নতুন ভাবনার আমদানি করলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে এমনটা ভাবা সঙ্গত নয়। চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবের যে প্রেমাকাঙক্ষা দেবভাবনার আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল, অথচ কোন প্রতিভাধর প্রবর্তক কবির কাব্যে তা রূপ পাচ্ছিল না – পঞ্চদশ সোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবিরাই প্রথম বিশুদ্ধ অর্থে । মানব প্রেমের বন্দনা গান গাইলেন। হয়তো তা বিষয়-বিন্যাসে কাব্য পরিকল্পনা লাভ করল না; কিন্ত তার সূত্রপাতটি ঘটে গেল এই কবিদের হাতেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রধান তিন মুসলমান কবি – শাহ মুহম্মদ সগির, জৈনুদ্দিন ও মোজাম্মিল। যদিও কোথাও কোথাও এঁদের ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলা হয়েছে। এদের কেউ কেউ কোরান, হাদিস, পীর-পয়গম্বর আল্লা প্রমুখ ধর্মীয় ভাবনাকে কাব্যের বিষয় করে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আবার কোন কোন কবির কাব্য বিষয় সম্পূর্ণ অর্থে মানব প্রেম। শাহ মুহম্মদ সাগিরের 'ইউসুফ জোলেখা'-ই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম পার্থিব প্রেমের কাব্য। সাহিত্যের ইতিহাসকার তসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, "...যখন হিন্দু কবিরাও দেবদেব। ভিন্ন লৌকিক কাহিনি গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, তখন এই মুসলমান কবি পার্থিব কাহিনি লইয়া যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা

প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ডঃ ১ম পর্ব)। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই জাগতিক প্রেমেরই পরিপুষ্টি বিধান করেছিলেন আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল।

ধর্মমতে আরাকান রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ । এই বৌদ্ধ রাজসভাতেই অনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় মুসলিম প্রভাব। পরিলক্ষিত হয়। কারণ চট্টগ্রামের আরাকান ঐ সময় থেকেই আরবী ও বাঙ্গালী মুসলমানের বাণিজ্য ও যাতায়াতের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গৌড়ে পাঠান শাসনের অবসানে ঐ অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যচর্চা সুদুর আরাকানে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু আরাকান নয়, বাংলা সাহিত্যের চর্চা পল্লবিত হয় ত্রিপুরা, কামরুপ, চট্টগ্রাম, মল্লভূম প্রভৃতি বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে। "বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে আরাকান রাজসভার সঙ্গে গৌড় রাজসভার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গৌড়ের বাঙ্গালী মুসলমানগণ রাোমাঙ্গে যাওয়া-আসা করতে শুরু করেন। ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠে" (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, সম্পাদনাঃ ড. মযহারুল ইসলাম, ড. দুলাল চোধুরী)। আরাকানের বৌদ্ধ মগ রাজারা বাংলা ভাষা বুঝতেন না। কিন্তু এই রাজাদের বিশ্বস্ত বাঙালি মুসলমানগণ, যাঁরা প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, সমর সচিব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্মানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারা বাংলা ভাষা বুঝতেন এবং হিন্দুদের মতো বাঙলা ভাষাচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত বাঙলা সাহিত্য অনুরাগী এই মুসলমান অমাত্যবই কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতেন বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে।

মেঙৎ-চৌ-মৌন, থিরি-থু-ধুম্মা, নরপদিগ্যি, সান্দথুধম্মা, থদো মিন্তার প্রমুখ আরাকান বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকার্যে এইরকম। অনেক গুণী দক্ষ মুসলমান অমাত্যের উপস্থিতি ঘটেছিল। যাদের কর্মদক্ষতায় এবং সাহচর্যে মুগ্ধ বৌদ্ধ রাজারা মুসলমান উপাধি গ্রহণ করে এবং মুদ্রায় তা উৎকীর্ণ করে গৌরব বোধ করতেন। এইরকম এক বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধম্মা বা

শ্রীসুধর্মার (১৬২২-১৬৩৮খ্রী) অমাত্য ছিলেন আশরফ খান। যার উৎসাহ ও আদেশে কবি দৌলত কাজী তার সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' নামক বিখ্যাত কাব্যটি রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রী সুধর্মার সময় থেকেই রোসাঙ রাজদরবারে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে এইরকম অনেক গুণী ও সাহিত্যরসিক অমাত্যের উৎসাহ ও পৃষ্ঠ পোষকতার ধারা অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধ রাজ থদে মিত্তারের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর, যিনি নিজেও একজন বড় কবি, তিনিই বিপদে পতিত কবি আলাওলকে বিপদমুক্ত করেন। এরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহদানে আলাওল লেখেন বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্য এবং কবি হিসেবে সুপরিচিত হন।

৫.৩ কবিপরিচিতি - দৌলত কাজী

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের পরিচয় একটা কুহেলিকাপূর্ণ বিষয়। হয় পৃষ্ঠপোষক রাজা কিংবা রাজকর্মচারীর সময়কাল, নয় ভনিতায় ব্যবহৃত কাব্যপংক্তির উপর নির্ভর করে পণ্ডিত গবেষকরা একটা সম্ভাব্য কবি পরিচয় উপস্থাপিত করেন। মধ্যযুগের মুসলমান কবি দৌলত কাজী এই আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ছিলেন আবার অতিমাত্রায় বিমুখ । তাই তাঁর পরিচয়ের সত্যতায় জোর করে কিছু বলার অধিকার কিংবা উপায় নেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং কবি রচিত 'সতীময়না' অবলম্বনে কবি দৌলত কাজীর একটি অনুমান নির্ভর পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সূত্রে বলা যায়, সম্ভবত চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় এক বিখ্যাত কাজী বংশে দৌলত কাজীর জন্ম হয়। বাঙালি মুসলমান এই কবি চট্টগ্রামের বৌদ্ধ রাজ থিরি-থু-ধম্মার সময় সচিব আশরফ খানের প্রিয় পাত্র ছিলেন। যাঁর ইচ্ছায় এবং আপেল। দৌলত কাজী কাব্য রচনা করেছিলেন। থিরি-থু-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালের (১৬২ ২-১৬৩৮ খ্রীঃ) কোন এক সময় কবির । কাব্যারম্ভ এবং সুধর্মার রাজত্বকালের মধ্যেই কাব্য অসমাপ্ত রেখে কবির মৃত্যুবরণ । স্বভাবতই সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় কবির জন্মগ্রহণ, এটা মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই।

মন্তব্য

দৌলত কাজী প্রতিভাধর কবি। বাল্যাবস্থা থেকেই এই প্রতিভার প্রতিফলন পাওয়া যায়- সঙ্গীত রচনার মধ্যে এবং নানাবিধ শাস্ত্র পাঠের ফলে আহৃত পণ্ডিত্যে। এব্যাপারে কবি ইসলাম-গোঁড়মিকে প্রশ্রয় না দিয়ে উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু ইসলাম ধর্ম - তৌহিদ, তমুদ্দন, হাদিস, শরিয়ত প্রভৃতির মধ্যে নিজের জ্ঞানপিপাসাকে সীমাবদ্ধ না রেখে হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্র কাব্যের মধ্যে অবাধ বিচরণ করেছেন। তার একমাত্র ও অতিপরিচিত কাব্য 'সতীময়না'-তে এই উভয় সংস্কৃতির আশ্চর্য ছায়াপাত ও সমন্বয় ঘটেছে। এই প্রতিভাধর কবির বাল্যাবস্থার পাণ্ডিত্য পরিচয় জন্মস্থানের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পণ্ডিত রসিক বলে দাবী করা পরিজনকে খুশী করতে পারেনি। স্বভাবতই এইসব প্রভাবজনিত প্রতিবন্ধকতার কারণে কবিযশপ্রার্থী দৌলত কাজীর আগমন ঘটে আরাকান রাজসভায়। তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছলতাও জন্মস্থান ত্যাগ করার অন্যতম একটি কারণ। কবির পাণ্ডিত্য, কবিত্ববোধ গুণী আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মাকে মুগ্ধ করে এবং সেই রাজার প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যে দৌলত কাজী রাজসভায় একজন সুধী হিসেবে গৃহীত হন।

দৌলত কাজীর কাব্য থেকেই জানা যায়, আরাকান রাজ থিরি-থু-ধম্মার 'বিপিনবিহারে'-র -খাশমেজাজের সময় পাত্রমিত্রদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন লস্কর-উজীর শ্রী আশরফ খান। সেই অরণ্য সভাতেই 'অরবি ফার্সি নানা তত্ত্ব উপদেশ'-সহ 'গুজরাতী,গোহারী, ঠেট ভাষা বহুতর' -- শ্রবণ ও আলোচনাকালে আশরফ খান কবিকে আদেশ দিলেন -

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধন।

বুঝে গোহারীভাষা কোন কোন জন।

দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দে।

সকলে শুনিয়া যেন বুঝত্র আনন্দে।"

সাধনের ঠেটগোগাহারী ভাষায় রচিত লোরকরাজা ও তৎপত্নী সতীময়নার কাহিনি বাঙালির পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য ছিল। পয়ার ছন্দে পাঁচালী বন্ধে বাংলা ভাষায় সেই কাব্যকে অনুবাদে-মৌলিকতায় আশরফ খানের নির্দেশে কবি বাংলা ভাষায় রূপদানে মনস্থ হন --

"তবে কাজী দৌলতি বুঝি সে আরতি।

পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।"

লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়নার গল্প দৌলত কাজীর মৌলিক সৃষ্টি নয়। কিন্তু কবি প্রতিভার মৌলিকতা – একটা সামান্য রূপকথাধর্মী গল্পকে দীর্ঘ কাব্যাকারে সার্থকভাবে পরিবেশনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাব্যটির দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরেই আনুঃ ১৬৩৮ খ্রষ্টাব্দে কবির মৃত্যু ঘটে। অসমাপ্ত এক-তৃতীয়াংশ রচনা করে কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল।

৫.৪ কবি সৈয়দ আলাওল

আরাকান রাজসভার অপর এক বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল। আধুনিক পূর্ব কবিরূপে এবং বিভিন্ন কাব্যমধ্যে উল্লিখিত নিজের বক্তব্যের কারণে আলাওলের পরিচয়ও সংশয়াচ্ছন্ন ও নানামত উদ্রেককারী। নিজের জন্মস্থান সম্বন্ধে কবি নিজেরই উক্তি এইরকম-

"গৌড়মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদভূম।

বৈসে সাধু সৎলোক হর্ষ মনোরম

ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য।

রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।

আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্যত নয়।"

(পদ্মাবতী, ড. শহীদুল্লাহ সম্পাদিত)

‘সতীময়না' কাব্যের সে তাংশ আলাওল রচিত, সেই অংশেও কবি ‘গৌরমধ্যে মুলুক ফতেহাবাদ শ্রেষ্ঠ কিংবা ‘মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে তামান' -- জাতীয় মন্তব্য করেছেন। এইসব বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, “তাহার পৈতৃক নিবাস মল্লুক ফতেহাবাদ"-এর অন্তর্গত জালালপুর। অনেকের মতে এই স্থান চাটিগাঁয়ের মধ্যে ছিল। কিন্তু কবি লিখিয়াছেন, ‘মলুক ফতেহাবাদ’ গৌড়েতে প্রধান এবং “ভাগীরথী গঙ্গাধার কহে মধ্যে রাজ্য", সুতরাং ইহা পশ্চিম অথবা মধ্য বঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন)। এইসময় ফতেহাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন মজলিস কুতুব এবং কবির পিতা ছিলেন “রাজ্যেশ্বর" মজলিস কুতুবেরই একজন অমাত্য। কবির জন্মকাল সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহের বিবেচনা অনুসারে বলা যায় কবির জন্ম হয় ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দীর্ঘজীবী কবি মৃতুবরণ করেন ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে।

বিচিত্র জীবন কবি আলাওলের। জলপথে নৌকাযোগে যাওয়ার সময় হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পিতার মৃত্যু ঘটে এবং কবি আরাকান রাজ্যসভায় অতিকষ্টে উপস্থিত হন। অশ্বারাোহী সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হয়েও সঙ্গীত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জোরে তাকে ‘তালিব আলিম’ -- সম্মানীয় উপাধি দিয়ে রাজসভার সভাসদ হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয়। এই উদ্যোগে রাজমন্ত্রী সোলেমানের ভূমিকাই প্রধান। দৌলত উজীর এই সোলেমানের নির্দেশেই আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য ‘লোর-চন্দ্রাণী সম্পূর্ণ করেন আনুমানিক ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কবি মাগন ঠাকুরের সাহচর্য্যে কবি বিখ্যাত ‘পদ্মাবতী’ ও, ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' গ্রন্থগুলি রচনা করেন। এই সময় শাহসূজার আরাকানে আগমন এবং আস্থানীয় আলাওল সন্দেহপরবশ পঞ্চাশ দিন কারাবাসে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি মাসুদ শাহার আনুকূল্যে কবির কারাবাস পর্ব সমাপ্ত হয় এবং তিনি আরাকানরাজ শ্রী চন্দ্রসুধর্মার নির্দেশে ‘সেকেন্দার নামা’ -- অনুবাদ করেন। বিচিত্র জীবনের অধিকারী কবি আলাওল বহু গ্রন্থ প্রণেতা মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত কবি।

৫.৫ কাব্য রচনাকাল

কবি পরিচয়ের মত প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের রচনাকালও সংশয়নির্ভর, অনুমানসাপেক্ষ। কোন কোন কবি অবশ্য সাংকেতিক প্রহেলিকাময় ভাষায় কাব্যরচনা কালের ইঙ্গিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করায় মনযোগী হয়েছেন। কিন্তু সেখানে এই জাতীয় সংকেত নেই, যেমন দৌলত কাজীর কাব্যে যেখানে পৃষ্ঠপোষক রাজার শাসনকাল সহ অন্যান্য তথের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে তানুমান ও সম্ভাবনার সাহায্যে গড়ে তোলা সেই রচনাকালকে যথার্থ বলে কোনভাবেই দাবী করা যায় না। সেক্ষেত্রে 'সতীময়না' কাব্যে আরো জটিলতা উপস্থিত। কেননা দৌলত কাজীই এই কাব্যের একমাত্র কবি নন; তার অসমাপ্ত কাব্যকে সমাপ্ত করেন আলাওল। অতএব শুরু এবং শেষ এই দুই মিলেই 'সতীময়না'-কাব্যের পরিপূর্ণ কাব্যরচনাকাল।

দৌলত কাজীর 'সতীময়না' কাব্যে নির্দিষ্ট কোন সন তারিখের উল্লেখ নেই। ড. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাব্যটির রচনাকাল বলে অনুমান করেছেন। রোসান রাজ শ্রী সুধর্মার রাজত্বকাল বিস্তৃত ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ । রোসান রাজ শ্রীসুধর্মা কিন্তু ষোল বছরের রাজত্বকালের দীর্ঘ বারো বছর রাজা থেকেও অভিষিক্ত হননি। অর্থাৎ তিনি অনভিষিক্ত রাজা ছিলেন। ড. ঘোষাল মনে করেন, "...ইহার কারণ, এক গণৎকার নাকি ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। সে জন্য ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, নরবলি প্রভৃতি নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান সহযোগে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রবেশিকা, ১ম খণ্ড)। রাজা সুধর্মার অভিষেক না হওয়ার ঘটনা সমর্থিত হয় দৌলত কাজীর নিজের বক্তব্যে --

"মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন।

তান হস্তে রাজনীতি কৈল্য সমর্পণ।"

বক্তব্যটিতে সুধর্মা রাজা হয়েও আশরফ খানের রাজ্য পরিচালনার কথা সমর্থিত হয়। একইভাবে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যদি রাজা সুধর্মার রাজ্যাভিষেক ঘটে এবং দৌলত কাজীর কাব্যে তার বর্ণনা মেলে; তাহলে প্রমাণিত হয় দৌলত কাজী ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং কাব্যরচনায় নিয়োজিত ছিলেন। কাব্যরচনা সম্পর্কিত এই সংশয় জটিলতায় ডঃ মযহারুল ইসলাম : করেছেন, "..কবি ত্রিশ বছর বয়সে শ্রী সুধর্মার রাজসভায় ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রবেশ করেন এবং ১৬৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'সতীময়না' কাব্যটি রচনা আরম্ভ করেন ও ১৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কাব্যটি অসমাপ্ত রেখেই মৃত্যুমুখে পতিত হন" (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, সম্পাদনা ড. মযহারুল ইসলাম, ৬. দুলাল চৌধুরী)। শেষ পর্যন্ত অনুমান করতে হয় যে ১৬৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কোন এক সময়ে দৌলত কাজী কাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬৩৫-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন এবং কাব্যটি অসমাপ্ত থাকে।

'সতীময়না' কাব্যের এই অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন কবি সৈয়দ আলাওল। আরাকান রাজ সান্দথুধম্মা বা চন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২-৮৪ খ্র.) রাজত্বকালে মুখ্য অমাত্য ছিলেন সুলেমান। এই সুলেমানের নির্দেশেই কবি 'সতীময়না'-কাব্য সমাপ্ত করেন এবং প্রহেলিকাময় পয়ারে সমাপ্তিকাল নির্দেশ করেন ---

"মুসলমানী শকসংখ্যা শুন দিআ মন।

অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধি মন্ত জন।

সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনা দুই দিগে।

সূত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে।

মগদের সনের শুনহ বিবরণ।

যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন।"

সাংকেতিক স্তবকটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সিন্ধু অর্থে সমুদ্র অর্থাৎ সংখ্যা ৭, কলানিধি অর্থে চন্দ্র অর্থাৎ ১. গণনাটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়ায় মুসলমানী শক অর্থাৎ ১০৭০ হিজরী। আবার ১০৭০ হিজরী সমান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। আবার মগী সনের বিচারে দেখা যাচ্ছে - এক জোড়া শূন্যের মধ্যে যুগ অর্থাৎ ২ এবং মৃগাঙ্ক অর্থাৎ চন্দ্র, সংখ্যা হল ১. স্বভাবতই যথার্থ মগী সনটি হল ১০২০। মগী সনের সূত্রপাত ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব আলাওল রচিত সংকেতটি থেকে -বাঝা যাচ্ছে যে, লোরচন্দ্রণীর সমাপ্তিকাল ১০২০ + ৬৩৮ = ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ । সুতরাং সতীময়না' কাব্যটি দৌলতকাজী আরম্ভ করেন অনুমানিক ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং আলাওলের হাতে কাব্যটি সমাপ্ত হয় মোটামুটি ১৬৫৮-১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

সতীময়নার কাহিনি

দৌলত কাজী বাংলা 'সতীময়না'-কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়। নানা জায়গা থেকে বিশেষ করে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা লোক বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে মিয়া সাধনের হিন্দী (অবধি) ভাষায় রচিত 'মৈনাসৎ'-কাব্যের বাংলা তানবাদ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের দু'জন বড় কবির একজন দৌলত কাজী। রূপকথাধর্মী একটি -ছাট প্রচলিত গ্রাম্য গল্পই দৌলত কাজীর অবলম্বন তবে 'সতীময়না'-মূলের যথাযথ অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদ বললেও সবটা বলা হয় না। আয়তনের বিস্কৃতি, কাব্যপরিকল্পনা, কল্পনার স্বকীয়তা ইত্যাদি নানাভাবে বিচার করলে 'সতীময়না' দৌলত কাজীর মৌলিক সৃষ্টি বলেই মনে হয়।

'সতীময়না'-র কাহিনিবস্তু চমৎকার। গোহারী দেশের রাজার সঙ্গে রূপসী রাজকন্যা ময়নাবতীর বিবাহ হয়। রাজা ও রাণীর আনন্দপূর্ণ সুখের জীবন। তাদের এই পরিপূর্ণ সুখের সময় সেদেশে এলেন এক যোগী এই যোগী রাজা লোরকে এক অসামান্য রূপসীনারীর চিত্রপট দেখালেন। অপরূপ এই নারী মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রাণী -

"রূপে চন্দ্র সম নহে, সে চান্দ গোহারি।

গগাহারি রাজ্যের যেন প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা।

চন্দ্রমা না হয় চান্দ গোহারি উপমা।"

চাণীর অসামান্য রূপলাবণযুক্ত চিত্রপট দেখে রাজা -লার আত্মসম্বিতহারা। এদিকে চন্দ্রাণী বিবাহিতা, তার স্বামীর নাম বামন। কিন্তু বামনের দাম্পত্য জীবন সুখের নয়, কেননা বামন নপুংসক 'রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।' চন্দ্রাণী দর্শনে ব্যাকুল রাজা লোরের এই উৎসাহ প্রতিনিবৃত্ত না করে যোগী তাকে উৎসাহিত করে বললেন –

"চন্দ্রাণী তোমার মিলন মনোরম।

বিদ্যাসঙ্গে সুন্দরের সে সমাগম |"

যোগীকে সঙ্গে নিয়ে লোর তাই মোহরা দেশে যাত্রা করলে সে দেশের রাজা যথারীতি লোরকে সম্মান অভ্যর্থনা জানালেন। চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ কিন্তু কিছুতেই মেলে না। কারণ রাজকন্যা চন্দ্রাণীর জনসমক্ষে আবির্ভাব ঘটে না। শুধু নগর ভ্রমণ কন্যা বৎসরে দুবার।' উৎসব উপলক্ষেও সে দু'বার তার দেবস্থানে আগমন ঘটত, তখনও সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার অনুমোদিত ছিল না। শেষপর্যন্ত লার ও চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরস্পরের প্রতি চুড়ান্তভাবে আকৃষ্ট হন! চন্দ্রাণী আবার রাজা লোরের রূপে এতটাই বিমুগ্ধ যে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে প্রায় যোগিনীর রূপ ধারণ করেন। লোর-চন্দ্রাণীর এই দর্শন-মিলনে ধাই বুদ্ধি শিখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এসবের মধ্যে বামন কর্তৃক বিনাশের ভয়, মিলনের বাধা, চন্দ্রাণী কতৃক কূলনাশের আশঙ্কা ইত্যাদি ভাবনা একত্রিত হলে উভয়ের পলায়ন সংঘটিত হয়। খবর পেয়েই বামন চন্দ্রাণীর খোঁজে এবং নারীচোর' লোরের হাত থেকে স্ত্রী উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। বামন-লোরের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং শেষপর্যন্ত রাজা ললারের হাতে খর্বাকৃতি মহাবীর বামনের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

এই অবস্থায় চন্দ্রাণীকে সাপে কামড়ালে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। রাজা লোরের বিলাপে সেখানে এক তপস্বীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি অলৌকিক ক্ষমতায় চন্দ্রাণীর জীবনদান করেন।

এদিকে চন্দ্রাণীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়া মোহরা রাজ সেখানে উপস্থিত হলে লোর বিপদ ভেবে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মোহরা রাজ এক ব্রাহ্মণকে দূত রূপে পাঠিয়ে লোর ও চন্দ্রাণীকে স্বীকার ও গ্রহণের বার্তা লোরের কাছে প্রেরণ করেন। লোরকে তিনি জানান -

"কুলের চন্দ্রিমা মোর কুমারী চন্দ্রাণী।

সেই ভাল হৈল, হৈছে তোমার রমনী।

বিশেষতঃ যোগ্য যুক্ত নৃপতি লোরক।

তুমি বিনে নাহি মোর রাজ্যের পালক।

রাজা মোহর লোর-চন্দ্রাণীকে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। উভয়ের বিবাহ সংঘটিত হলে লোর মোহরা রাজ্যের রাজভার গ্রহণ করে রাজা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।চন্দ্রাণীর সঙ্গে রঙ্গলীলার বিপরীতে বিস্মৃত প্রথমা পত্নী ময়নার দুঃখ-ভাগ ও বিরহকাতরতার কথা 'সতীময়না' কাব্যের দ্বিতীয়। খণ্ডের সূত্রপাত --

"অথাতে চন্দ্রাণী সঙ্গে রহিলা লোরক রঙ্গে

গোহারিতে হই মহীপাল।।

নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম পুজে নিতি

স্বামি বর মাগে সর্ব কাল।"

স্বামী বিস্মৃতা অসহায় নারীর একাকী বেদনা ও বিরহযন্ত্রণা অনুভবের মাঝেই আবির্ভাব ঘটে ইতর চরিত্র ছাতনকুমারের। ময়নার জীবনের এইরকম অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণে মনস্থ হয়ে লম্পট রাজকুমার ছাতনকুমার রতনা নাম্নী এক মালিনীকে দৌত্যকাজে নিয়োজিত করে। কামভজনাকারী চতুরা নারী মালিনী বারমাসের অন্তর্গত আষাঢ় মাসসহ অন্যান্য মাসের দুঃখ বর্ণনায় ময়নাবতীর দুঃখকষ্টের পাশাপাশি ভরা যৌবনকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে ছাতনকুমারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে ভোগ করার কামনাময় ইঙ্গিত দেয়। সতী।

নারী ময়না সতীত্বধর্মে অবিচল থেকে মালিনীকে গঞ্জনা-ভৎসনা করে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে জানান –

“লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।

কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।

গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।।

দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ।।

মালিনী কর্তৃক ময়নাবতীকে বিপথে পরিচালনা করার চেষ্টা এবং চরিত্রের সংযমে ও শুদ্ধ তায় ময়নার তা প্রতিহত করার মধ্যেই দৌলত কাজীর রচনা সমাপ্ত হয়। তাও আবার কবি বারমাস্যার আলোচিত জ্যৈষ্ঠ মাসের আর মাত্র করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। আলাওল এই শেষ অংশের রচয়িতা। খোদাতালাকে প্রণাম নিবেদন করে তিনি কাব্যরচনার সূত্রপাত করেছেন। দৌলত কাজীর অসমাপ্ত অংশই যে তার আরব্ধ সে কথা ভোলেননি কবি

“আষাঢ়ের আদ্যবার মাস আরম্ভিল।

বৈশাখ সমাপ্তে জ্যৈষ্ঠে প্রশঙ্গে কহিল ।

তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত চলইন।

আলাওল বারমাস্যা সমাপ্ত করে কাহিনির মধ্যে রতনকলিকা উপকাহিনির অবতারণা ঘটালেন। শেষপর্যন্ত সখীর পরামর্শে ময়না শুকপাখি সহ এক ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিলেন মোহরা দেশে। এদিকে প্রচণ্ডতপন নামে চন্দ্রাণীর গর্ভে লোরের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। এই অবস্থায় ময়না প্রেরিত শুকপাখি ও ব্রাহ্মণের কৌশলে রাজা ললারের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠলে তিনি পুত্রের হাতে মোহরা দেশের রাজ্যভার তার্পন করে চন্দ্রাণীকে নিয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ময়না ও চন্দ্রাণীকে নিয়ে সুখে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর

নির্দিষ্ট সময়ে লোরের মৃত্যু হলে – দুই রানী লোরের চিতায় সহমৃতা হলে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

৫.৬ কাহিনি পরিকল্পনা

দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভা অবিসংবাদিত। দেশময় অলৌকিক দেবলীলায় কিংবা দেবায়িত মনুষ্যত্ববোধে কাব্যপূরিপূর্ণ; মধ্যযুণের ভক্তিতরল সেই আবহাওয়ায় দৌলত কাজীর জৈবপ্রম নির্ভর রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান এককথায় বিস্ময়ের। রোমান্স ধর্মের নবীন আস্বাদ দৌলত কাজীব পূর্বে কুতুবনের 'গাবতী' কাব্যে পাওয়া গেলেও এই পথে কাব্যচর্চায় হিন্দু কবিদের ছিল দ্বিধা এবং মানসিক সমর্থনের অভাব। সতীময়না'-কাব্যে দৌলত কাজী পার্থিব প্রেমের জয়গান গাইতে বসে পূর্ববর্তী সব দ্বিধা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজে ছিলেন সুফী সাধক ও কবি। সহজিয়া ভাবসাধনাই কবিকে নর-নারীর প্রেম চিত্রণে উৎসাহিত করে থাকবে।

'সতীময়না' দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য। কবি যেটুকু রচনা করেছিলেন তাতেই তার সাফল্য বিস্ময়কর। সে বিস্ময় কাবাপরিকল্পনায়, অভিনব আখ্যান বিন্যাসে, অসাধারণ শিল্প পরিমিতি বোধে। এই বিচারে তিনি শুধু মধ্যযুগের নন, আধুনিক কালেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। দৌলত কাজী প্রাচীন লোকগাথা থেকে কাহিনির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। দাউদের 'চন্দ্রায়ন'-কাব্যের বিষয়ও কবিকে সাহায্য করে থাকবে। তবে সে কাব্যটির ভাবানুবাদে বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে 'সতীময়না'-র পরিকল্পনা - সেই কাব্যটি ঠেট গোহারী ভাষায় রচিত মিয়া সাধনের অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কাব্য 'মৈনাসৎ'। প্রত্যক্ষ প্রভাব বলতে এটুকুই। বাকী সমস্ত বিষয়ে দৌলত কাজী 'সতীময়না' কাব্যকে মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রথা মেনে দৌলত কাজীও দেব বন্দনা এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজ অমাত্যের প্রশস্তি রচনা করেছে। আশ্চর্যের বিষয় এইসব গতানুগতিক অংশেও কবি অসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রান্তবাংলা আরাকান ও নদীবেষ্টিত চট্টগ্রামের

সে প্রাকৃতিক বর্ণনা কাব্যে পরিবেশিত – চুড়ান্ত শিল্পবোধ না থাকলে এ বর্ণনা গড়ে ওঠে না। অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজ। মাত্যের প্রশস্তি অংশে এমন একজন তথ্যসমৃদ্ধ সমাজসচেতন কবির পরিচয় মেলে, মধ্যযুগের অপর এক বিখ্যাত কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে যাঁর একমাত্র তুলনা চলে। রাজা শ্রী সুধর্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি লিখেছেন –

"শম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।

প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।"

সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়াও এই বক্তব্যে আরাকান রাজসভায় একটা উদার উপযুক্ত পরিবেশের ছবিই ইঙ্গিতমুখর হয়ে ওঠে। এই মুক্তপরিবেশ মুসলমান কবিদের সাম্প্রদয়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক কাব্য রচনায় প্রণোদিত করেছিল। ভাবলে অবাক লাগে সেকালে জাত পাতের বিচারে মানুষের মুক্তপ্রাণ প্রতি পদে-পদে লাঞ্ছিত ও প্রতিহত ছিল; সেইযুগে আরাকানের রাজসভায় একটা সর্বধর্মী সমন্বয়ের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। কবি তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই মহামতি শ্রীযুক্ত আশরফ খানকে সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনায় প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক সমাজের ছবি উজ্জ্বল করে এঁকেছিল –

'নানা জাতি লোক সবে ধরিল যোগান।

সভাতে বসিলা শ্রী আশরফ খান।

সৈয়দ শেখ আদি মোগল পাঠান।

স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান ||

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।

সারি সারি বসি চলন্ত যেন মহেশ্বর।"

'বন্দনা' ও 'মহম্মদের সিফত -- এই দুটি অংশেই শুধু ইসলাম ধর্মের গুণকীর্তন আছে নাহলে সমগ্র কাব্যে হিন্দু ও মুসলমান সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রধান কারণ বোধহয় দেবমহিমা বর্জন করে মানব প্রেম ও তার মহিমাকে সম্মানীয় আসন দানের বাসনা।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোককথা, যার সঙ্গে রূপকথার ভাবনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এমন বিষয়কেই দৌলত কাজী সুসংহত অথচ রসময়তায় গতিশীল কাব্যমূর্তি দান করেছেন। ফলে 'সতীময়না'-কাব্যটি ক্লাসিক ও -রামান্টিকধর্মের অপূর্ব সমন্বয় সহাবস্থানে তানন্য শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। সুরাত্মক ধীরগতির পয়ার ছন্দে বর্ণনার উত্থান পতন এবং চরিত্রের অন্তর্বর্তী ভাবরাজ্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাধিকাংশ আমলেই সুচারুরূপে উত্থাপিত হয় না। এ-ব্যাপারেও দৌলত কাজী প্রশংসনীয়, গৌরব দাবী করতে পারেন। ময়নার সঙ্গে গোপন মিলনের সময় রাজা ললারের অ্যাডভেঞ্চার ধর্মের বর্ণনায় কবির কবিত্বশক্তি সীমাহীন –

'হাতে খড় শোভে নেত ধরা পরিধান।

বীরমূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান ||

কপালে দোলায় মণি কুণ্ডল শ্রবণে ।

চন্দনে চর্চিত তনু প্রসন্ন বদনে।"

সমগ্র কবি জুড়ে এই জাতীয় বর্ণনাভঙ্গি মুক্তাহারের মত ছড়িয়ে আছে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, "লোরের বনগমন এবং যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর চিত্র দর্শন, অভিযাত্রা, বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত অথচ রসগ্রাহী। ময়নাবর্তীকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য মালিনী ও ছাতনের ষড়যন্ত্র কাহিনিকে উপন্যাসাপম অথচ সম্মত করে তুলেছে" (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী সম্পাদনা, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ দুলাল চৌধুরী)। বীরত্ব, প্রেম, নিয়তির রহস্যময়তা, যুদ্ধ , অলৌকিক কাহিনির সমাহার, মানবোচিত প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশ বর্ণময় কল্পনায় চিত্রিত হলে রোমান্সধর্মী বিষয়ের মর্যাদা

পায়। এক রাজার ছিল এক রানী – রূপকথার এই ঢঙে সাজিয়ে দিয়ে দৌলত কাজী ‘সতীময়না’ কাব্যে একসাথে লোককথা রূপকথা জাতীয় -রামান্সধর্মীতা এবং বাস্তবজগতের মানুষের ছবি হিসেবে মর্ত্যজীবনের ছবিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। রাজা লোর ও বামনের নারীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে রূপকথার জগতের প্যাটার্ন প্রতিবিম্বিত হয় ঠিকই; কিন্তু বাস্তবসিক সত্যতাও সুচারুরূপে কাব্যে স্থান করে নেয়। সেকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে জয়ী রাজা পরাজিত রাজার রাজাই শুধু অধিগ্রহণ করতেন তাই নয়, সেই রাজ্যের রাজকুমারী এবং সুন্দরী যুবতী রাজমহিষীর উপরও বিজীত রাজার কর্তৃত্ব

জন্মাত।

নিপুণভাবে গল্প বলার এই ক্ষমতাই দৌলত কাজীকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। রূপকথার অলৌকিকতা মাখা কাহিনি যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখনই রোমান্সধর্মী কাব্য হয়ে ওঠে পুরাপুরি রোমান্সের অতিপ্রাকৃত ধর্ম বহন করে না। কবি দৌলত কাজী এ-ব্যাপারে শুধু সচেতন ছিলেন তাই নয়, যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়ই উপস্থাপিত করেছেন। বর্ণনাভঙ্গ শীতে হয়-তা কবি রূপকথার জগতের আমদানি ঘটিয়েছেন; কিন্তু মূলগল্প সত্যজীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে উপন্যাস ধর্ম বহন করে সতবস্তুর নির্মাণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনির মধ্যে এসেছে অসাধারণ জীবন দর্শন। কারণ সাহিত্যে শিল্পে আমরা আমাদের চারিপাশের জীবনকেই অনুসন্ধান করি। কবি-শিল্পী সেই জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে একটা জীবন দর্শনও গড়ে তোলেন। কখনো বিষয় বর্ণনার মধ্যে, কখনো চরিত্র নির্মাণে ‘সতীময়না' কাব্যে যোগ বিষয়ক দর্শন।

“নয়ন মদিয়া। পাতাল ভেদিয়া

দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।

স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কূর্ম থাকি

কুর্মে ডিম্ব দৃষ্টি ধরে।”

যোগ দর্শনের মূল কথা অসাধারণ কাব্যমূর্তি লাভ করেছে। স্বামী প্রসঙ্গে নারীর জীবন দর্শনও দৌলত কাজীর বর্ণনায় বাত্ময় হয়ে উঠেছে।

"পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।

মুখ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্য জঞ্জাল।"

শুধু দর্শন নয়, সমগ্র কাব্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসাধারণ বাক্যবন্ধ। জীবনের নানা দিক অপূর্ব সত্যদৃষ্টিতে ছুঁয়ে যায় এই বাক্যগুলি। প্রাজ্ঞতার সুচারু উপস্থাপনে এই পর্যায়ে কবি ভারতচন্দ্রের কথাই মনে হয়। সতীময়না' কাব্যে রচিত ঐ রকম কয়েকটি বাক্যবন্ধ।

(ক) যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।

তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎসনা ।

(খ) যুবক পুরুষজাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।

এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।

(গ) পুরুষ ভ্রমরা জাতি মধু যথা পায়

সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায়।

'সতীময়না' কাব্যে কবি আসলে জীবনের বিচিত্র রূপকেই চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যের প্রধান রস জীবনরস – নরনারীর বিচিত্র প্রেমলীলাই যার উৎসভূমি। কবির কৃতিত্ব, তিনি একটি সরলরৈখিক প্রেমচিত্রণ উপহার দেননি। ময়নার সতীত্বে প্রেমের অবিচল নিষ্ঠা, রোমান্টিক প্রেমের দূরবর্তী প্রেমকাঙক্ষারই অপূর্ব মূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই চরিত্রের দুঃখ-ভাগ ও যন্ত্রণা বারোমাস্যার বর্ণনায় বাস্তবের মৃত্তিকা সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছে –

"চাকা চকীরে জিনি রজনী দম্পতি বিনি

একাকিনী জাগি প্রেম-ত্রাসেরে।

লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর

তনু দহে মদন-হুতাশে রে।"

মর্ত্যজীবন পিপাসা চন্দ্রাণী চরিত্রটিকে আদ্যন্ত রোমান্টিক করে তুলেছে। প্রেমের মহিমা ও সৌন্দর্য মিশে গেছে চন্দ্রাণী চরিত্রে। "তাই আদর্শ নারী সতীময়না 'টাইপ' চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, আর চন্দ্রাণীর উজ্জ্বল নায়িকামূর্তি জীবনচাঞ্চল্যে অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ও প্রথম পর্ব, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ময়না চরিত্রটি 'টাইপ' কিনা তা তর্কসাপেক্ষ, তবে চন্দ্রাণী এবং লোর-চন্দ্রাণীর সম্পর্ক মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট নর-নারীর সত্যবন্ধ প্রেম আখ্যান। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে লোর একাধারে রোমান্টিক ও বাস্তববাদী হয়ে কাব্যমধ্যে নিজের জায়গা সুনিশ্চিত করে প্রকৃতপক্ষে মানবের দ্বৈত সত্তাকেই রূপায়িত করেছে। অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকা এবং হয়ে ওঠাও প্রশংসনীয়।

দৌলত কাজী মুসলমান কবি, কিন্তু জন্মসূত্রে বাঙালি। তাই বাংলার সমাজ জীবনের ছবি; বাঙালি চরিত্র, প্রকৃতি বর্ণনায় বাংলাদেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সঙ্কেতে কাহিনি প্রধান হয়ে ওঠেনি; বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবন ভাবনাই কাব্যের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ধরা পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন চৈতন্যভাবাশ্রিত বৈষব প্রভাব। যে কারণে বৈষ্ণব পদের মত ছন্দ ও ভাব লালিতে প্রশংসনীয় কিছুপদ কবির রসবোধ, ভাষা ও ছন্দ-নির্মাণ ক্ষমতার স্বাক্ষর রূপে দেখা দিয়েছে। লোরের জন্য ময়নার। বিরহ, বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়ের পদকেই মনে করায় –

"মালিনি কি কহব বেদনা ওর।।

মে বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।"

বৈষ্ণবীয় প্রেম-বা, সূফীধর্মের সহজ জীবনানন্দ মিলেমিশে 'সতীময়না কাব্যে মাটি ও মাটির মানুষকেই প্রধান বিষয় করে তুলেছে। দেহবাদী এবং দেহাতীত এই প্রেমভাবনায় দেবতা নয় মানুষই প্রধান অবলম্বন। দৌলত কাজীর কাব্যে এই নরস্তুতি ও নরললাই প্রধান –

“নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।

ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান।।

নয় বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।

নর সে পরম দেব তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান।”

উপকাহিনি সংযোজন, গীতিধর্ম ও নাটকীয়তার আভাস - যাই হোক না কেন, কবি আসলে সমগ্র কাব্যে এই মানুষকেই সন্তান। করেছেন। তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির মৃতুতে কাব্য সেখানে থেমে গেছে -- সেখানেও সেই মানুষের দুঃখ-বাধ আকাশ স্পর্শ করেছে।

দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে আলাওল অভিনব কোন কবি দৃষ্টির পরিচয় রাখেন নি। বরং রোমান্টিক প্রেমাবেগ ও জীবন রস-রসিকতায় দৌলত কাজী সেখানে মানব প্রেমকেই জয়যুক্ত করেছেন; আলাওল সেখানে পাণ্ডিত্য ও তত্ত দর্শনের রসহীনতায় জট পাকিয়ে ফেলেছেন। আলাওলের রচনাংশে দেববন্দনা, পৃষ্ঠ-পাষকের স্তুতি অযথা উপকাহিনির উপস্থিতি ঘটেছে; কিন্তু জীবনের সহজ দাবি ও মানব প্রেমের যথার্থ আকুতি হারিয়ে গেছে। একটি অসাধারণ রোমান্টিক প্রেমের গল্পকে যথার্থ পথে পরিচালিত হতে না দিয়ে মহৎ সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটিয়েছেন আলাওল। কাব্য সমাপ্তির পূর্বে সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার

“শ্রীযুক্ত দৌলত কাজী মহা গুণবন্ত।

তানে আদ্যে করিয়া রচিল আদি অন্ত ।।

তান সম আমার না হয় পদগাঁথা।

গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা ।”

আলাওলের এই বক্তব্য অক্ষমতাজনিত যে বিনয়, তাতে পুরো সত্য প্রতিফলিত নয়। কবি হিসেবেও আলাওল প্রতিভাধর এবং তিনি দলও কাজীর মত সূফী সাধক ও কবি। মানুষ ও

তার প্রেম কথা এই কবিরও মূল লক্ষ্য। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই মূল বিষয়টিকেই ছুঁতে চেয়েছেন কবি

"কমল মনোহর উদত্র হিমকর

শীতল নির্মল রাতিয়া ।।

নয়ন রঞ্জন চঞ্চল খঞ্জন

বিরাজে শারদ ভাতিয়া।"

রোমান্টিক প্রেমের জটিল আখ্যান হিসেবে কাব্যবিষয় হয়তো এক; কিন্তু কবি হিসাবে দৌলত কাজী ও আলওল পৃথক কবি। তাই কাব্য পরিকল্পনা, দার্শনিক বোধে, কবিমানসিকতায় উভয়ের পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। সূফী ধর্মের প্রেম ও বিরহ চিন্তা, সর্বোপরি ভুবনজয়ী প্রেমের স্তুতির বর্ণনায় উভয় কবিকে একাসনে বসানোও; স্বকীয় দর্শনে নিজস্বতাও গড়ে তুলেছে। রতনকলিকা উপাখ্যান অংশে আলাওলের সেই বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রতিভাত হয়েছে। ভাগ্যনির্ভরতার পাশে আত্মবিশ্বাস এবং জীবনে এই দুইয়ের। সমন্বয় সাধনই আলাওলের জীবনদর্শন ও তার মৌলিকতা। এই মৌলিকতার প্রতিফলন কাব্যের উপসংহারেও। মিলন এবং মিলনোত্তর মৃত্যুজনিত বিষাদে তালাওলকৃত কাব্যাংশের সমাপ্তি। কাব্যের এক জায়গায় দৌলত কাজীর বক্তব্য ছিল –

"ময়নাবতী রাজ্যে লোরেন্দ্র আইল পুনি।

তবে কোন উপাত্র করিলেক চন্দ্ররানী।

কোন মতে এ তিন মিলিবে তার সঙ্গ।

কোন মতে ময়না সঙ্গে ছাতনা প্রসঙ্গ ।"

দৌলত কাজীর কাব্যসমাপ্তির এই মিলন ভাবনার পরিবর্তে আলাওলের বিষাদাত্মক পরিণতিতে কাব্যসমাপ্তির পরিকল্পনাকে কবির অসংগতি বোধের অভাব ভাবলে ভুল হবে।

প্রাপ্তি নয় অপ্রাপ্তি, দেহ নয় দেহাতীত, সীমা নয় অসীমাকুতিই রোমান্টিকতার বিষয়। সেক্ষেত্রে রোমান্টিক প্রেমের রহস্যময় বিষয়কে বেদনাবিধুর সমাপ্তি দান করে কবি আলাওল প্রকৃতপক্ষে কাব্যে মূল বিষয়ের প্রতি মনুগত থেকে তাঁর কাব্যদৃষ্টির মৌলিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

কাব্যপরিকল্পনায় প্রসাধনকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদার প্রেমের ভাব এই বিষয়ে দৌলত কাজীকে সংকীর্ণতার জগত থেকে ও দিয়েছিল। অন্তর্বর্তী কাব্যশক্তির সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ললিতমাধুর্য 'সতীময়না' কাব্যের ভাব-ভাষা নির্মাণে সহায়তা করেছিল। ছন্দনির্মাণে ভাবদেহ গঠনে জয়দেবের প্রভাব কবি দৌলত অস্বীকার করতে পারেন নি -

"কোকিল কাকলী কলকল কুজিত

লুলিত ললিত নিকুঞ্জে।"

৫.৭ নামকরণ

নামকরণের সঙ্গে লেখকের একটি ভাবনা ও উদ্দেশ্য জড়িয়ে থাকে। গ্রন্থের নামকরণ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য নামকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। দৌলত কাজী সচেতন শিল্পী হিসেবে কাব্যের নামকরণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির 'সতীময়না'-কাব্যের উৎস মৌলিক বিষয়বস্তুত নয়, পূর্ববর্তী হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসৎ'-কাব্যের বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের নামকরণ দৌলত কাজীর নামকরণের ব্যাপারে; একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে সে কথা যথার্থ। করলেই দেখা যাবে বিশেষ চরিত্রের নামেই নামকরণের প্রথা। মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এমনকী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত - চরিত্রনির্ভর প্রথানুযায়ী নামকরণ।

মিয়া সাধনের কাব্যের নাম 'মৈনাসৎ'। কাব্যের নামকরণেই প্রমাণিত ময়নার সতীত্বই এই কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য। দৌলত কাজী তারই অনুসরণে কাব্যের নামকরণ করেছেন 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী"। ময়নার অবিচলিত সতীত্বের জয়গান গাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে

মন্তব্য

দৌলত কাজী ‘সতীময়না' নামকরণে শিল্প সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। সতীময়না' নামকরণটি তার পক্ষে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ময়নার সতীত্ব প্রদর্শনে কাব্যপরিকল্পনার সূত্রপাত। বন্দনা অংশগুলি বর্ণনার পরেই কবির ‘কথারম্ভ শিরোনামে বর্ণিত মূল বিষয় ময়না --

“রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী

ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী।।”

লক্ষ্য বস্তুকেই যে কবি পাঠকের সামনে আলোকিত ও উন্মোচিত করতে চাইছেন, ময়নার বর্ণনা দিয়ে মূল গল্পের অবতারণে সেকথাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে !

দৌলত কাজী বড় কবি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি দরবারী কবিও বটে। দরবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কবি তাই ময়নার সতীত্বেই আটকে পড়েননি। অতিদ্রুত কাহিনির মধ্যে রামান্টিক প্রেমের যাবতীয় উপাদান সমেত লোর চন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দৌলত কাজীর মৌলিকত্ব এবং অমরতা-বিষয় পরিবেশনের এই মুন্সীয়ানায়। আনুপূর্বিক ময়নার সতীত্ব ও পতিব্রত্য পরিকল্পিত হলে, দরবারের খোরাক কোনোভাবেই মিটত না। সুন্দরী পত্নী ভুলে অপর এক সুন্দরী রমণীর জন্য রাজা লোরের উন্মাদনার যদি ময়নার প্রসঙ্গই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করত; তাহলে ‘সতীময়না' কাব্যের রোমান্টিক প্রেমের রহস্য রোমঞ্চ এমন করে দানা বেঁধে উঠত না। অপূর্ব শিল্পবোধে কৰি তাই ময়নার স্বামী বিচ্ছেদ কাতরা বিরহ ব্যাকুলতার স্বল্পাকৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেই লোর-চন্দ্রাণী রোমান্টিক প্রেমের ইন্দ্রধনু গড়ে তুলেছেন। ময়নার প্রসঙ্গে ধ্রুব আদর্শ এবং লোর-চন্দ্রাণীর উদ্দাম প্রেমে কবি মানুষের স্বভাবজাত প্রতিরোধ্য তাকাঙ্খার ছবি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। সতীময়না'-কাব্যের এই নামকরণের সঙ্গে তাই অপূর্ব সঙ্গতিবোধে যুক্ত হয়েছে | লোরচন্দ্রাণী' শীর্ষক নামকরণ। দরবারী সাহিত্যের অনুকুলে লোরের বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা এবং রোমান্টিক প্রেমাবেগ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে ‘লোরচন্দ্রাণী নামকরণটিকে যথার্থ করে তুলেছেন কবি।

দৌলত কাজীর নামকরণ অনুসরণ করলেই আখ্যান বিন্যাসে দুটি বিভাজন ব্যঞ্জনধর্মী হয়ে ওঠে। ময়নার প্রসঙ্গ দিয়ে যে কাহিনির সূত্রপাত, নাটকীয়ভাবে সেখানে এক যোগীর আবির্ভাব ঘটিয়ে কবি কাহিনির গতিপথ চন্দ্রাণীর অভিমুখে নিয়ে গেছেন। একটি ইর কাহিনির মধ্যে মুহূর্তেই প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত তৈরী করে কবি কাব্যমধ্যবর্তী গল্পকেই দীর্ঘায়িত করলেন তাই নয়, বৈচিত্র এবং নতুনত্বের মামদানিতে পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত করে তুললেন। পরবর্তী ঘটনাগুলিতে কবি এমন এক রুদ্ধ শ্বাস অবস্থা তৈরী করলেন, যার চমৎকারিত্বে এবং রূপকথার বর্ণালেপনে পাঠকের মনে অবিরত চমকিত হয়ে উঠলো।

মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প। মুহূর্তেই ফুরিয়ে যাবে, নানারকম বিষয়ের আমদানিতে তার গৃহবদ্ধ প্রাণকে আকুলি-বিকুলি করে তুলবে না। কবি দৌলত কাজী এটা জানতেন। তাই যোগীর প্রদর্শিত সৌন্দর্য মোহ শুধু রাজা লোরকেই আবিষ্ট করল না; দুঃসাহসিক রোমান্সের পিঠে ভর করে পাঠকও স্বপ্ন সৌন্দর্যের দেশে উপস্থিত হল মুহূর্তেই।

লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনি অংশে কবির সংযমবোধও অসাধারণ। রাজ্য লোর চঞ্চল স্বভাবের কারণে চন্দ্রাণীর জন্য ছুটে গেলেও, চন্দ্রাণীকে কবি কেবল কামনা জগতের রাণী কিংবা কামসর্বস্ব নারী হিসেবে উপস্থিত করলেন না। স্বামী মিলনে অতৃপ্ত এক নারীকে ময়নার মত বিশুদ্ধ আদর্শের পথে পরিচালিত না করে, চন্দ্রাণীকে রোমান্স জগতের আধিবাসী করে তুললেন। বিষাদকাতরতা বা অপ্তি রোমান্টিকতার অন্যতম উপাদান হওয়ায় লোর বা চন্দ্রাণীর রোমান্টিক জগতে পদচারণা করতে বাধা রইল না। লোরের মধ্যে নিয়ে এলেন কবি সৌন্দর্য-মোহ এবং রূপের জন্য আগ্রাসী ব্যাকুলতা এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা। চন্দ্রাণীকেও কবি এই সাম্রাজ্যের যথার্থ অধীশ্বরী করে তুললেন। একের পর এক বর্ণিল ঘটনার আমদানিতে কবি রহস্যময় রোমান্টিক দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। রূপোন্মত্ত লোর-চন্দ্রাণীর গোপন মিলন, দুঃসাহসিক রোমান্টিকতায় চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোরের পলায়ন, বানের সঙ্গে লওরের যুদ্ধ, তন্দ্রাণীর সর্পদংশন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ ঘটনায় লোর-

চন্দ্রাণীর ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ দ্দেশ্য নিয়ে যে বিষয়ের প্রতি লেখকের মনোযাগ গড়ে ওঠে, সমগ্র কাহিনির অঙ্গীভূত অপরিহার্য হয়ে ওঠে ঘটনা বিষয় নামকরণের ক্ষেত্রে তাকে স্বীকারের উপায় নেই। ময়নার সতীত্ব প্রতিপাদনই হয়তো লেখকের প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনিও প্রাধান্য অর্জনে পুরোপুরি সফল। ময়নার ঘটনার পাশাপাশি লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনি কেন্দ্রীয় ঘটনা। নামকরণ হিসেবে 'সতীময়না'র সহযোগী 'লোর-চন্দ্রাণী'ও সুপ্রাসঙ্গিক ও যথার্থ।

নামকরণের ক্ষেত্রে 'সতীময়না' ও 'লোর-চন্দ্রাণী' পুরস্পরের পরিপূরক। লেখকের উদ্দেশ্যও তাই। সূফী ধর্মের প্রভাবে দেহের মধ্যে দেহাতীতের উপলব্ধি দৌলত কাজীকে দেহভাবনাযুক্ত প্রেমের মধ্যে আদর্শায়িত প্রেম সন্ধানে উন্মুখ করে তুলেছে। লোর-চন্দ্রাণীর দেহকেন্দ্রিক রোমান্টিক প্রেমের বিপরীতে ময়নার অবিচল আদর্শ উজ্জ্বল প্রেমের ছবি তাই এঁকেছেন কবি। দেহধারী মানুষের মধ্যে যে দুই প্রকার প্রেমের অস্তিত্বই বিরাজমান এটা ফুটিয়ে তোলাও হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য। তবে স্পষ্ট করে একটা কথা বলা যায় যে, লোর-চন্দ্রাণীর রোমান্টিক প্রেম সম্পর্ক এবং ময়নার আদর্শপুষ্ট প্রেম ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কবির এই সুনিপুণ পরিকল্পনায় কাহিনির মধ্যে বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত তৈরী হয়েছে একথা যেমন সত্য; দুই ধারণার সমন্বয় ভাবনার মধ্যে কবির বিশেষ দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে। সতীময়না ও লোর-চন্দ্রাণী'-র পূর্ণ কাব্যনামের প্রথমাংশে সতীময়নার নামই উল্লিখিত। কাব্য আখ্যান পরিকল্পনার উগ্রবর্তী ভূমিকা ময়নারই। কবির যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য এবং দর্শন এই নামকরণ পরিকল্পনায় আভাসিত, আয়াসহীনভাবে সে কথা অনুধাবনযোগ্য। আসলে বিপুল ভোগের পেছনেই যে মহৎ ত্যাগ বিরাজিত, কামনা মদির প্রেমের পাশেই কল্যাণমুখী প্রেম উজ্জ্বলতায় স্থিত – ময়নার বিস্তৃত : বারমাস্যা বর্ণনায় কবি সে কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সামান্য সুখভোগের কারণে যদি মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসটাই হারিয়ে যায়, তাহলে তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে তাই শত প্রলোভন ও প্ররোচনায় স্কুল রুচির মানুষ ছাতন কুমারের দূতী ভ্রষ্টা রতনা-ময়নাকে নিজের দর্শন ও সতীত্বের স্বর্ণ সিংহাসন থেকে সরাতে পারেনি। দীর্ঘ এগারো মাস

ধরে রতনা মালিনী দেহ ও ভোগের রঙিন রাজ্যে ময়নাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। আর প্রতিবারই ময়নার অন্তরের স্বচ্ছ চেতনার আলো মালিনীর বক্তব্য প্রতিহত করেছে। কামনার পিচ্ছিল স্রোতে ভেসে না গিয়ে ময়না বলেছে --

"প্রাণের দুর্লভ কান্ত। দেখিলে হৃদয়ে শান্ত

আঁখি যুগে পিয়ার আনন্দ।

মধুর-মূরতি পতি আলোল-বিলোল গতি

অমৃত মণ্ডলী মুখ-চান্দ।।"

বারমাস্যার দীঘ বর্ণনায় দৌলত কাজী প্রকৃতপক্ষে, ময়না চরিত্রের অবিচল দৃঢ়তার অক্ষুন্ন রূপটি তুলে ধরেছেন। ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি চির বিচ্ছেদ জয় করে বেঁচে থাকার দর্শন ময়নার মধ্যে নেই। কিন্তু প্রেমের জন্য দিবস রজনীর বিপুল প্রতীক্ষা, ময়নার সতীত্ব এবং চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। লোর-চন্দ্রাণীর কামনা মদির রোমান্স ভাবনার উজ্জ্বল ছটা থিতিয়ে গেলেই ময়নার আরাধ্য প্রেমের দেখা মেলে। বৈষ্ণব পদারেরা ঠিক এই কারণেই জীবাত্মা রাধার অভিসার যাত্রাকে এত বিপদসঙ্কুল, এত আশল্প জর্জরিত ভীষণ করে। তুলেছেন। যা সহজেই পাওয়া যায়, সেখানে প্রাণের ভালোবাসা, আত্মার জাগরণ ঘটে না। প্রিয়তমকে পেতে হলে, তার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে 'দুতর পন্থ গমনধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি'-র অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হয়। দৌলত কাজী 'সতীময়না'-কাব্যে প্রেমের এই প্রগাঢ় দর্শনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কবি আলাওলও দৌলত কাজীর এই প্রেম দর্শনের অনুকূলে তার রচনা পরিকল্পনা করেছেন। সেই কারণেই আলাওঁল যে অংশটুকু রচনা করেছেন, তাতেও সতীময়না ইতর মালিনীকে তাড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি সখীর কাছে রতনকলিকার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার কাহিনি শুনে নিজের মনোবল বাড়িয়ে নেওয়ার প্রেরণালাভ করে। কাব্যের উপসংহারে ললারের সঙ্গে ময়নার মিলনে প্রেম ও সতীত্ব জয়যুক্ত হলে 'সতীময়না' নামকরণটি সুপ্রযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, এই বৈশিষ্ট্যে।

৫.৮ লোক উৎস ও লোক প্রভাব

দৌলত কাজীর 'সতীময়না'-কাব্য আরাকান রাজসভার প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। কাব্যটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়, অনুবাদমূলক। যে কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'সতীময়না পরিকল্পিত হিন্দী কবি সাধনের সেই কাব্যটির নামে 'মৈনাসৎ'। বিহার অঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথার উপর ভিত্তি করে সাধন তাঁর কাব্যটি গড়ে তোলেন। নিজ কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজী এ প্রসঙ্গে নিজেই জানিয়েছে -

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।।

না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।"

গ্রাম হিন্দী ভাষায় রচিত এই কাহিনি মহামতি শ্রী আশরাফ খানের নির্দেশে সহজবোধ বাংলায় রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কবি দৌলত কাজী --

"দেশীভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।।

সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।

তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি।

পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।"

সাধনের 'মৈনাসং-কাব্যটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং এর বিষয় প্রচলিত লোক প্রেম গাথা। লোর-চন্দ্রাণীর প্রেম আখ্যান বিহার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কিংবদন্তীর মতো নানাভাবে একটুখানি পরিবর্তিত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কবি সাধন প্রচলিত এইরকম কোন কাহিনিকে স্বল্প পরিসরে কিন্তু কাব্যের আকৃতিতে পরিবেশন করেন। নিজের বক্তব্যে দৌলত কাজী সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং অনুবাদে তার কাব্য রচনার কথা জানালেও আধুনিক গবেষকরা এতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন

‘সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী-র উপাখ্যান লৌক ঐতিহ্যের প্রসারিত ক্ষেত্রে বর্তমান। পণ্ডিত-গবেষকদের শ্রমলব্ধ গবেষণায় লোর-চন্দ্রাণীর লোক প্রেম গাথার নানামুখী উৎস বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেনের মনে হয়েছে, “মিয়া সাধনের রচনার বাহিরেও লোর-চন্দ্রার কাহিনি সেকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অজ্ঞাত ছিল না।” অজ্ঞাত তো ছিলই না বরং বিচিত্র মাধ্যমে বহুল জনপ্রিয়তায় এই লোক কাহিনিটি জনসাধারণের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। গবেষকদের আবিষ্কৃত তথ্য অনুসারে বলা যেতে পারে আকর হিসেবে লোর-চন্দ্রাণীর প্রেম উপাখ্যান মাধ্যম ভিন্ন হলেও স্বীকৃত। এইরকম জনপ্রিয় একটি লোককথাই কবি শিল্পীদের উৎসাহিত করেছে নানা শিল্পমাধ্যমে একে রূপায়িত করতে। শুরুতেই যে উৎসটি নজরে আসে তা লোকনৃত্য। চতুর্দশ শতাব্দীর বিহারে মৈথিল ভাষায় রচিত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের ‘বর্ণনরত্নাকরে'- “-লারিকনাচ'-এর উল্লেখ মেলে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “গ্রীয়ার্সন সাহেব শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় দক্ষিণ বিহারের গোয়ালাদের (আহীর) সমাজে প্রচলিত লোরিক মল্লের গান সংগ্রহ করেন। ... লোহার মিউজিয়ামে ‘লোরচন্দ্রাণী’র কাহিনি বিষয়ক যে চিত্রগুলি আছে, তাহা লোরচন্দ্রাণীর কাহিনিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও তৃতীয় ও প্রথম পর্ব)।

লোকসংগীতের উৎসে আরো একটি সংযোজন – Folksongs of Chattishgarh (Bombay, 1946, P 338-70) নামক লোকসংগীত সংগ্রহে ভেরিয়ার এলউইনের আবিষ্কৃত আর একটি গীতির উল্লেখে। উৎস হিসেবে লোকগীত বা গাথার দাবি প্রতিষ্ঠিত, অগ্রা বিশ্ববিলয়ে থেকে ‘চন্দায়ন’ নামক লোকগাথা ও লোকগীতি সংগ্রহের প্রকাশে। মুল্লা দাউদ এই লোকগাথাটির রচয়িতা। চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা নূর ও চন্দার প্রেমকাহিনি এই লোকগাথা; ‘চন্দাবত’ বা ‘চন্দায়ন’ নামেও যা পরিচিত। লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনি যা লোক-চিত্রকলায় রূপায়িত এবং লাহের মিউজিয়মে রক্ষিত এই উৎস বিভিন্নভাবে সমর্থিত হয়। “ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার যে লোরচন্দ্রার বারমাসীর দুই প্রস্থ চিত্র লোহার

মিউজিয়াম ও চণ্ডীগড় মিউজিয়ামের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। এর উল্লেখ । পাওয়া যায় বসিল গ্রে সম্পাদিত Rajput Paintings -এর মধ্যে (The Faber Gallery Oriental Art, পৃঃ ৮)" (সতীময়না ও -লালচ:দণী ও সম্পাদনা, উঃ মযহারুল ইসলাম ও ডঃ দুলাল চৌধুরী)।

লোকনৃত্যে কিংবা লোকসঙ্গীতে লোরক মল্ল - চানায়ন বা চন্দ্রাণীর লোকপ্রেম গাথাই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে কিংবা ইঙ্গিতে ধৃত। এ থেকে একটা কথা প্রমাণিত, প্রায় একই গল্প চরিত্রে, নামে কিংবা উপস্থাপনে পরিবর্তিত হয়ে এই সব নানান লোক ঐহিত্যে পরিবেশিত হয়েছে। এই প্রেম উপাখ্যান সাহিত্য স্থান লাভের পূর্বে সামান্য পরিবর্তিত কাহিনি হিসেবে লোকগাথা ও উপকথায় ছড়িয়ে ছিল। সেই'র একটি উৎস ছত্তীশগট উপকথা। এই উপকথার কাহিনিতেও আদিরস দুর্বল বামনের স্ত্রী চন্দ্রানীর । অতৃপ্তকাম চন্দ্রাণীর পিত্রালয়ে বারবার পালিয়ে আসার কালে অন্যরকম বিষয় হিসাবে – বঁধোবা নাম্নী চামারের চলৈণীর দুঃসাহসিক পিছু নেওয়ায় এই চামারকে শাস্তি দেওয়ার কারণে চন্দ্রাণীর মা'র বীরপুরুষ লোরকে আহ্বান। উপকথার এই কাহিনিতে মেলে স্ত্রী কোরিয়া ঞ্জরী)-কে সঙ্গে নিয়েই লোরের চরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ন হওয়া। পরবর্তী অংশে যথারীতি লোর-চন্দ্রানীর অনুরাগ সঞ্চার, দড়ি বেয়ে লোরের চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন এবং এক সময়ে দুই জনের পলায়ন বর্ণিত। এর প্রতিক্রিয়ায় যথারীতি বামনের লোরচন্দ্রানীর পিছু নেওয়ার ঘটনা ঘটে। এই অংশে গহিনির স্বাতন্ত্রে লোর চন্দ্রানীর স্থানীয় রাজাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ, দুই সতীনের কোন্দলে। অসমাপ্ত এই লোককাহিনিই একটি কথা প্রমাণ করে, সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গৃহীত কাহিনি স্রষ্টার নিজেব অঞ্চলের প্রচলিত লোকগাথার প্রভাবেই বর্ণিত।।

মোঃ দাউদের 'দায়ন'-সাহিত্য কর্ম । অতএব এই গ্রন্থে একটি রীতিমাফিক প্রকাশিত কাহিনি পরিচয় মেলে। অধ্যাপক হাসান তাসকার! ভূপাল থেকে এই গ্রন্থের একটি সচিত্র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় কবি ফিরোজ শাহ তু'জকের মন্ত্রী খনই জাহাঙ্গীরকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। কাহিনি পরিকল্পনায় লিখিত

এই গ্রন্থটি কিংবা অন্য গ্রন্থগুলির অন্তর্বর্তী - কাহিনির প্রভাব কবি দৌলত কাজীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। চাইন' কাব্যের কাহিনিতে পাওয়া যায় কন্যা চনবা বা চন্দা রাজা সহদেবের কন্যা। বিবাহ চেষ্টার মধ্যে মনোমত পাত্রের মধ্যে লোকে পাবার আশায় সে গৃহত্যাগ করে। অত্যাচাবিত চামারের। প্রসঙ্গ এই কাহিনিতেও আছে, অত্যাচারিত গউরা রাজ্যের জনসাধারণের কাতর আবেদনে এবং চন্দার প্রার্থনায় লোর ঐ বাঁধার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দোলাচলচিত্ত চন্দার একবার পিত্রালয়ে গমন এবং তৎক্ষণাৎ প্রিয়তম ললারের সঙ্গে মিলনের। ব্যাকুলতায় পিতৃগৃহ ত্যাগে মধ্য দিয়ে এই কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

'লোর-চন্দ্রাণী'-র কাহিনি সম্বলিত অন্য দুটি গ্রন্থের উল্লেখ মেলে (১) হায়দ্রাবাদের সালারজঙ্গ মিউজিয়ামে রণি) দক্ষিণী ভাষায় রচিত মৈনা সতবন্তী' গ্রন্থ (২)গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুবের সভাকবির ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'চন্দ্রা-লোরক' গ্রন্থ। মৈনা সতবন্তী' গ্রন্থের কাহিনি কিন্তু অনেকটাই আলাদা। একই দেশের গোয়ালার পুত্র লোরক এবং সুন্দরী রাজকন্যা মৈনার বিবাহিত জীবন ছিল সুখের। কালক্রমে ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের বশবর্তী পশুচরানো কালীন সময়ে লোর দারুণভাবে আকৃষ্ট হয় চন্দা নাম্নী এক যুবতীর প্রতি। মিলনের অপ্রতিরোধ্য তাগিদে পলায়নের সিদ্ধান্ত উভয়কে একদিন পালাতে বাধ্য করে। অন্যদিকে দুষ্ট লোকের শত প্রলোভনেও মৈনাব সতীত্ব বিচলিত হয় না। কাহিনি মধ্যবর্তী চরিত্রের নামগুলিতে এবং শেষাংশের ঘটনার সঙ্গে 'সতীময়না'-র আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থ নিহিত কাহিনির আলোচনায় লোকধর্ম লোকগাথাকে আশ্রয় করে যে পুরোপুরি রক্ষিত; কাহিনির অল্পবিস্তর বদবদলেও সে মূলধর্মের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এ কথা যথার্থ। সেই সূত্রে সভাকবি গাওয়াসির 'চা-লোরক' -গ্রন্থে Folk motif - যে পুরোপুরি রক্ষিত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অমর আত্মা (Immortal Soul) দেবতা ও মানুষের সম্পর্ক, স্বপ্ন দর্শন (Dreams)। তালৌকিক ক্রিয়া (Supernatural and Magic lore) -প্রভৃতিতে যে লোককথার '-মাটিফ' -পুরোপুরি রক্ষিত তা বলাই বাহুলা।

লোককাহিনির বিশেষ ধর্মই হ'ল তা নির্দিষ্ট একটি-দুটি 'Folk motif -কে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়।

'লোর-চন্দ্রাণী'র প্রেম কাহিনি নির্ভর যে লোকধর্মী গ্রন্থটির প্রভাব দৌলত কাজীর নিজের বক্তব্যে স্বীকৃত, গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় রচিত অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সেই কাব্যটি মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ'। মিয়া সাধনের এই গ্রন্থটির সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় Tessitori - রচিত "A Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Manuscripts' গ্রন্থ থেকে, কয়েক বছর আগে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিন্দী বিদ্যাপীঠ-গ্রন্থ-বীথিকায়' মৈনাসৎ' কাব্যটি মুদ্রিত হয়েছে। এই মুদ্রিত কাব্যে বারমাস্যা সহ ছাতনের দূতী মালিনীর ময়নাকে ছলনা করার অংশটুকুই শুধু মেলে। তবে এই কাব্যেরও দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। উদয়শঙ্কর শাস্ত্রীর কাছে আছে 'মৈনাসৎ'-এর একটি পাণ্ডুলিপি যা হিন্দী কাইথি অক্ষরে রচিত। অপর পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক হাসান তাসকরী। ফরাসী হরফে লেখা এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে পাটনার মানের শরীফের দরগাহ থেকে। এইসব থেকে একটি কথাই প্রমাণ হয়, 'সতীময়না' লোককাহিনি নির্ভর কাব্য। সাধনের 'মৈনাস'-কাব্যটির প্রভাব দৌলত কাজী কাবামধ্যে স্বীকার করলেও নানানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে লোর-চন্দ্রাণীর লোকপ্রেম গাথাও 'সতীময়না'-কাব্য গঠনে সাহায্য করে থাকবে। লোককাহিনি বলেই। জাতিতে এইসব কাহিনি দৌলত কাজী শুনে থাকলেও থাকতে পারেন।

লোক প্রভাব

মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ'-কাব্য ছাড়াও অনেক লোকমধ্যে গৃহীত লোর-চন্দ্রাণীর প্রেমকাহিনি 'সতীময়না' কাব্যের লোক উৎস ও লোকপ্রভাকেই মনে করায়। বিহার অঞ্চল বিশেষত এবং ভারতের নানা অঞ্চলে লোকগাথা নির্ভর এই প্রেমকাহিনি প্রচলিত ছিল। প্রেমকাহিনি প্রায় একই রকম হওয়ায় কাহিনির লোকধর্মকেই প্রমাণ করে। মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে একটি কাহিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। অঞ্চল ধর্মের কিছু প্রভাব হয়তো কাহিনিটির উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু মূল ভাবনার বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে না ...

লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চায় এটাকেই ‘motif' বলে। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা লোর-চন্দ্রাণীর। রূপে লোকসাহিত্য। অর্থাৎ সাহিত্য হলেও লোকধর্ম কোনভাবেই বিচ্যুত নয়। লোকধর্মসমন্বিত লোকউৎসই ‘সতীময়না' কাব্যের লোকপ্রভাবকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। লোক উপাদান এবং লোকভঙ্গী কাব্যপ্রকরণ রূপে রোমান্টিক প্রেমের মূলীভূত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে যায়।

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দৌলত কাজীর উপর রাজদরবারের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় প্রেম, নারী পুরুষের সম্পর্ক বিচার্য হত বলেই আদিরসের অবাধ উচ্ছাস দোষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হত না। কিন্তু প্রতিভাধর সচেতন কবি শুধু দরবারের নন, তিনি জনসাধারণেরও। লোর-চন্দ্রাণীর লোকপ্রচলিত কাহিনি হাতে নিয়ে রোমান্টিক প্রেমের দুর্বার গতি বর্ণনা করে বস্তুত উভয় ভাবনার সমন্বয় কবি সাধন করলেন। লোর চন্দ্রাণীর লোকপ্রচলিত সে কাহিনি কবি গ্রহণ করলেন, রোমাঞ্চ রসে তা পরিপূর্ণ। ইউরোপে রোমান্স জাতীয় রচনায় থাকে মূলত সববাধাজয়ী প্রেমের ছবি তাছাড়া বীরত্বধর্ম, প্রচণ্ড আবেগ, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, বিপদসম্ভাবনা ও বিপদমুক্তির কথাও রোমান্টিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত। এইসব কিছুই রোমাঞ্চ ও রহস্যময়তা গড়ে তুলে মানুষের কল্পনা ও ভাবনাকে প্রসারিত করে দেয়। ঠিক এইখানে রোমান্টিকতার জগত রূপকথার বর্ণময় অচেনাজগতের ছায়াবিস্তার ঘটে।

‘সতীময়না’-কাব্যে দৌলত কাজী দু'ধরনের প্রেমচিত্র উপহার দিয়েছেন। রাজা লোরের পত্নী সীত্ব ধর্মে অবিচল থেকে গৃহাভিমুখী প্রেমকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। রোমাঞ্চ, ধর্মের সূক্ষ্মতম স্তর এই প্রেমেও বর্তমান। কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিমা চন্দ্রাণীকে ঘিরে রোমান্টিক জগত গড়ে ওঠে, মানুষের মধ্যে এই প্রেমের জন্য চির ব্যাকুলতা। আমাদের মানস প্রতিমা চির অধরা আমাদের দৈনন্দিন চিরপ্রচলিত জগতের বহুদূর তীরে অবস্থান করে। উধাও মনের পাখায় ভর করে মানুষ প্রতিনিয়ত এই চিরঅপ্রাপনীয়ার জন্য ঘর ছেড়ে পথে বের হয়। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি তার কাছে তখন তুচ্ছ মনে হয় সতীময়না' কাব্যে অধরা মানস

প্রতিমা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে চন্দ্রাণীর মধ্যে। এই strong sense of Beauty-র অপ্রতিরোধ্য তাড়নাতেই ভালোমানুষ সতী নারী ময়নাকে ত্যাগ করে রাজা ললারের এমন করে পরিচিত পথ ছেড়ে অপরিচয়ের জগতে ঝাপিয়ে পড়া। অসাধারণ শিল্পকুশল কবি ঠিক এই ধারণার অনুকূলে তাঁর কাব্যপরিকল্পনা করেছেন। যেখানে লোককথার ঢঙের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা ঘটেছে -

"পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি।

তাহাতে মোহরা নামে রাজা অধিকারী।"

এই জাতীয় বর্ণনা লোককথার বর্ণনাকেই মনে করায়। "অনেক প্রাচীনকালে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার ছিল তিন রানী" - ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্যেও গল্পের শুরু -হাত এইভাবে 'অক্তি-গাদাবরী তীরে' অথবা বিদিশা নগরে' – এই ভঙ্গীতে । ইংরাজী সাহিত্যেও তাই Once upon a time there was a king ইত্যাদি। এই রীতিই লৌকিক রীতি" (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী সম্পাদনা, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ দুলাল চৌধুরী)। শুধু কি তাই, অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রতীক চন্দ্রাণীর অন্বেষণে লোরের রোমান্টিক প্রেম। যাত্রায় রূপকথার রাজপুত্রকেও খুঁজে পাওয়া যায় ! চন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে লোরের অন্যান্য দুঃসাহসিক কর্মেও রোমাঞ্চকর রূপকথার জগত প্রতিবিম্বিত হয়। দড়ি বেয়ে চন্দ্রাণীর কক্ষে গোপন মিলন প্রত্যাশী লোরের অভিযান 'সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আকাঙ্ক্ষিত রূপসী রাজকন্যার সঙ্গে রূপকথার রাজপুত্রের মিলনের চিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ---

"তবে রাজা দড়ি অবলম্বন করিয়া

উঠিলেন দড়ি কাষ্ঠে পদভর দিয়া।

হাতে খড় শোভে নেত ধরা পরিধান।

বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।"

গোপন মিলনেই এই দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ নয়। অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক ভয়ানক পরিস্থিতিকে সবলে দলিত করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে। বামনের মত দুর্জয় রাক্ষসের হাত থেকে চন্দ্রাণীকে উদ্ধার করতে চেয়ে লোরের যে রোমাঞ্চকর পলায়ন যাত্রা, তাতে রূপকথার রাজপুত্রের প্রসঙ্গ দানা বেঁধে উঠেছে। এই যাত্রাকে পালায়ন যাত্রা না বলে হরণ যাত্রা বলাই ভালো

"বহুমূল্য দ্রব্য রত্ন লই বহুতর |

কুমার কুমারী দোহ যায় দেশান্তর।।

এক রথে আরোহিলা লোক চন্দ্রাণী।।

রজনীতে চলে যেন চন্দ্রামা রোহিনী।"

রোমান্টিক প্রেমকে কেন্দ্র করে রূপকথাধর্মী আবহ তৈরীর মধ্য দিয়ে লোকভাবনার যে উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন দৌলত কাজী, কাব্যের মূল সূরের সঙ্গে প্রেক্ষাপটের মত গড়ে উঠে তা অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। কেননা 'সতীময়না'-কাব্য রূপকথাধর্মী রোমান্টিক প্রেম আখ্যান। রূপকথার অনিবার্য উপস্থিতি এই ধরনের কাব্যে স্বাভাবিক। কিন্তু লোকভাবনার জগত এত সংক্ষিপ্ত নয়। সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রমকারী অনেক বিষয়, যেখানে অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তা, বিশ্বাস সংস্কারের বিচারহীনতা – স্বভাবজাত সংস্কারের মত স্থায়ী রূপ পায়; 'folk motif'-রূপে সেইগুলিই কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশেষ দিনে বিশেষ কাজের বিশ্বাস, অলৌকিকতার বিশ্বাস, গঢ়াচারী তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুক, মন্ত্রপড়া, জাদু বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস, ধাঁধা-হেয়ালির সাঙ্কেতিকতা এবং প্রবাদ-প্রবচনে বিশ্বাস লোকজগতে বিশেষ বিশেষ motif রূপে স্বীকৃত। কাহিনির উপকরণ হিসেবে এইজাতীয় Folk motif 'সতীময়না' কাব্যের অপূর্ব কাব্যদেহ গড়ে তুলেছে।

তন্ত্রমন্ত্র লোকচর্চার একটি অন্যতম উপাদান, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যে গৃহীত। মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ magic powerএর সাহায্যে অনেক অসম্বই সম্ভব হয়। চন্দ্রাণীর দুঃখে সমব্যথী ধাইয়ের বক্তব্যে এই অলৌকিক মন্ত্রশক্তির উপস্থাপনা ঘটে -

"মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।

সরাম গন্ধর্ব আনিমু ক্ষিতি তলে।

গন্ধর্ব কি পিশাচ কিন্নর জৈক্ষ ভূত।।

ঘন্টা মধ্যে বন্ধি দিমু দেখিবা অভূত।"

ভূত, প্রেত যক্ষ, রক্ষ -- চোখে দেখা যায় না এইসব বিষয়ের সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রের যোগ। আসলে অশিক্ষিত গ্রামীণ মনে এই সব ধারণা এক ধরনের স্বাভাবিক বিশ্বাসের জোরে লোকমনে বাসা বেঁধে থাকে। লোকসাহিত্যের motif গুলির সঙ্গে অলৌকিকতা ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত। লোর বামনের যুদ্ধে অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ প্রভৃতি অস্ত্রে পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ অলৌকিকতা জড়িত –

"ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে লোর । যেন অগ্নিসম শর

ব্যস্ত হৈল কুমার বামন ।

অন্যদিকে --

সংশয় ভাবয় লোর জিনিতে বামন শূর

ব্রহ্ম অস্ত্র লন্ধানে সত্বরে।

যত কৈলা জন্মান্তরে সে সকল পুণ্য ফলে

বিজয় লভৌক এই শরে।"

বামনের মৃত্যুতে দৈবশক্তির প্রভাব লোক motif।

লোকসাহিত্যের জগতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। এরাজ্যে সব এমন অলৌকিক ধারণা লোকসাধারণ যুক্তিহীন বিচারহীনভাবে বিশ্বাস করে। মৃতের পুনর্জীবন লাভের motif - এই বিশ্বাস থেকেই গড়ে ওঠে। লোকসাহিত্যে এই জাতীয় ' অলৌকিকতাকে supernatural power motif বলে। সতীময়না' কাব্যে সৃঞ্জয় রাজার একটি উপকাহিনি আছে। যেখানে অলৌকিক ক্ষমতাবলে মৃত মানুষের বেঁচে ওঠার কাহিনি আছে। প্রহৃত হলে সৃঞ্জয় রাজার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবীর গা দিয়ে সোনা ঝরে পড়ে বলে চোরেদের হাতে বেদম প্রহারে সে মারা যায়। কিন্তু নারদের মন্ত্রশক্তিতে সে পুনরায় বেঁচে ওঠে —

“এ বলিয়া মহামুনি পাতিল আসন।

তপ জপ মুনিবর করিলেন্ত ধ্যান।

মৃত স্বর্ণষ্ঠীবে পুনি পাইল পরাণ।” ।

এই বৃত্তান্তের অনুষঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। বামনকে হত্যার পর ক্লান্ত অবস্থার মধ্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে –

“হেন কালে দুর্বিপাকে কোথা হন্তে এক নাগে |

দংশিল নিদ্রাতে চন্দ্ররানী।”

চন্দ্রাণী মৃত - এই অবস্থায় এক দৈবপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তক্ষক নাগের প্রতি তার আদেশে চন্দ্রাণী বেঁচে ওঠে –

“নাগের মহিমে জীব পাইল চন্দ্রাণী।

ঋষিহ হুঙ্কারি দিল মৃতসঞ্জিবণী।”

পুনর্জীবন প্রাপ্তা চন্দ্রাণী সহ রাজা লোরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ইচ্ছার মধ্যে দৈবপুরুষের অন্তর্ধান ঘটে। এ যেন জাদুবিদ্যা। লোকসাহিত্যে এই জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ। আখ্যানকাব্যে

বিশেষ করে রোমান্টিক প্রেম আখ্যানকাব্যে এই জাতীয় অলৌকিক জাদুবিদ্যার প্রয়োগে লোকসাহিত্যের সুর বেজে ওঠে।

বাস্তবে মানুষের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সব মেলে না, চাইলেই তৎক্ষণাৎ সব কিছু হয়ে যায়, এমন নয়। বুদ্ধি বিবেচনায় অসম্য। এবং অসাধ্য বস্তু ও শুধু মন ও কল্পনার জোরে সে আয়ত্ব করতে চায়। ভোজবাজির মত চোখ বন্ধ করলে কিংবা অলৌকিক কোন কিছুর প্রভাব স্মরণ করে তার উদ্দেশে মন্ত্র পড়লেই সব পাওয়া যায়, সব হয়ে যায়। মিলন কক্ষে লোরের বর্শা নিক্ষেপ জনিত ব্যর্থতায় চন্দ্রাণীর মন্ত্রতন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে এই বার্তাই প্রতিষ্ঠিত --

"তুমি রুদ্র তুমি ইন্দ্র অষ্টলোক পাল।

নবরূপে নরেশ্বর মায়ার জঞ্জাল ।

এক সেবা এক দেবা সেবয় কুমার।

লোর সংস্কাটন হেতু বর মাগে নারী।"

মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যে লোকপ্রভাবজনিত এইসব অলৌকিকতার আমদানী দোষণীয় ছিল না, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত মানুষের সৈৰ বিশ্বাসকে কবিরা গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া কবিরা তো সেই সমাজেরই একজন। তাই রোমান্টিক প্রেমের বাস্তব আখ্যান রচনা করতে বসেও কবির। এইসব দুয়ে দৈব অলৌকিকতায় এবং রহস্যময় পরিমণ্ডলকে কাব্যের অঙ্গীভূত উপাদান করে লোকসাহিত্যের ধর্মকেই কাব্যে আমদানি করতেন। ধাঁধা-হেয়ালি, প্রবাদ প্রবচন কবিমানসজাত এই ভাবনা সূত্রেই কাব্যে পরিবেশিত হত। ধাঁধা হেঁয়ালির মধ্যে একটা ঐন্দ্রজালিক ধর্ম বর্তমান। দৌলত কাজী দক্ষ শিল্পবোধে এই বিষয়টি কাব্যে উপস্থিত করেছেন। সদৃশ শয্যা রচনা করে প্রকৃত চন্দ্রাণীর শয্যা নির্বাচনে লোরের সামনে বুদ্ধি নির্ভর ধাঁধাঁর পরিবেশ গড়ে উঠেছে --

"চারি খাট পরে চারি নারীর শয়ন।

চারি মধ্যে চিন নাহি শ্রেষ্ঠ কোন জন ।।

কৃত্যা রূপে চারি শয্যা রচিল কুমারী।

ললারের চাতুরীপনা বুঝিবারে নারী।"

দৌলত কাজীর লোকসাহিত্যের প্রভাব-পরিবেশ গড়ে তোলার পথে আলাওলও স্বচ্ছন্দ যাত্রা করেছেন। সতীময়না' কাব্যের আলাওল কৃত অংশে দৌলত কাজীর অসাধারণ শিল্পবোধের প্রতিফলন নেই। এই দুর্বলতাজনিত ত্রুটিকে অতিক্রম করে যাওয়ার কারণেই হয়তো আলাওল রতনকলিকার কাহিনিতে রূপকথার ধর্ম প্রায় পুরোপুরি সঞ্চারিত করে লোকসাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে। দৌলত কাজীর আলৌকিক শক্তি প্রভাব জনিত বর্ণনায় লোকধর্মই প্রতিফলিত। কিন্তু তা শিল্প পরিণতিবোধে যথেষ্ট সার্থক ও সুন্দর। আলাওল এই ধর্মে যোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান বর্ণনার পরিপূরক হিসেবে লোককথা-রূপকথা দৌলত কাজীর রচনায় একটা অসাধারণ আবহ গড়ে তুলেছে। আলাওল রচনাংশে এই সংগতিবোধের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে চিরপরিচিত রূপকথার জগতকে তার উপাদান সমেত আমদানি করেছেন। লোকবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক যা লোকসাহিত্যে motif রূপে পরিগণিত, আলাওলের রচনাংশে তার অগাধ প্রাচুর্য। অবিশ্বাস্য অলৌকিকতায় কবি কাব্যে তার অবাধ প্রবেশ ঘটিয়েছেন। রতনকলিকা উপাখ্যানের পুরো পরিকল্পনাটাই রূপকথার জগতের। আখ্যানের সূত্রপাতটিও ঐ ধর্ম থেকে বিচ্যুত নয়--

"নৃপতি আদেশে নৌকা মাঞ্জসে বান্ধিয়া।

ভাসাইয়া দিনক্ষণ নির্দেশ করিয়া !!

কন্যাকে লৈয়া যদি নৌকা পাল দিল।

অক্ষেমা করিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল ।"

মন্তব্য

রাজকন্যা বা রাজরানী হয়েও দুর্ভাগ্যবশত অশেয় দুর্ভোগ বহনের যে গল্প রূপকথার জগতে পাওয়া যায়, এখানে সেই ধর্ম পুরোপুরি বর্তমান। তারপর অন্ত সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার কষ্ট, তপ্ত শিলাতে দাঁড়াতে না পারার যন্ত্রণা, বন্যজন্তুর মুখোমুখি হওয়ার ভয়াবহতা, মানুষের কষ্ট পেয়ে গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও গাছে উঠে সেই আওয়াজ অনুসরণের উদ্যোগ ইত্যাদি রতনকালিকার রোমাঞ্চকর কর্মগুলির সঙ্গে রূপকথার অনুসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অলৌকিকতার সূত্রে রূপকথায় প্রবেশ সমুদ্রে শিলা ভাসমানের মধ্যে, জলের নীচে রাজপ্রাসাদে একমাত্র তরণী রাজকন্যার উপস্থিতিতে --

"মদন মঞ্জুরী নাম মুঞি অনাথিনী

শিশুকালে বিয়োগিত জনক জননী।।

হস্তিকর্ণ নামে এক রাক্ষস দুর্বার।

আচম্বিতে আইল এহি দেশের মাঝার।।"

রূপকথা জগতের একটি প্রধানতম বিষয় রাক্ষসের উপস্থিতি। এই রাক্ষসের অস্তিত্ব, বাসস্থান, আচার-আচরণ, সর্বোপরি রাক্ষসের মৃত্যু সম্পর্কিত গল্পে আলাওল স্পষ্টতই রূপকথার জগতে উপস্থিত হয়েছেন। কন্যা মদন মঞ্জুরীর কাছে বর্ণিত রাক্ষসের নিজের মৃত্যুপ্রসঙ্গে এ কথাই প্রমাণিত ---

"যদি কেই মোর দাড়ি এক গুচ্ছ পাএ।

কদাচিত আন যদি শিলাত ছায়এ

খণ্ড খণ্ড হই শিলা ভাঙ্গিয়া পড়িব।

প্রকাশ দেখিয়া অলি উড়িয়া উঠিব।

যদি সেই অলি ধরি মারে একজন।

সেইক্ষণে হৈব মাত্র আক্ষার মরণ।"

অন্য আরো বহু প্রসঙ্গে, প্রচুর আরো উপাদানের উপস্থিতিতে আলাওল রূপকথার রস পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। দৌলত কাজী ও তালাওল উভয় কবি মিলেই 'সতীময়না'-কাব্যে লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য ও লোকপ্রভাবের সুর পুরোরি বজায় রেখেছেন। রোমান্টিক প্রেমের প্রকৃতির অনুষঙ্গক্রমে 'সতীময়না' কাব্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব -- কাহিনির লোকধর্ম এবং উভয় কবির দক্ষতাই প্রমাণ করে।

৫.৯ অন্যান্য প্রভাব ও মঙ্গল কাব্যের প্রভাব

মধ্যযুগের প্রথাসর্বস্ব আখ্যান কাব্যধারায় দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রাণী কাব্যটি নবীনত্বের স্বাদে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। কাব্যবিষয় হিসেবে গৃহীত তার গল্পটি মৌলিক নয়। প্রচলিত লোকগাথা নির্ভর একটি রোমান্টিক কাহিনিকে শিল্প সম্মত সাহিত্যকৃতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কবির অমরত্ব ভক্তিবাদের অবাধ স্বীকৃতির মাঝে নরনারী বাস্তব প্রেমকে কোনরকম আবরণ ছাড়াই যথাযথ চিত্রণে। কাহিনিটি প্রচলিত হওয়ায় এবং রোমান্টিক প্রেমের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রূপকথার গুণগত মিল থাকায়, কবি কাব্যদেহে এবং কাব্যআত্মায় লোকপ্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রূপকথার ধর্মে অলৌকিক অবাস্তবতা থাকায় 'সতীময়না' কাব্যে দৌলত কাজী, আলাওল উভয় কবির রচনায় অবিশ্বাস্য অবাস্তবতার আমদানি ঘটেছে। দৌলত কাজীর ক্ষেত্রে এটা হানিকর হয়ে ওঠেনি, আলাওলের মূল সুর এতে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাব্যটির পরিকল্পনায় লোকপ্রভাবই একমাত্র প্রভাব নয়; কবির পূর্ববর্তী আখ্যানকাব্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। রাজসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে মুক্ত প্রণয়ের ছবি আঁকলেও কবিরা কোনভাবেই ধর্মবিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন না, ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলেও ফাঁকি ছিল না। তাছাড়া মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম তাদের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী দান করেছিল। পূর্ববর্তী আখ্যানকাব্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতের ইঙ্গিত দৌলত কাজী ও আলাওল উভয়কেই প্রভাবিত

করেছিল। গতানুগতিক অথচ দীর্ঘসময় চর্চিত মঙ্গলকাব্যের রীতি তাই তাদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

'সতীময়না' কাব্যের গোড়ার দিকের অংশে মঙ্গলকাব্যের রীতি ও প্রভাব মেনে দৌলত কাজী কাব্যবিন্যাসে মনোযোগী হয়েছেন। পরিকল্পনাটি এইরূপ — (ক) আল্লা বন্দনা, (খ) ঈশ্বর প্রেরিত দেবপুরুষ বা রসুল প্রশস্তি, (গ) রাজশক্তি, (ঘ) সভাসদ প্রশক্তি, (ঙ) গ্রন্থোপত্তির বিবরণ, (চ) কাহিনি ও উপকাহিনি বর্ণন। পাঁচালির ঢঙে দৌলত কাজীর আরাধ্য দেব বন্দনাটি চমৎকার –

'বিসমিল্লার নাম জান ত্রিভুবন সার।

আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার।

প্রথমে বলিয়ে বিস্মিল্লাহ অর রহমান।

সর্বস্থানে কল্যান পুরয়ে মনস্কাম।"

মঙ্গলকাব্যের কবি কিংবা সতীময়না'-র কবি কারোরই ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোনরকম দোলাচলচিত্ততা ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় সব কিছুল, যে কোন কর্মই জয়যুক্ত হয় এমন বিশ্বাস সংস্কার থেকে দেববন্দনার প্রথাযুক্ত ধারাটি গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের পৃষ্ঠপোষক রাজারই প্রশস্তি রচনা করেছেন কবি। তবে রাজদরবারের প্রভাব বিস্তারকারী এবং কবির কাব্য রচনার প্রেরণাদাতা হিসেবে কোন কোন সুধী ব্যক্তি কবিদের প্রশস্তি লাভ করেছেন। আরকান রাজসভার পরিবেশ স্বতন্ত্র। এই রাজ্যের রাজারা ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন বৌদ্ধ । তাই বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় তারা অদম্য উৎসাহ বোধ করবেন এমনটা নয়। তবে পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তৃত অর্থ ধরলে এই বৌদ্ধ রাজারাই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া বৌদ্ধ রাজারা যথেষ্ট উদার ছিলেন। তা নাহলে দেব বন্দনার পর রাজবন্দনা না থেকে রসুল প্রশস্তি কাব্য পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত হচ্ছে, এটা কখনোই সম্ভব হতো না। রাজ অপমান জনিত

অপরাধে কবিরা রাজরোষে পড়তেন সুনিশ্চিত। আনুমানিক এই বিচার সত্য না হলেও একটা কথা সত্য যে বৌদ্ধ রাজারা বাংলা ভাষা বুঝতেন না। তাঁদের নিয়োজিত গুণী ও গুণের সমাদরকারী বাংলা ভাষী অমাত্যেরা বাংলা ভাষা বুঝতেন এবং কাব্যরসিক হিসেবে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা দান করতেন। দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের সেই পৃষ্ঠপোষকতা অনুপ্রেরণাদাতা ব্যক্তিটি ছিলেন বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধর্ম্মার সমর সচিব অমাত্য শ্রীযুক্ত আশরফ খান। ধরে নিতে বাধা নেই এই ব্যক্তি বাঙালি মুসলমান ছিলেন। এই সুধী অমাত্য আশরফ খানের প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বশে এবং মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে দৌলত কাজী রসুল প্রশস্তি রচনা করেছিলেন –

"শ্রী আশরফ খান। ধর্মশীল গুণবান

মুসলমান সবার প্রদীপ।

সে রসুলপরসাদে গুরুজন আশীর্বাদে

রাজসখা হউক চিরজীব।"

রসলু উল্লেখেই আশরফ খানের প্রশস্তি কবিকে সন্তুষ্ট করেনি। সমর সচিবের বিবিধ গুণপনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাজ অমাত্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে রাজ অমাত্য পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন। কিন্তু সতীময়না' দরবারী কাব্য। এক অরণ্য দরবারে রাজার উপস্থিতি এবং অনুমতিক্রমে আশরফ খান দৌলত কাজীকে বাংলা ভাষায় সরল পাঁচালী রীতিতে 'মৈনাসৎ' কাব্যের অনুবাদের আদেশ দেন। স্বভাবতই দৌলত কাজী কাব্যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতাই স্বীকৃত এবং মঙ্গলকাব্যের প্রথা শিরোধার্য করে কবির রাজপ্রশক্তি রচনা

"নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।

প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন পৃষ্ঠপোষক রাজারা যথার্থই গুণের সমাদর করতেন। নাহলে প্রশস্তি রচনা করতে বসলেও সত্যদ্রষ্টা কবিরা এতটা উচ্ছ্বসিত হতেন না, পৃষ্ঠপোষক রাজ্য সম্বন্ধে । মঙ্গলকাব্যের অপর এক স্বাভাবিক কাব্যরীতি অতিবর্ণনা। তাই পল্লচারী হিসেবে আপ্রাসঙ্গিক অনেক বর্ণন্যই কাব্যের স্বাভাবিক রসধারার প্রতিবন্ধক। তবে একথাও ভুললে চলবে না, ব্যক্তিনিষ্ঠ কাব্যের চর্চা তখনও এমন স্তরে উন্নীত হয়নি যে আখ্যানকাব্যের কবিরা সমাজ, পৃষ্ঠপোষক, রাজদরবার, সভাসদকে উপেক্ষা করবেন। আখ্যানকাব্যের ক্ষেত্রে এসবের প্রভাব অনিবার্য এবং কবির বর্ণনায় অতিরেকভাবও সময়ে বিচারে স্বাভাবিক। তাই রাজ্যপ্রশস্তি লিখতে গিয়ে কবি সভাসদদের প্রশস্তি সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন ----

"চতুর্দিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর।।

তারকা বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা সুন্দর।"

এই অংশে যথাথ সভাসদ বর্ণনা নয়, সভাগৃহ প্রশস্তিই রচিত। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের নানাবিধ বর্ণনার মাঝে সমাজ প্রসঙ্গ অনিবার্য প্রভাব হিসেবে স্বীকৃত। দৌলত কাজীও কাব্য বর্ণনায় সমাজ, সামাজিক রীতি-নীতি বিশেষত জাতি বিশিষ্ট মানুষকে উপেক্ষা করেননি---

"সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।

স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।

ব্রাক্ষ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।।

সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর।।"

দৌলত কাজীর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের কাব্যরীতি অনুযায়ী স্পষ্টভাবে দেবখণ্ড নরখণ্ড নেই। অভিশপ্ত কোন দেবতা বা স্বর্গবাসী মর্ত্যে মানব রূপ ধারণ করে কোন দেবতার পূজাতে নিয়োজিত হ'ত। ঐ ভ্রষ্ট চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মধ্যে

সংযোগ সাধিত হত। সতীময়না'-কাব্যে এইরকম গ্রন্থবিভাজন নেই, গ্রন্থ পরিকল্পনাও নেই। আল্লার বন্দনা-অংশটিকে মঙ্গ লকাব্যের রীতির মত দেবখণ্ড ধরে নেওয়া যায়, বাকি অংশ বিশুদ্ধ অর্থেই নরখণ্ড।

'সতীময়না' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বারমাস্যা' বর্ণনায়। মঙ্গলকাব্যের একটি পরিচিত কাব্যবিষয় বারমাস্যা। বিশেষত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' এর অসাধারণ প্রয়োগ দৃষ্টান্ত বর্তমান। সেখানে কালকেতু পত্নী ফুল্লরার দুঃখের বর্ণনায় বারমাস্যা অর্থাৎরাসের দীর্ঘসময় পূর্ণ। মুকুন্দরাম যেখানে আরম্ভ মাস বৈশাখের দুঃখ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বারমাস্যার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন; দৌলত কী সেখানে মৌলিকত্ত দাবী করতেই পারেন। কবি ঘন বর্ষার প্রেক্ষাপটে স্বামী সঙ্গ বঞ্চি তা বিরহ কাতরা ময়নার দুঃখসময় জীবনকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের উল্লেখে বারমাস্যার বর্ণনা অপূর্ণ থাকলেও বাকী এগারো মাসের বর্ণনায় দৌলত কাজী প্রশংসনীয় শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাছাড়া একক বিবৃতিমূলক বারমাস্যা বর্ণনার পরিবর্তে দৌলত কাজী মালিনীর সঙ্গে ময়নার উত্তি প্রাক্তিমূলক বর্ণনা-ভঙ্গীতে নাট্যরস জমিয়ে তুলেছেন। কার্তিক মাসের বারমাস্যা বর্ণনায় ময়নার দুঃখবোধ অসহনীয় –

"কি-মার কার্তিক মাসে| পরব দেওয়ালি রসে

কিবা সুখ সুচিত্র আকাশে

যাহার নাহিক কান্ত দিবসে না দেখে পন্থ

কি করিব নিশি অভিলাষে।"

দুতী রতন মালিনীর প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দূতী প্রসঙ্গ ও প্রভাবের কথা মনে হয় –

"মালিনীর লাস ভেশ কি কহিমু সবিশেষ

ফুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।"

মঙ্গলকাব্যের অপর এক পরিচিত রীতি, কাহিনির মধ্যে শাখাকাহিনি বা উপকাহিনি বর্ণন। সতীময়না'-কাব্যে দৌলতকাজী ও আলাওল ও য়েই উপকাহিনি বর্ণনা করেছেন। কবি আলাওলের রচনাংশেও মঙ্গলকাব্যের প্রথামাফিক দেববন্দনার প্রভাব আছে -

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।

যেই প্রাণী মর্ত সর্ব করল সৃজন।"

দৌলত কাজীর মত আলাওলও পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজঅমাত্যের বন্দনা করেছেন। অমাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওলের 'সতীময়না'-র অসমাপ্ত অংশ সমাপ্তির উদ্যোগ প্রসঙ্গে কবি --

"এতেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।

হরষিতে আদেশ করিলা আক্ষাপতি।

এহি খণ্ড পুস্তক পুরাএ মোর নামে।

স্বরূপ কি কথা লিখি পাও এক ধামে।"

এছাড়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণনায়, মনসামঙ্গলের প্রভাবে চন্দ্রাণীর সর্পদংশন প্রসঙ্গে, অতিপ্রাকৃতের উল্লেখে 'লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব স্বীকৃত।

৫.১০ রামায়ন মহাভারত পুরাণ প্রসঙ্গ

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের—-ভাজপুরী, মির্জাপুরী, মৈথিল, ভাগলপুরী, ছত্রিশগড়ী, সাঁওতালী—নানা লোককথা-লোকসঙ্গীত-লোকগাথার কাহিনী ও চরিত্রের অনুকরণ-অনুসরণ মুখ্য হলেও ভারতীয় জাতীয় সাহিত্য রামায়ণমহাভাতের কাহিনী ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য গ্রহণও লক্ষণীয়। দৌলতকাজী তার কাব্যের নানা অংশে চরিত্রগুলির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বারে বারে রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রে নাম উল্লেখ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে উপ-কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ বিবৃত করেছেন। আবার রামায়ণ-

মহাভারতের পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণগুলির বহু ঘটনা ও চরিত্র প্রসঙ্গ কবি গ্রহণ। করেছেন। অবশ্যই এসব কাব্যের প্রয়োজনে। প্রসঙ্গগুলি আলোচনায় তুলে আনলেই বোঝা যাবে। কবি দৌলত এই ব্যবহারে কতখানি দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

কাব্যের প্রথমেই কবি দৌলত রোসাঙ্গ রাজসভার প্রশস্তি গেয়েছেন। সেই প্রশস্তিতে যে অতিরঞ্জন রয়েছে এবং তা রাজ-সভাকবি হওয়ার কারণে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে সে তো অন্য প্রসঙ্গ। এখানে দেখা যাক রাজার প্রশস্তিতে কীভাবে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

রোসাঙ্গ-রাজ্যের রাজা শ্রীসুধর্মার সুশাসন ও প্রজাপালনের সুরীতির প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রের যথোপযুক্ত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কবি রাজার সুখ্যাতির-সুযশের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন—

“বিধবা নির্বলী বৃদ্ধ বেটে রত্নভার।

ভীম সম বলীও না করে বলাৎকার।

সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।

বাজ-ভয়ে না নিরাক্ষে সহস্রলোচনে ।।

অর্থাৎ মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের মতো বলশালী ব্যক্তিও কোন নারীকে বলাৎকার বা আশালীন আচরণ করার সাহস পায় না। আবার রামায়ণের রামপত্নী সীতার মতো সুন্দরী নারীও যদি বনে একা অবস্থান করে তাহলেও কোন পুরুষ কোনভাবে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। আর দেবরাজ ইন্দ্র যার সহস্রলোচন হওয়ার কুৎসিত কাহিনী। পুরাণে রয়েছে সেই ‘সহস্র-লাচন' নামধারী ইন্দ্রের মতো নারীলোলুপ কোন পুরুষও রাজা। শ্রীসুধর্মার রাজ্যে কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। দৃষ্টান্তের মধ্যে রাজপ্রশস্তির অতিরঞ্জন থাকলেও কবি যে হিন্দু প্রাচীন কাব্য-পুরাণ-এর কাহিনীধারার সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত সেই পাণ্ডিত্য কিন্তু এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

মন্তব্য

রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীসুধর্মার সুখ্যাতি ও সুযশ-এর কথা বলতে গিয়ে পুরাণ প্রসঙ্গে পাতালের নাগ-সমাজ, নাগরাজ প্রমুখের কথা এসেছে।

‘পবন বাহনে গিয়া কীর্তি যশরাজ।

পাতালে উজ্জ্বল করে নাগেন্দ্র সমাজ।।

কীর্তি যশ দেখিয়া তক্ষক রাজনাগ।

মণিছত্র ধরে শিরে করি অনুরাগ ।।

সে কারণে নাগগণ শিরে ছত্রবৎ।

রহিল সুধর্ম কীর্তি পৃথিবী যাবৎ।

রাজা সুধর্মার যশ-কীর্তিকে দেবলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুরাণের উচ্চৈঃশ্রবা---ইন্দ্রের ঐরাবত প্রসঙ্গও যুক্ত হয়েছে|

‘শুনিয়া দেখিয়া ইচ্ছা হৈলা পুরন্দর।

ধর্ম কীর্তি যশ সর্বস্থানে শোভাকর।।

ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধরিয়া যোগান।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্য বিষয়ে আলোচনা।

যশ কীর্তি নিরন্তর সহস্র নয়ান।।

... ...

মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্তি যশ।।

শ্বেতরূপে সুধর্মের হৈল পদবশ।।

এইসব পুরাণ-দৃষ্টান্তের পাশাপাশি কৃষ্ণের দ্বারকা রাজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে শ্রীসুধর্মার বনবিহারে গিয়ে বনের যে স্থানে অস্থায়ী রাজপ্রাসাদ তৈরী হয় সেই স্থান-নামের কথায়—

‘বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম ।

কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম ।।

তথাতে রচিয়া সভা রহিল নৃপতি।

ময়ূর গঠন যেন সভার আকৃতি।।

এই প্রসঙ্গেই বনমধ্যে যে সব ফুল ফুটে রয়েছে সেই কুসুম বনকে কবি বৃন্দাবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—বিকচ কুসুম যেন শোভে বৃন্দাবন।। আর চারিদিকের পূর্ব শোভার মধ্যে আসীন রাজা শ্রীসুধর্মা সম্পর্কে কৃষ্ণেরই প্রসঙ্গ টেনে কবি বলেছেন

‘দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিয়া ধর্মরাজ।

দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দসমাজ।।

কবি দৌলত রাজা সুধর্মার সুকীর্তির ভুবনব্যাপী বিস্তারের কথা বলতে গিয়ে ‘নর’ অর্থাৎ মানুষের মহিমাময় চিরজীবী রূপের নানা দিককে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গেই রামায়ণের রামের কথা এসেছে। মানুষ যদি কোন ‘সুকৃতি’ রেখে যেতে না পারে তাহলে জীব হিসাবে জগতে কোন চিহ্ন থাকে না। আমার যারা সাফল্য রেখে যেতে পারে, তারও রকমফের লক্ষ করা যায়—

‘সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম।

নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম ।।

এতেক সে মহাজনে বুঝিয়া রহস্য।

লোকেরে সাদর করি পালিবা অবশ্য।।

রাজ-প্রশস্তির এমনতর ব্যাখ্যানের পরে ভারতীয় পুরাণের সত্য রক্ষার বর্ণময় ও বৈচিত্র্যময় পরাকাষ্ঠার রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন কবি। ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মূল ধারক 'সত্য রক্ষা করা; 'ময়নার ভারতী তথা পতিব্রতা সতী ময়নার বাখানে যে সত্য রয়েছে সেই সত্য জানতে চেয়ে শ্রীসুধর্মার লস্কর উজির' আশরফ খাঁ আরো অনেক সত্য তথা ন্যায়ের বাখানের উদাহরণ দিতে গিয়ে রামায়ণমহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন।

"প্রাণান্ত করিয়া সত্য পালে মহাজন।

রাজ্যপাল ত্যজি করে সত্যের পালন।

সত্য-বলে রাজা হৈল পাণ্ডব নন্দন।

সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ ।"

অর্থাৎ এখানে সত্যপালনের জন্য রামায়ণের রামচন্দ্রের রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে যাওয়ার প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি সত্য অর্থাৎ ন্যায়পথে থাকায় মহাভারতের পাণ্ডব-নন্দন যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। সুতরাং সত্যের পথই সঠিক পথ। চন্দ্রানী স্বামী বামনের সংস্রব থেকে বিচ্যুত হয়ে তার মৃগয়ায় থাকাকালে লোররাজের সঙ্গে রতিরঙ্গরভসে। মেতে থাকে। কিন্তু তা গোপনে। তার এই পর-পুরুষ সঙ্গলাভের কথা প্রকাশ পেলে বিবাহিত রমণীর এমন ক্রিয়ায় রাজ-অন্তঃপুরে গুঞ্জন ওঠে। চন্দ্রানীও উক্ত কর্মের ভাল-মন্দের ভাবনায় দ্বিধান্বিত হয়। এমন সময়ে বীর বামনের রাজপ্রাসাদে ফিরে আসা দারুণ চিন্তার বিষয় হয়। নারী চিরকাল পরাধীন। সে কারণে তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কেউ দেয় না। আর সে বিবাহিত রমণী, সুতরাং অন্য পুরুষের সঙ্গে রতিক্রিয়া তো নারীর কলঙ্কের চূড়ান্ত। যুগে যুগে নারী কলঙ্কের বোঝা বয়েছে এবং কলঙ্ক থেকে বাঁচতে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে। ভারতীয় নারীর এই পরিণামের কথা চন্দ্রানীর জানা

আছে। তাই লোরের প্রবোধ বাণীর উত্তরে চন্দ্রানী কলঙ্কের প্রচারের নানা কথার সঙ্গে রামায়ণের সীতার প্রসঙ্গ এনেছে-

"কোন্ মতে বসিবাম রমণী গোচর।

জীবন কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।

কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে লামিল।

রাজ বীর্য বল জানি কর নিজ কাজ।

কলঙ্ক না রহে যেন রমণী সমাজ।"

রাবণ কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় সীতার দেহে যে কলঙ্কের ছাপ লাগে তার জন্য অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধতা-শুচিতার পরিচয় রেখেও শান্তিতে দিন যাপন করতে পারেনি। আবারও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সীতা কলঙ্ক ঘোচাতে পাতালে প্রবেশ করে সমাজ-সংসার-পরিজন থেকে চিরমুক্তি লাভ করেছিল। তাই কলঙ্ক-ভয়ে ভীত চন্দ্রানী পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে এবং এই পথে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির পুরানো দৃষ্টান্তকে স্মরণ করেছে।

লোর চন্দ্রানীকে নিয়ে পলায়ন করলে বামন সনাতন ধর্ম হিসাবে নিজ স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য লোরের পিছু ধাওয়া করে ও নিজ বীরত্বের কথা বলতে গিয়ে 'বৃকোদর' অর্থাৎ মহাভারতের ভীম-এর প্রসঙ্গ এনেছে-

'জল স্থল রাজ্য বন সর্ব মোর বশ।।

লোরকে শরণে রাখে কাহার সাহস ।।

অবশ্য আমার হাতে তাহার নিপাত।

মরিল কীচক যেন বৃকোদর হাত ।।' (পৃ. ৯০)

অর্থাৎ মহাবলশালী ভীমের হাতে কীচকের যে পরিণাম ঘটেছে, মহাশক্তিধর বামনের হাতে লোরের সেই পরিণাম ঘটবে। তাছাড়া লোর ও বামনের যুদ্ধ প্রস্তুতি, সম্মুখ সমরে আগুয়ান হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে চীৎকার করে গালিগালাজ এবং যুদ্ধ চলাকালীন বর্ণনায় দৌলতের কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতাদির যুদ্ধ বর্ণনার প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। বামন লোরকে ধরার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়; আর সেই প্রস্তুতিকালে দামামা বেজে ওঠে এভাবে-

‘চলাচল শব্দ হৈল সৈন্য সব সাজে।

শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে।

মেঘের গর্জন যেন দুদুমির রোল।

সাজায় অনেক সৈন্য অপার অতুল ।।

লোরকে বনে দেখতে পেয়ে বামন সারথীকে আদেশ করে

“তাহার রথের আগে ধর রথ মোর।।

শীঘ্র পন্থ নিরোধ না যায় যেন চোর।

বামন আরতি পাই সারথি প্রধান।

মুখামুখি ধরে রথ সমর সন্ধান।।” (৯০)

এবং এ তাবস্থায় বামন লোরের উদ্দেশ্যে গর্জন করে ওঠে। রাক্ষসরাজ রাবণের প্রসঙ্গ বলে। আস্ফালনও লক্ষণীয়; সীতা হরণে অর্থাৎ নারী হরণ করে বলবীর্যশালী রাবণের রাক্ষসবংশ কীভাবে ধূলিসাৎ হয়েছিল তার কথা বলে ওঠে বামন—

‘শুনরে অধম মূঢ় অবোধ দুর্মতি ।।

পর-নারী হরে যেই মরণ দুর্গতি ।

অবশ্য শুনিছ পাপী পুরাণে কথন।

প্রজাপতি বংশে জর্ম রাজা দশানন।।

সুরাসুর আদি যত ত্রিভুবনে বৈসে।

দাস প্রায় খাটিলেক রাবণ আদেশে। ।

এক ছত্রে বসুমতী শাসিল রাবণে।

ঠাট পাট অস্তে গেল নারীর কারণে।

তুমি কোন তৃণ ছার পতঙ্গ নির্বলী।

বীরের রমণী লৈয়া তোমার ধামালী।

এরই পাশাপাশি দুই বীরের সম্মুখ সমরের বর্ণনা এরূপ

১. মুখামুখি দুই রথী যেন দুই মত্ত হাতী

দন্তে দন্তে যেন পেষাপেষি

সারথি করেন ভাতি বুঝায়ন্ত লোরপতি

দুই রথ নেহৌ মিশামিশি

২. ‘অনিবার বাণ এড়ে পরস্পর না বিচারে

খর্ব বাণ বজ্রের সমান

তিন বাণে লোরের মর্ম হৈল জর জর

সারথিকে হানে চারি বাণ ।।

কবি দৌলতের কাব্যে বামন চরিত্র পূর্ণাঙ্গ চরিত্র — একে শুধু নপুংসক-বীর্যবলীন করে রাখেননি, চরিত্রটিকে রক্তমাংসে গড়া প্রেম-প্রীতি, লজ্জা-দুঃখ--সব মিশ্রণে নির্মাণ করেছেন। বামন চরিত্রটি মহাভারতের পাড়ু রাজার মতোই দেশ-শাসনে, রণাঙ্গনে বহুবলশালী, কিন্তু

রতিরসকলায় অক্ষম। আবার এই বিক্রশালা চরিত্র বামনের মৃত্যুর ঘটনাতে মহাভারতেরই রণশিশু গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর ঘটনার ছাপ পড়েছে। স্ত্রী চন্দ্রানীর কাছে রতিকলায় অক্ষমতা ধরা পলে বামন লজ্জিত হয়ে নিজেকে বনে মৃগয়ায় নিযুক্ত রেখেছিল। কিন্তু স্ত্রী অন্য পুরুষের। সঙ্গে পলায়ন করলে স্বামী হিসাবে নিজ স্ত্রীকে উদ্ধার করা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে 'সনাতন ধর্ম। তাই লোরের সঙ্গে বামন যুদ্ধে রত হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন পর্বে বামনের শরাঘাতে লোর মূছিত হলে -লারের সারথী মিত্রকণ্ঠ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে চন্দ্রানীর বসুন রক্তে রাঙিয়ে বামনকে দেখাতে থাকে। আর এটিই পূর্ব প্রেম প্রীতিকে স্মরণ করে জীবন-উপভোগ বঞ্চিত মানুষটির মনে অন্য ভাবনা জাগায়---

'শরে যদি মৈল নারী কোন কর্মে যুদ্ধি করি

এ বলিয়া এড়ে শরাসন।

আর অস্ত্রবিহীন বীর বামনকে পেয়ে লোর ব্রহ্ম-অস্ত্র নিক্ষেপ করে বামনকে পরাজিত ও নিহত। করে। বামনের মতো বীরকে অস্ত্র ত্যাগ না করালে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। এমনি অথচ রকমফের ঘটনাই পাওয়া যায় কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে নিহত করার পশ্চাতে অস্ত্রহীন করার কৌশলে। পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর প্রচারে দ্রোণাচার্য বিহূল, বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। হয়ে সত্যের পূজারী ও ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে কৌশলী উত্তর পেয়ে অস্ত্র ত্যাগ করলে অর্জুন তাকে নিহত করতে পারে। বামনের কাহিনী কবি দৌলতের ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য। সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি কতখানি, তা চিহ্নিত করে। বন্ধুবর ও সারথী মিত্রকণ্ঠ লোরকে দিয়ে যেভাবে বামনকে হত্যা করাল—এরূপ রণকৌশলের কথা বাল্মীকির রামায়ণে না থাকলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। লঙ্কাকাণ্ডে রয়েছে মকরাক্ষ চারিদিকে গাভী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে এ কারণে যে তাতে রামচন্দ্র গোবধ ভয়ে তার না ছুঁড়তে পারে। কৃত্তিবাসেরই রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রয়েছে – ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে মা সীতা বধ করে রামের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়ে যুদ্ধ জয় করার চেষ্টা করেছে। মহাভারতের স্ত্রী-পর্বে শিখণ্ডীকে দাঁড় করিয়ে ভীষ্ম-বধের আয়োজন চলেছে। তবে বামনের অস্ত্র ত্যাগের যুক্তিজাল

নির্মাণে কবি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার ছাপ রেখেছেন। পূর্ববর্তী সাহিত্যের প্রভাব রেখেও নিজস্ব কৌশলের পরিচয় রয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুকালে বামন লোরকে ক্ষমা করে দিয়ে প্রশংসা সূচক বাক্যে চন্দ্রানীকে নিয়ে সুখী জীবন কাটা-নার শুভেচ্ছা জানিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই প্রশংসাসূচক বাক্যগুলি এরূপ

'হেন বীর অবতারন দেখয় এ সংসার

মোহর গোচরে 'নু ধরে।

আমাকে রণেতে জিনি লই যাও চন্দ্ররানী

কে সহিব তোমার সমরে।

চন্দ্রানীহ ভাগ্যবতী পাইল লোরেন্দ্র পতি

লোরেন্দ্রের নারী যুয়ায়।

রাজার কুমারী লৈয়া সুখে রাজ্য কর গিয়া

শ্বশুরের করিহ সহায়।

আমি যাই স্বর্গপূর নিশ্চয় শুনহ লোর।

কার ভয়ে যাও নরপতি।।

এ বলি বামন ধীরে অনিত্য সংসার ছাড়ে।

রথ লই চলি সারথি।।'

বলাই বাহুল্য, এটিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের বাণে রাবণের মৃত্যুকালে রামের প্রতি ভক্তির চূড়া বার্তা জানানোর পরে মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়!

মন্তব্য

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্র ও চরিত্র-গুণকে উপমাউল্লেখে বা গল্পকথার ভাবকে শুধু কবি দৌলত প্রয়োগ করেননি, মহাভারতের একটি কাহিনীকে প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন। চন্দ্রানীর সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটলে শোকাতুর লোররাজ আত্মবিসর্জন দিতে চাইলে বন্ধুবর-সারথী মিত্রবণ্ঠ লোরকে সান্ত্বনা দিতে ও চন্দ্রানীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায় বলতে মহাভারতের কাহিনীটি বলে—

'পূর্বে শুনিয়াছি এক রাজা স্বর্ণষ্ঠীব!

মৃত্যু হৈয়া মুনি-মন্ত্রে পুনি পাইল জীব।।

তুমিহ পূজিবা মহামুনির চরণ!

মুনির প্রসাদে পাইব চন্দ্রানী জীবন।

মহাতারতে এই কাহিনীটি 'দ্রোণপর্ব'-এ রয়েছে। যদিও শান্তিপর্ব'-এ কাহিনীটি একটু ভিন্নরূপে কষ্টি আছে। দৌলতের কাব্যে কাহিনীটি যেভাবে আছে তা এরূপ

সত্য যুগে রাজা ছিল সৃঞ্জয় নাম।

ধর্মে কর্মে বিশারদ দোসর শ্রীরাম ।।

এই সৃঞ্জয়ের সুত স্বর্ণষ্ঠীবী নাম।

সর্ব-গুণ-যুত রূপে অভিনব কাম।

এইসৃঞ্জয় রাজার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবীর বিশিষ্টতা হল—তার দেহাভ্যন্তর থেকে স্বর্ণ বহির্গত হয়—

কেহ যদি তাহারে মারয় কদাচন।

পুঞ্জে পুঞ্জে সুবর্ণ বর্ষয় ততক্ষণ ।।

মুষ্ঠ কি চাপড় কেহ মারিলে তাহাকে।

পুঞ্জে পুঞ্জে স্বর্ণ বর্ষে দৈব পরিপাকে।

মভারতে অবশ্য প্রহারের ফলে স্বর্ণ বর্ষণের কথা নেই। প্রহারের কথা দৌলতের নিজস্ব । ভা। মহাভারতের দ্রোণপর্বে দেহাভ্যন্তর থেকে স্বর্ণ বহির্গতের কথা বলা হয়েছে। যদিও শল্পপর্বের কাহিনীটিতে রাজপুত্রের থুতুর সঙ্গে স্বর্ণ বের হওয়ার কথা রয়েছে-'বভূব কনষ্ঠীবী যথার্থ নাম তস্য তৎ।' (শান্তিপর্ব ৩১/২৪)। সতীময়না' কাব্যে রয়েছে— রাজা সৃঞ্জয় একদিন সভাতে আসীন; এমন সময়ে 'আইল অঙ্গিরা মুনি রাজা বোলাইতে। এবং ক্ষণে নারদ আইলা তার শেষে।' এই অঙ্গিরা মুনির নামে সামান্য বিভ্রাট রয়েছে। এইনামটি মূলে বটতলার পাঠে অঙ্গিনা ছিল। মহাভারতের দ্রোণপর্বে অবশ্য এই 'ঋষির নাম পর্বত ; শান্তিপর্বে এই ঋষিকে নারদের ভাগিনা বলা হয়েছে। দুই মুনি অঙ্গিবা ও নারদ রাজা সৃঞ্জয়। সমীপে এলে রাজার 'নবশশী'-রূপ অপূর্ব সুন্দরী কন্যা তাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। কন্যার নাম শান্তিপর্বে সুকুমারী' হলেও দ্রোণপর্বে কোন নাম নেই। কবি দৌলতও এখানে রাজকুমারীকে নামবিহীন রেখেছেন। আর যেহেতু

'ভুবন বিজয়ী কন্যা প্রথম যৌবন! :

লাবণ্য লীলায় মুনি-মানস মোহন।

স্বাভাবিকভাবেই দুই ঋষিই কন্যা-রূপে মুগ্ধ ; অঙ্গিরা মনে মনে ভাবেন

'রাজা হস্তে লৈমু আমি এই কন্যা দান।।

তবে সে এড়াইমু মদনের অপমান।

কিন্তু মনের কল্পনা ব্যক্ত হওয়ার পূর্বেই নারদে মাগিলা কন্যা রাজাত সত্বরে । সুতরাং রাজা সৃঞ্জয় নারদকে কন্যাদান করেন এবং তৃপ্ত মনে বলেন—

'ধন্যমোর সুশীলা দুহিতা ভাগ্যবতী।

ত্রিদশ ঈশ্বর ঋযি হৈল নিজ পতি।'

কিন্তু অঙ্গিরা মুনি হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন--

‘প্রথমে কন্যাকে দেখি কল্পিয়াছি আমি।

আমাকে না দিয়া তাকে দাও আন স্বামী।

রাজা সৃঞ্জয় ঋষির ক্রোধ সংবরণ করতে ভক্তিভাবে জানান যে মুনির মনের কথা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু নারদ মুনি—

‘প্রকাশি মাগিল কন্যা সভা বিদ্যমানে।

তা হেতু সুশীলা কন্যা দিলু তান স্থানে।

শেষে অঙ্গিরা মুনি শান্ত হন। আর নারদ নববিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে অন্তর্ধান করেন। দোলতের এই কাহিনী গ্রন্থনায় মহাভারতের দ্রোণপর্ব ও শান্তিপর্বের কাহিনীর সঙ্গে কিছু রকমফের লক্ষ। করা যায়। মহাভারতের ‘শান্তিপর্ব’-এর কাহিনীতে দেখা যায় যে, নারদ ঋষিই কেবল রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাকে বিবাহ করেন। অঙ্গিরা তথা পর্বতের কন্যা-রূপে মুগ্ধ হওয়ার কথা নেই। বরং ভাগিনা পর্বত মাতুল নারদের এরূপ ক্রিয়াকাণ্ডে বিরক্ত হন এবং মাতুলকে অভিসম্পাত করেন। কিন্তু শেষে পর্বত নিজের দেওয়া অভিশাপ ফিরিয়ে দিলে নারদ বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে নিজ আশ্রয়ে ফিরে যান। আবার ‘দ্রোণপর্ব-এ দেখা যায় যে, নারদ ও রাজকন্যার মিলনের কথা বলা নেই। তাই মনে হয় যে, কাজী দৌলত হয়তো দ্রোণপর্বের কাহিনী অনুসরণ করলেও শান্তিপর্বের ঘটনা অনুযায়ী নারদ ও রাজকন্যার মিলনের কথা নিজ কাব্যে বিবৃত করেছেন।

নারদের সঙ্গে সৃঞ্জয় রাজার কন্যার বিবাহের ঘটনার কিছুকাল পরে রাজকুমার স্বর্ণষ্ঠীবীর প্রাণ-সংশয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্বর্ণষ্ঠীবীর দেহাভ্যন্তর থেকে স্কুর্ণ বর্ষণের কথা চোরেরা জানতে পেরে গোপনে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজকুমারকে চুরি করে নিয়ে যায়। অরণ্যের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কুমারকে প্রহার করে স্বর্ণ বণি করাতে থাকে—

‘যত মারে তত স্বর্ণ বর্ষয়ে কুমার।

মারনেত রাজপুত্র হইল সংহার।।

এদিকে রাজপ্রাসাদে কুমারকে না পেয়ে রাজা ও রাজমহিষী চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। অন্বেষণ করে। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে উভয়ে শোকে মুহ্যমান হয়। সেইসঙ্গে

‘রাজার আকুলে সব প্রজার বিকল।

পরিজন নারী সবে করয় রোদন।

এমনতর পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নারদ মুনি রাজসভাতে উপস্থিত হয়ে পুত্র শোকসন্তপ্ত রাজাকে প্রথমে মানবজীবন-দর্শন সম্পর্কে অবহিত করান। কোন মানুষই যে অমর নয়, মৃত্যু একদিন সবারই পরিণাম--এ সব তত্ত্বকথা নানাভাবে ব্যক্ত করেন।

‘বৃথা অস্ত্র-শস্ত্র, বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, ধন।

কারো কেহ না পারিব রাখিতে জীবন!

বাহুবলে ইন্দ্র সম শাসিল যে সবে।

হেন রাজা স্বর্গে চলে ভূমি পরাভবে।।

এক যদি চলি যায় আর পুনি আইসে।

দিন চারি সুখে সেই রাজ-পাটে বৈসে।।

যত শক্তি করে যেই যতেক বিক্রম।

আসিতে বীরের মত যাইতে অন্ধসম।

আপনা শরীর যদি না হয় আপনা।

পৃথিবীতে আপ্ত আর হৈব কোন জনা।।।

মহামায়া--মাহমগ্ন হই নরলোক।

মোর গৃহ, মোর পুত্র করি ভাবে শোক।" ইত্যাদি।

এসব জীবনের পাঠ শুনিয়ে নারদ স্বর্ণষ্ঠীবীর জীবন ফিরিয়ে দেন। কাজী দৌলত এই কাহিনী শুনিয়ে চন্দ্রানীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির কাহিনী গ্রন্থন করেছেন।

তবে স্বর্ণীবীর কাহিনীটি শান্তিপর্বে একুট অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। শান্তিপর্বে আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র সৃঞ্জয়-কুমারের দেহাভ্যন্তর থেকে স্বর্ণ বর্ষণের কথা অবগত হয়ে পাছে মর্ত্যের রাজার ঐশ্বর্য কালক্রমে দেব তথা ইন্দ্রকেও অতিক্রম করে যায় এই ভয়ে কুমার স্বর্ণষ্ঠীবীকে মারতে বর্জকে পাঠান। বজ্র স্বর্ণষ্ঠীবীর ছিদ্র অন্বেষণে তার পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকেন। একদিন সুযোগ বুঝে বর্জ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে কুমারকে বধ করেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, কবি দৌলত কাজী কাহিনী গ্রন্থনায় দ্রোণপর্বকে অনুসরণ করলেও শান্তিপর্বের বজ্রের ব্যাঘ্ররূপ ধারণ প্রসঙ্গ নারদের জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা বিষয়ক উপদেশ বাণীতে সংযুক্ত হয়েছে

'পশু প্রায় মানব বান্ধিয়া মায়া ফাসে।

ছিদ্র পাই ব্যাঘ্রে ধরি সমূলে বিনাশে ।

কবি দৌলত লোর-চন্দ্রানী-বামন অংশের কাহিনী বর্ণনায় মূলত রামায়ণ-মহাভারতের এরূপ কিছু কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন।

'সতীময়না' অংশের বারমাস্যা বর্ণনায় কার্তিক মাসের ঋতু প্রকৃতি অনুযায়ী কামকেলিব সঞ্চার প্রসঙ্গে দূতী মালিনী রাধা-কৃষ্ণ, বিদ্যা-সুন্দর-এর প্রেমের পাশাপাশি পাণ্ডব-মাতা কুন্তীর কুমারীকালের কথা এনেছেন—

'ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কাম কেলি।।

রাধা সনে নিকুঞ্জে খেলায় বনমালী।

পুরুষ-বিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী |

সেই চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী।।

জগতে প্রতিষ্ঠা দেবী কুন্তী পতিব্রতা।

রুদ্রদেব-রূপ কল্পি হইল কামহতা ।।

ময়নার সতীত্ব নষ্ট করার জন্য কুটিনী মালিনী এই প্রসঙ্গগুলি এনেছে। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কথা যুগ যুগ ধরে চর্চিত ও দেবভাবনা সংযোগে গৃহীত ; বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনী মানব-মানবীর মর্ত্য জীবনবোধের ধারায় কিছু ক্ষেত্রে গৃহীত হলেও সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন জীবন-বাধে গ্রহণীয় হয়নি। এ প্রসঙ্গগুলি পাঠকের কাছে পূর্বেই পৌছেছে। কিন্তু পঞ্চসতীর এক সতী পাড়ুপত্নী ও যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের মাতা কুন্তী কুমারী বয়সে মুনি দুর্বাসার কথায় রুদ্রদেবকে আহ্বান করে সাক্ষাৎ পেয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি কর্ণের জন্ম। মহাভারতের এই । কাহিনীর ভাব-নির্যাসকে সংহত আকারে কবি দৌলত এখানে ব্যবহার করেছেন। মালিনীর মুখে। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ময়নার সতীত্ব রক্ষার দৃঢ়তাকে ভাঙতে আরো উপযুক্ত দৃষ্টান্তকে প্রয়োগ করেছেন।

এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দেবতা ও দেবকল্প ভাবনা থেকে সরে গিয়ে মর্ত্যজীবনের চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা, মিলন-বিরহের কাহিনী গ্রন্থনে আমাদের পুরাণ ও জাতীয় কাব্য রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ঘটনাবলী, চরিত্র, ভাবধারাকে প্রয়োগ করেছেন।

৫.১১ বৈষ্ণব পদাবলী সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যান্য কাব্যের প্রভাব

দৌলত কাজীর পাণ্ডিত্য, তাঁর সাহিত্যানুরাগ এবং বহু বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব ও আস্বাদনের ক্ষমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাস' যা গ্রাম্য হিন্দীভাষায় রচিত; তেমন দুর্বোধ্য বিষয়কে অনুবাদ দানের ক্ষমতায় কবির হিন্দীভাষার সঙ্গে সম্যক পরিচিতিকেই তুলে ধরে। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গেও কবির সুসম্পর্ক ছিল। এছাড়া সংস্কৃত

ভাষায় রচিত ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র এবং কাব্যাদি কবি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। দৌলত কাজী সূফী ধর্মাবলম্বী কবি। সূফীতত্তের নরতত্ত্ব বা নরবাদ সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঈশ্বর প্রেমকে সামনে রেখে এই জীবনরস সদ্ভুত মানবতাবাদ সূফী কবির ভাবনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে মধু আহরণে অনুকূল করে তোলে। ভাবে, ব্রজবুলি ভাষায়, ছন্দপ্রকরণে এমন সব পদ রচনা করেছেন কবি যেগুলিকে বৈষ্ণব পদ বলতে কো-নাভাবেই আপত্তি হবে না। শ্রাবণের বারমাস্যা বর্ণনায় ময়নার দুঃখবর্ণনা বৈষ্ণব পদ এবং বৈষ্ণব পদের প্রভাবকেই মনে করায় --

“শ্রাবণেত গগনের সঘন ঝরে নীর।

তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।

মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা।

তর্কয় যামিনী কণ্ঠায় মোর দেহা।

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষার ধবনিস্পন্দনে প্রভাবিত হয়ে দৌলত কাজী কয়েকটি উন্নত মানের ব্রজবুলির পদ উপহার দিয়েছেন। সেইরকম একটি -

“মোহর সুনায়ক গুণের পালক

মধুর মুরতি মুখ ভেশং।

সো মধু তেজিয়ে।| করাওসি বিষ পান

ভাল ধাই কহ উপাদেশং।।”

কবি জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীতগোবিন্দে’-র স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ‘সতীময়না’-কাব্যে। গীতগোবিন্দে’-র ধবনিস্পন্দক্রমে কবি সংস্কৃত ভাষাতেই বিরহিনী ময়নার অনুপম বর্ণনা করেছেন –

"বসতি তিমিরে অতি ঘোরং

নিচোল চকোর আঁখি সোরং

বক ফুল মঞ্জরী কিমতি অতি সীতি

মলিন অঞ্জন মুখ বেশং।"

কবি দৌলত কাজী রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। লোর বামনের যুদ্ধ বর্ণনায় রামায়ণের প্রভাব কবি অস্বীকার করতে পারেননি --

"এ বলিয়া মহাশর এড়ে লোর ধনুর্ধর

বামনের নিধন কারণ।

চর্ম মর্ম ভেদি শর প্রবেশিল কলেবর

সংজ্ঞাহীন পড়িল বামন।"

'বিদ্যাসুন্দর'এর কাহিনিও কবির জানা ছিল। দুই এক জায়গায় কৰি এর উল্লেখ করে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। চন্দ্রাণীর সঙ্গে ললারের গোপন মিলনের প্রসঙ্গে এর উল্লেখ আছে -

"বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।

দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।"

কবি শুধু উল্লেখমাত্রেই এই প্রভাবকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সমাজ অননুমোদিত গোপন মিলনে বিদ্যাসুন্দর যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে; লোর-চন্দ্রাণীর -গাপন মিলনে ঐ দুঃসাহসই প্রতিফলিত। এই প্রভাবগুলি দৌলত কাজীর হাতে আর বাহ্যিক প্রভাব হিসেবে না থেকে আন্তর্বর্তী ভাবসংগতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাব্যপরিকল্পনায় কবির মৌলিকতাকেই

প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইকথা বলা যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দে'-র প্রভাবের কথাতেও। ময়নার বারস্যা বর্ণনায় দৌলতে কাজী লিখেছেন –

"কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক

বকুল মুকুল কুল রঙ্গে।

হেরইতি মধুর। মধু পানে মধুকর

মাণিনী-মান এবে ভঙ্গে।"

মালিনীমুখের এই বর্ণনায় যে ছন্দধবনি তা স্পষ্টতই 'গীতগোবিন্দের রতিসুখসারে গতিসভিসারে মদনাননাহরবেশম'- পদের ছন্দধবনির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'সতীময়না'-কাব্যে ভাবসমৃদ্ধ সূক্তি-প্রৌঢ়োক্তির অসাধারণ প্রয়োগে সংস্কৃত কবিদের প্রভাবের কথাই মনে হয়। রায়বংশ-কাব্যে কালিদাস তিতীর্যদুস্তরং মোহদুড়পেনাস্মি সাগর' – এইরকম বর্ণনা করেছেন। পিপীলিকা যেন সিন্ধুতরঙ্গ সন্তরে' বাক্যটিতে দৌলত কাজী কালিদাসের ঐ বর্ণনার প্রভাব অনুভব করেছেন। সতীময়না' কাব্যের একজায়গায় দৌলত কাজি বর্ণনা করেছেন 'তুলারাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।' এই বাক্যটিতে কালিদাসের 'তুলারাশাবিবাগ্নিঃ পংক্তির অনিবার্য প্রভাব। দৌলত কাজি লিখেছেন 'ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান। রঘুবংশ'-কাব্যে কালিদাসের বর্ণনায় মেলে 'উপরূঢ় সামগ্রামিব চন্দ্রমা। দৌলত কাজীর উপর যার অনিবার্য প্রভাব। এথেকে দৌলত কাজীর গভীর কালিদাস প্রীতিই প্রমাণিত। তাছাড়া দৌলত কাজীর আরো অনেক উক্তিতে প্রাচীন কাব্যের অনুসৃতি ধরা পড়ে। একইরকম ভাবে 'সতীময়না' কাব্যে এমন অনেক প্রবাদ প্রবচনমূলক উক্তি আছে যা সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্রের কথাই স্মরণ করায়। শুধু ভারতচন্দ্র নয়, অনেক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকের প্রভাবও এই উক্তিগুলির মধ্যে বর্তমান। সেইরকম কয়েকটি

"(ক) যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।

তস্করেতে ধর্মকথা, বেশ্যাকে ভৎসনা।।

(খ) যুবক পুরুষজাতি নিঠুর দুরন্ত।

এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।

(গ) কাণ্ডারী বিহীন নৌকা শ্রোতে ভঙ্গ হয়।

পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয়।

রাত-রণস্থলে শয্যা অতি অনুষ্কাম।।"

পাণ্ডিত এবং কবিত্বের অনন্য মিশ্রণে গঠিত এই পংক্তিগুলি কবি দৌলত কাজীর আহরণশক্তি এবং মৌলিক উপস্থাপনার পরিচায়ক।

৫.১২ সূফী প্রভাব

মুসলমানদের সুফি ধর্ম-সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, আউল বাউল ধর্ম ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। মানবধর্ম ঈশ্বরধর্ম এক অদ্ভুত সমন্বয় সূত্রে এই ধর্মে বিরাজমান। সূফীরা সাধক, মুসলমান সাধক। এদের পরিচয় সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকার জানিয়েছেন "সমাজে পীর-ফকির-মুরশিদ ও সূফী সাধকদের আনাগোনা পাঠান আমলেই শুরু হইয়াছিলে; মুগলযুগে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে আউলিয়া, সিয়া ও সুফী মতাবলম্বী মুসলমানগণ দলে বাংলায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ডঃ প্রথম পর্ব, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

সূফী ধর্মের উৎস উত্তরভারতের সূফী খান্দান। আলাওলের মত দৌলত কাজী সূফী ধর্মাবলম্বী কবি। এই ধর্মের উদার ভাবধারা একটু রহস্যচারী হওয়া সত্ত্বেও আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী ও আলাওলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সূফী প্রভাব 'সতীময়না-কাব্যে বর্তমান। ফী ধর্মে প্রেম, বিরহ ও গুরুবাদ এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত।

গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি এই ধর্মের প্রধান কথা। এখানে গুরু মোল্লা-পুরুত নয়, এর অর্থ আরো ব্যাপক। সূফী ধর্মের শুরু উদার প্রেমের বোধে, সম্প্রদায় সংকীর্ণতার ঊর্বে মানষকে ঈশ্বরপ্রেমের জন্য ব্যাকুল করে তোলেন, উন্মুক্ত করে দেন মানবিকতার পথ। সূফীবাদী কবি দৌলত কাজী কাব্যে এই গুরুরই বন্দনা গান গেয়েছেন --

‘গুরুভক্ত হয় সে সাধক শুদ্ধ মতি।

তাহাকে দেয়ন্তস্বর্গ কৃপাময় পতি।।”

বিধাতা অন্তরঙ্গ অনুভূতিগম্য সত্য। এই সত্য উপলব্ধির জন্য মানুষ মাত্রেরই শিক্ষা করা উচিত। “এই শিক্ষা গ্রহণের জনা উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়। ... এ পথের গাইড-গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণত অস” (‘পথ ও পাথেয়' গ্রন্থের অবতরণিকা, শেখ ফজলুল করিম)। গুরু সাধন পথের আলো, প্রেমের দিশারী।

সূফী ধর্মের গৃহ্য সাধনপ্রণালীতে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে স্বীকৃত যে দেহের মধ্যেই দেহাতীতকে সন্ধন করতে হবে। এই দেহাতীত জ্যোতির্ময় ঈশ্বর প্রেম। আমাদের পরিচিত সংসার প্রেমের আধারেই ধৃত। যদি দেখতে পারি, চোখ খোলা থাকে তাহলে সংসার প্রেমময়ও বটে! সূফী ধর্মে দেহধারী মানবপ্রেমেই ঈশ্বরপ্রেমের উপলব্ধির সাধনা। সূফী কবি দৌলত কাজী ‘সতীময়না’ -কাব্যে এই মানবকে, মানব প্রেমকে মহিমান্বিত করেছেন –

“নিরঞ্জন সৃষ্টি নয় অমূল্য রতন।

ত্রিভবনে নাহি কেহ তাহান সমান।

নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।

নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান ।”

কবি মানব জীবনকে এক অপূর্ব গৌরবে উদ্ভাসিত করেছেন। দেহকে ভিত্তি করে সূফী সাধকের সাধনা বলে, মানুষের মধ্যে এক বিজন মহত্ত্বের সন্ধন লাভ করেন এই কবিরা। দৌলত কাজী 'সতীময়না'-কাব্যে মানুষের এই মহত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

সূফী সাধকদের এই সর্বব্যাপী প্রেম ও মানবিকতার কাছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তুচ্ছ হয়ে গিয়ে সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব ও সর্বমানবের মূলগত ঐক্যের বৃহৎ সমন্বয়বাদী আদর্শ গড়ে উঠেছে। সূফী ধর্মের অধ্যাত্মবাদ তাই মানব প্রেমবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে ভালোবাসলে প্রেমময় ঈশ্বরকে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ পন্থাটি আবিষ্কৃত হয়। দৌলত কাজী সূফী ধর্মাবলম্বী, কিন্তু কবি, জীবনরসিক কবি। তাই ভারতীয় সুফী ধর্মের গুরুবাদ, লীলাবাদ, মানবপ্রেম এবং সমন্বয়বাদী দৃষ্টি তার জীবন দর্শন হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানুষ যে মানুষই, তার মধ্যে যে কোন ভেদ নেই – 'সতীময়না' কাব্যে এটাই সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। মুসলমান কবি হয়েও উদার প্রেমের বোধে কাব্যপরিকল্পনায় বিশেষত কাব্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন হিন্দুধর্মের বিষয়। মুসলমানের আল্লার মত সমান শ্রদ্ধায় তিনি হিন্দুর দেবতাদের ভক্তিবন্দনা রচনা করেছেন। বৃহত্তর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকলে চন্দ্রাণীর মধ্য দিয়ে তিনি যে হিন্দু, দেবস্তুতি রচনা করেছেন, তা সম্ভব হতোনা --

"তুমি হরি হর তুমি কমল লোচন।

তুমি দেবপ তুমি শ্রীমধুসূদন ।

তুমি রাহু শিব গ্রহ তুমি কেতু ছায়া।

দুখ সুখ তোমা লীলা গৃহ সব মায়া ।"

ঈশ্বর সৃষ্ট নর যে 'অমূল্য রতন' সেখানে যে কোন ভেদ নেই; সূফী ধর্মের এই প্রভাব কবি সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই শ্রীসুধর্মার রাজসভায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপস্থিতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন –

"সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।

স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান '

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।

সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর।।"

অনিত্য সংসার নয়, নিত্যলাকই যে মানুষের সারসত্য আরও উল্লেখ কাব্যে দিয়েছেন কবি। সূফী ধর্মে ভাবধারার সঙ্গে মিলে যায় এমন প্রসঙ্গও যেমন - যোগী বা যুগী, বাউল ইত্যাদিও দেহবাদী প্রেমের সূত্রে কাব্যে জায়গা করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে পার্থিব প্রেমের মধ্যেই যে ঈশ্বর প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় – নর নারীর প্রেমকে কাব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে সে সম্বন্ধে কবি স্পষ্ট, ধারণা পোষণ করেছে।

সূফী ধর্মে পরিপূর্ণ আশ্বাস ছিল কবি আলাওলের দৌলত কাজীর মত তিনিও সূফী ধর্মানুযায়ী গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে গুরু মানবের মনে ঈশ্বরের জন্যে প্রেম এবং ব্যাকুলতা তৈরী করে পরিপূর্ণ প্রেমময় করে তোলেন, সেই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি --

"শশধর ধরিতে বলে কেহ স্তুতি তালে।

অসাধ্য সাধনে মাত্র গুরু কৃপা বলে।"

প্রেমময় ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন; স্বভাবতই কাব্যস্রষ্টা প্রেমের দিশারী। সূফীভাবপুষ্ট কবি আলাওলের দৃষ্টিতে এই প্রেম মানবপ্রেম। হিন্দুপ্রেমের কাহিনিকে বিষয় করে কবি সেই ভুবনজয়ী প্রেমকেই জয়যুক্ত করেছেন। সর্ব ঈশ্বর প্রসঙ্গ এবং লীলাবাদ সূফী ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর আলো স্রষ্টা, তাঁর অনুগ্রহেই এ জগৎ সংসারের সৃষ্টি। আলাওলের দৃষ্টি এ প্রসঙ্গে সূফী ধর্মানুসারী -

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।

যেই প্রাণী মর্ত সর্ব করল সৃজন ।

সৃজয়ে অবনী রূপ সৃজে সূর্য পানি।

ক্রমে ক্রমে সৃজ এ করিয়া পুণ্যকামী।

কবি আলাওলের মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। সূফী ধর্মের প্রভাবের ফলে কবি তাই ঈশ্বর সৃষ্ট মানবের মধ্যে কোন ভেদাভেদ কামনা করেননি। বৃহত্তর মানবপ্রেমই কবিকে সূফী ধর্মের এই দর্শনে বিশ্বাসী করে তুলেছিল বলেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বব্যাপী মানবিকতার গৌরবময় স্তুতি কবি উচ্চারণ করেছেন, সতীময়না'-র অল্প পরিসরেও; যে অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করেছিলেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক আলাওলের মধ্যে সূফী ধর্মের যে দর্শন গড়ে তুলেছিল, বৈষ্ণবীয় লীলাবাদে সেই দর্শনই প্রতিষ্ঠিত। লোরের সঙ্গে মিলনের জন্য ময়নার অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণাভোগ প্রেমের এই দিকটিকেই উজ্জ্বল করে তোলে। আলাওল যেমন দৌলত কাজীও একইভাবে সূফী ধর্মমতে অনুসারী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হীন এক উদার মানব প্রেমকেই জয়যুক্ত করছেন। যেখানে জাতপাতের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল নেই, আচারধর্মের তুচ্ছতা নেই, ঈশ্বরধর্ম মানবধর্ম পরিপূরকতার ইঙ্গিত বহন করে, সংস্কৃত দেহসাধনার মধ্যে, দেহপ্রেমের মধ্যে দেহাতীতের আস্বাদ গড়ে ওঠে – উদার সূফী ধর্মের এই মহৎ আদর্শই 'সতীময়না' কাব্যে উজ্জ্বল।

৫.১৩ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। 'সতীমনা ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যটির নামকরণর সার্থকতা বিচার কর।

২। 'সতীমনা ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যটিতে সূফী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো ।

৩। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যের প্রেমকাহিনীর স্বাতন্ত্র পরিস্ফুট কর ।

৪। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যের লোক উৎস ও লোকপ্রভাব প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো ।

৫। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যে অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাবসম্পর্কে আলোচনা করো ।

৫.১৪ সহায়ক গ্রন্থ

১। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী - সম্পাদনা ও মযহারুল ইসলাম, দুলাল চৌধুরী।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যর ইতিহাস (২য় খন্ড)- শ্রী সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খন্ড ও প্রথম পর্ব)- শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন -মঞ্জুলা বেরা ।

৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম - সুখময় মুখোপাধ্যায় ।

৬। রাজসভার সাহিত্য -দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ৬- লোরচন্দ্রানীর চরিত্র সৃষ্টি

বিন্যাস ক্রম

৬.১ ভূমিকা

৬.২ মুখ্য চরিত্র ও ময়নাবতী

৬.৩ চন্দ্রাণী

৬.৪ লোর

৬.৫ বামন

৬.৬ অন্যান্য চরিত্র

৬.৭ নির্বাচিত প্রশ্ন

৬.৮ সহায়ক গ্রন্থ

৬.১ ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যগুলির একটি বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত। কাহিনি বিন্যাসে মধ্যযুগের এই কবিরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি; কিন্তু প্রচুর সার্থক ও উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি করে প্রশংসনীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। সেই ধারারই একজন সার্থক কবি আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী। বিষয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ কাহিনির ক্ষেত্রে তিনি হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসৎ'-কাব্যের খণ্ড, কাব্যের সূত্রপাতেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু যে অলৌকিক প্রতিভায় তিনি একটিতাতি "দাকৃতি রূপকথা সমৃদ্ধ কাব্যকে অসাধারণ আখ্যানকাব্য হিসেবে গড়ে তুলেছেন – সেই

একই অঘটনপটিয়সী প্রতিভায় তিনি সৃষ্টি করেছেন। বেশ কয়েকটি অসাধারণ চরিত্র। তবে একই আখ্যানকাব্যের সব চরিত্রই যে সার্থক উজ্জ্বল এবং অবিস্মরণীয় হবে তা নয়। শুধু কাহিনির প্রয়োজনে প্রচুর চরিত্রের আমদানী ঘটবে যারা পাঠকের হৃদয়ে তেমন করে দাগ কাটবে না। এও বলা যায় এই চরিত্রগুলির প্রয়োজনানুযায়ী উদঘাটন কিংবা অপ্রয়োজনীয় আনয়ন কবি প্রতিভার সুনাম ও গৌরব সবসময় বৃদ্ধি করবে না। এই জাতীয় চরিত্র গৌণ চরিত্র। কাহিনির কর্তৃত্ব, যার হাতে কিংবা যে চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে কাহিনির পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়, সেগুলি প্রধান বা মুখ্য চরিত্র। সতীময়না' কাব্যে প্রধান চারটি চরিত্র -- ময়নাবতী, রাজা তোরক, বামন এবং চন্দ্রাণী। গৌণ চরিত্রের তালিকা বেশ দীর্ঘ -- -যাগী, ধাই, সখী, সারথী, চন্দ্রাণীর পিতা, দৈবপুরুষ, রতনা মালিনী, সূঞ্জয় রাজা, রাজপুত্র স্বর্ণষ্ঠীব, মুনিবর অঙ্গিরা ও নারদ, ছাতন কুমার, রাজা উপেন্দ্রদেব, রাণী রতন কলিকা, আনন্দ, মদনমঞ্জরী, সদাগর রাক্ষস, শুক পাখি, ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র প্রচণ্ড তপন, চন্দ্রপ্রভা প্রমুখ।

৬.২ মুখ্য চরিত্র ও ময়নাবতী

দৌলত কাজীর চরিত্র নির্মাণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নজর এড়িয়ে যাওয়ার নয়। কাব্যের নারী চরিত্রগুলিকে কবি যেমন পূর্ণতা দান করেছেন, প্রায় কোন পুরুষ চরিত্রই সে দাবী করতে পারে না। রাজা লোরের কথা মনে রেখেও একথা সত। নারী চরিত্রে মাধুর্য ও ঔদার্য কবি অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পঞ্চভূত' গ্রন্থের পাঞ্চভৌতিক সভার সদস শ্রীযুক্ত সমীরের মুখ দিয়ে বলেছেন, “বাংলা সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত।” দৌলত কাজীর 'সতীময়ন' -কাব্যের নারীচরিত্রগুলি জীবন্ত ও গতিশীল হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত।

কাব্য-সাহিত্যে কোন কোন চরিত্রের বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে। কোন কোন চরিত্র স্রষ্টার বিশেষ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দর্শনকে ধারণ করে বিবর্তিত হয়। সতীময়না’-কাব্যে সতীত্বের আদর্শপুষ্ট ময়না। এই চরিত্রের মধ্যে প্রেমের এক দীপ্ত শিখা সতীত্ব ও পাতিব্রত্যকে ভিত্তি

করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাব্যবিন্যাসে কবি দৌলত কাজীর এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি অনুচ্চারিত থাকেনি। 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি'-অংশে কবি তারই নির্দেশ রেখেছেন ---

“শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।।

শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।

ভারতে পুরাণে সত্য, সত্য সে বাখানে।

চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে ||

সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।

কোন্ মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী।”

সত্যের এই জ্যোতির্ময় আলোক ময়না চরিত্রের ধ্রুবতারা। পরিপূর্ণ সত্যের বিশ্বাসে যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থির অচঞ্চল থাকার সাধনা ও প্রেরণা ময়নার। কথারম্ভ -অংশের সামান্য বর্ণনাধর্মী উপস্থাপনায় কবি দেবী পার্বতীর সঙ্গে তুলনার সাদৃশ্যে দৃঢ় সংকল্প ময়নার অসামান্যতাই চিত্রিত করেছেন -

“রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।

ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী।”

দেবী চরিত্রের সঙ্গে যে চরিত্রের তুলনা, তার রূপে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া উজ্জ্বলতা নেই, একটি স্নিগ্ধতা বিরাজমান। মনে হয় যেন ময়নার বাইরের অনুপম রূপ ও সৌন্দর্য ময়নার অন্তরকে প্রেম সুধায় উদ্ভাসিত করে। কল্যাণময়ী প্রেমের প্রতীক এই রমণীর আচারেআচরণে সংসারে স্ত্রী ও মঙ্গল আবর্তিত হয়। পতি এই নারীদের প্রিয়তম পুরুষ, তাদের আরাধ্য দেব -

"প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস সুমতি।

প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।।

পতি বিমুখ হলে অসহনীয় যন্ত্রণায় তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে। হৃদয়ে জাগিয়ে রাখে স্থির বিশ্বাস। রূপতৃষ্ণার্ত চঞ্চল পুরুষ রাজা। লোরের পত্নী স্বামী সান্নিধ্য বঞ্চিত জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গৃহকর্মে ও গৃহধর্মে নিযুক্তা ময়না সত্যনিষ্ঠায় এক বিন্দু আঁচড় পড়তে দেয় না। স্বামী বঞ্চনায় অসহিষ্ণুও কো-নাভাবেই নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে লঙঘন করে কর্মক্ষেত্রে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, পরপুরুষ আসক্তি তার কল্যাণময়ী মানসগুহে উঁকি দেয় না। উমা-পার্বতীর সঙ্গে তপস্যা ধর্মে ময়না একাসনে বসার অধিকারী।

পতি যে কামোন্মত্ত পুরুষ ময়নার তা জানা নয়। কিন্তু যুগে যুগে মঙ্গলময়ী পতিপরায়ণা রমণীরা এই উচ্ছঙ্খল পরনারী আসক্ত পুরুষদের জন্য পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করে। হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখে প্রেমের পূতাগ্নি। সতীময়না'-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ময়নাকেই বিরহের আগুনে পুড়িয়ে কবি যোগিনীর রূপ দান করেছেন। বারমাস্যা'-র দীর্ঘ অংশে দেহ ও পরিবেশ সচেতন কিন্তু বিশ্বাসে স্থির, লক্ষ্যে অবিচল ময়নারই আবির্ভাব ঘটেছে। শরীরের প্রসঙ্গ উপেক্ষা না করে ময়না বাস্তব মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট নারীর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। শরীর আছে, মিলনের আকাঙ্খা সেই শরীরেও কেঁপে আসে। ময়না সে দিক উদঘাটিত করে আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে।-

"শ্রাবণেত গগনে সঘন ঝরে নারী।।

তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ।।

মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা।

তর্কয় যামিনী কম্পয় মোর দেহা।"

ময়নার শরীরের প্রতি এ আকুলতা প্রকাশ আশ্চর্য স্বাভাবিক। কারণ তার পতি বর্তমান। মিলনের আকাঙক্ষাও তার স্বাভাবিক। এই আকাঙক্ষা ময়নাকে দেহবাদী নারী না করে স্বামী অনুরাগিনী নারীতে পরিণত করেছে। ময়না চরিত্রের অসাধারণত্ব দেহ ভাবনার প্রকাশে নয়, সেই মিলনাকাঙক্ষাকে আশ্চর্যের কাঠিন্যের প্রতি সংযমে। এই নারীর চোখে পরপুরুষসঙ্গ অকল্পনীয়, বিষবৎ পরিত্যাজ্য—

"আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।।

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।

কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ||

গরম সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।

দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ !!"

ময়না চরিত্রের এই দর্শন পাণ্ডিত্যের প্রভাবজাত নয়, জীবনের সত্য আলোক চেতনা থেকে স্ব-তাৎসারিত। ছাতন কুমারের প্রলোভন বার্তায় মাঝে মাঝে দেহ ও মনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে। কিন্তু ক্ষণিকের বুদবুদের মত জেগে ওঠে এই দেহচেতনা হারিয়ে গেছে, পরাজিত হয়েছে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সংযমের গভীরতম বোধের কাছে। সংকল্পের এই দৃঢ়তায় স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা বিরহকাতরা ময়না। সত্যসুন্দরের উপাসনায় শুদ্ধ প্রেমেরই আরতি করেছে --

"নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম পূজে নিতি

স্বামি-বর মাগে সর্ব কালে।

ময়নার একটাই লক্ষ্য স্বামীর প্রত্যাবর্তন এবং স্বামীর সঙ্গ সুখ। রাজার স্ত্রী হিসেবে ময়না চাইলেই হয়তো যুদ্ধ সংঘটিত করে চন্দ্রাণীর কবল থেকে স্বামীকে উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু ময়নার মত রমনীর পক্ষে সে পথ যথার্থ পথ নয়। তাছাড়া ঐভাবে স্বামীকে ফিরে পেলেও তার প্রেম যে ময়নার প্রতি ধাবিত হবে এমন ভাবনায় জোর করে কিছু বলার

উপায় নেই। কবি তা চান নি বলেই লোরের কামনা ও ভোগের রাজ্যে ময়নাকে উপস্থিত করেন নি। ময়নাকে বিরহ ব্যথার যন্ত্রণায় আরাধ্য তাপসীর মূর্তি দান করেছেন। তপশ্চর্যার এই মঙ্গল ও সত্য চিরকাল ভোগ ও চঞ্চল কামনার উর্ধ্বে বিরাজমান। সীমাহীন প্রতীক্ষার এই সাধনাই একদিন কামনার রাজা থেকে রাজা লোরকে ময়নার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। কামনা নয় প্রেমই শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল।

বিশ্বাস ও সত্যের একটি তারে চরিত্রকে আদান্ত গড়ে তুলেছেন; কবি দৌলত কাজী। আলাওলও সত্যবন্ধ ময়নার চরিত্রকেই আলোকিত করেছেন। এক সুরে বাঁধা ময়না চরিত্র তবু static চরিত্রে পর্যবসিত হয় নি। সত্য বিশ্বাস ও অবিচল প্রতীক্ষার নিঃকম্প শিখা মাঝে মাঝেই কম্পিত হয়েছে দেহের বাস্থবতায়, সতিনী চন্দ্রাণীর প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণে—

"যে দুঃখ মোহর পরে পড়িয়াছে ধাই।

সেই দুঃখ পড়েকি গিয়া সতিনীর ঠাঁই।।"

'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে' – যন্ত্রণাদগ্ধ রাধার এই উচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায় ময়নার উচ্চারণ। ময়না চরিত্র গড়ে তুলতে গিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর জগতের রাধার চরিত্র বৈশিষ্ট্যেই আদ্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন কবি। রাধা চরিত্রের মূল ভাব বীজ দৌলত কাজীর হাতে যেন ময়নার মূর্তি ধারণ করেছে। তাই সতিনীকে গালমন্দ করছে ময়না, প্রতিনিয়ত বিরহ যন্ত্রণায় পিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পরপুরুষের প্রসঙ্গ আনলেই দূতীকে গালমন্দ করে সেই যোগিনীর বেশকেই স্বীকার করে নিচ্ছে ময়না। যোগিনী ময়নার সেই মূর্তি মালিনী রত্নার বক্তব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত-

"মলিন চিকুর তোর মলিন অম্বর।

মলিন দেখয় তোর চারু কলেবর।।

নয়নে অঞ্জন নাহি সীযেত সিন্দুর।

ত্রিভঙ্গ খোপার মাঝে না দেখি তোহোর।।”

ময়না চরিত্রের এই স্বামীপ্রেম অগ্নিশিখার মত বিরাজমান, এই সত্য তার অন্তরের সুদৃঢ় সংস্কার। শত প্রলোভনও এই সত্যের দেওয়ালে ফাটল ধরাতে পারে না। এই সতীত্ব ধর্মকে কবি অনবদ্যরূপে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছেন ময়না চরিত্রে। বাহ্যবিচারে ময়না হয়তো সক্রিয় নয়, চন্দ্রাণীর মত নিজের তৃপ্তির প্রয়োজনে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনে দুঃসাহসিক ও অসামাজিক প্রচেষ্টা তার নেই। আসলে ময়না ও চন্দ্রাণী ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। তাই চন্দ্রাণীর মধ্যে রোমান্টিক আবেগ উচ্ছলতা, ময়নার চরিত্রে নীতির মূল্যবোধের স্বচ্ছতা ও গভীরতা। আলাওল রচিত অংশে, নীতি ও সংযমে সুস্থির কিন্তু বাস্তবের আঘাতে চঞ্চল সজীব ময়নারই দেখা মেলে

“স্বামীর বিচ্ছেদে ঘোর অসন্তোষ চিত।

সংসারের যত সুখ লাগে বিপরীত ।

মোহর ঘরেতে লোর আসিবেক যবে।

এক রাতে শতরাত্রি সুখ হৈব তবে।”

দৌলত কাজী ও আলাওল উভয় কবি এমন ময়নাকেই জীবন্ত করেছেন। কবি দৌলত কাজী জীবিত থাকলে ময়না চরিত্র হয়তো আরও মাধুর্যপূর্ণ, সতীত্বধর্মে অবিচল নারী চরিত্রের পরিণতি লাভ করতো। কবি আলাওলও ময়না চরিত্রের পূর্বাপর সঙ্গতিবিধান করেছে। ময়না চরিত্রের ক্ষেত্রে উভয় কবি মিলে ময়না চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। আলাওল ময়না চরিত্রকে আর একটু এগিয়ে দিয়েছে একটি বিশেষ ভাবনায়। চূড়ান্ত প্রতীক্ষার পরও স্বামীর প্রত্যাবর্তন না ঘটায় শুক পাখি সহ এক ব্রাহ্মণকে রাজা লোরের চেতনা ফেরাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে। বাস্তব মানুষের অগ্রবর্তী ভাবনায় ময়না এই অংশে একেবারে মাটির কাছাকাছি চলে আসা চরিত্র এবং তার পূর্ণতা সব মিলিয়ে।

৬.৩ চন্দ্রাণী

প্রাত্যহিকতার পরিচিত পথ রোমান্স জগতের অধিবাসীকে আকর্ষণ করে না। অন্তরের প্রচণ্ড তাগিদ এবং সব ছাপিয়ে যাওয়ার দুর্বার বাসনাই রোমান্টিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নর-নারীকে ঘর ছাড়া করে। রহ রোমাঞ্চ এবং অজানার হাতছানি এদের হৃদয়ে সপ রিত করে সাহস! এই সাহসই জাগতিক বন্ধন ছিড়ে রোমান্টিক নর-নারীকে দূরে বহুদূরে হারিয়ে যেতে সাহায্য করে। সূফী প্রেমের আদর্শ দৌলত কাজীকে দেহ ও দেহাতীত প্রেমে সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী করেছিল। মঙ্গল ও সত্যের প্রতি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবির সমর্থন থাকলেও কবি হৃদয়ের আকুতি ছিল অন্য ছবি অঙ্কনের প্রতি। স্পষ্টভাবে বলতে হয়, দৌলত কাজীর কবি হৃদয় বিভাজিত হয়েছিল দুই শ্রেণির প্রেমের প্রতি। কবির নৈতিক সমর্থন ছিল সতীত্বের মহনীয়তার উজ্জ্বল ময়নার প্রতি। কিন্তু প্রাণের সমর্থন ছিল বাসনা রাজ্যের রাণী রোমান্টিক চন্দ্রাণীর প্রতি।

রাজসভার দরবারী রুচি ও আকাঙক্ষাও দৌলতে কাজীর কাব্য পরিকল্পনার পেছনে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। রাজসভার পরিবেশ মানেই ভোগের উন্মত্ত প্রবাহ, কামনার ফেনিল উচ্ছাস এমনটা নয়। তবে রাজা ও রাজপুরুষেরা শুধু সতী লক্ষ্মী স্ত্রীর সাহচর্যই একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকার করতেন না। যুদ্ধের রণদামামা অপরের রাজ্য অধিগ্রহণের বাসনা তাদের হৃদয়ে সাহসের উত্তেজনা জাগিয়ে তুলত। নারীর সৌন্দর্য ও নারী শরীর ভোগের মধ্যে রাজারাজড়ারা কোন বিবেকের তাড়না অনুভব করতেন না। 'সতীময়না' কাব্যে চন্দ্রাণী চরিত্রটি পরপুরুষের ভোগের সামগ্রী না হয়ে নিজের অতৃপ্ত যৌবন বাসনার প্রচণ্ড তাগিদে ভোগের রাজ্যকে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলতে বাধা নেই, রোমান্টিক প্রেমের অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে উজ্জ্বল হয়ে আছে রাজকন্যা চন্দ্রাণী। এই নারী কামনা রাজ্যের রাণী নয়। বরং দেহগত যে বাসনা স্বামীর সহবাসহীনতায় অপরিতৃপ্ত, তার প্রভাবই চন্দ্রাণী চরিত্রের চালিকা শক্তি। ময়নাকে

কবি দেবী পার্বতীর সঙ্গে তুলনা করে তার সতীত্ব ও 'ত্যাগ তিতিক্ষার। প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। অসাধারণ শিল্পবোধে সেই কবি ইন্দ্রপত্নী শচীর সঙ্গে তুলনা করলেন চন্দ্রাণীর

'স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্ররাণী শচী কলাবতী।

চন্দ্রাণী অসাধারণ রূপসী রাজকন্যা, তার বিয়েও হয় মহাবীর বামনের সঙ্গে। কিন্তু এই বীর বামন সঙ্গমে অসমর্থ

'রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।

ভরা যৌবনের এই ব্যর্থতা কিন্তু চন্দ্রাণীকে কামময়ী করে তোলে না। তবে বিবাহ অনুসারী যে মিলনের স্বপ্ন নারী দেখে, তা প্রতিহত হওয়ার একটা হাহাকার তার মধ্যে জেগে ওঠে। বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে বলতে হয়

"সম্ভোগে শিশুর প্রায়, জ্ঞানে নহে আন।।

পশুমত স্বামী মোর, বুঝিলু ধরণ।

শুন যদি তাকে মোকে করাও মিলন।

গরল ভক্ষিয়া মুই তেজিমু জীবন।"

স্বামীর এই অক্ষমতা অন্যের কাছে বলতে যাওয়া শুধু স্বামীর নয়, নিজেরও অপমান। এমন অবস্থা দেহসর্বস্ব নারী ছাড়া অধিকাংশ নারীই প্রেমের আলোকে অতিক্রম করে যেতে চায়। চন্দ্রাণীও হয়তো তাই করত। কিন্তু বামন সঙ্গমে অসমর্থ শুধু নয়, সে অসভ্য, তামার্জিত, প্রেমবর্জিত। এমন স্বামীর প্রসঙ্গে চন্দ্রাণীকে বলতে হয় -

"পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।।

মূখ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।

সর্বগ্রাসী কামনা নয়, বিবাহিত নারী স্বামীর কাছ থেকে প্রেমযুক্ত কামনাই প্রত্যাশা করে। চন্দ্রাণীও তাই চেয়েছিল। কিন্তু বামনের কাছ থেকে সবদিক থেকে আশাহত হয়ে সে বলে ওঠে না মাগম কেলি কলা রতি রঙ্গ আশ। এমন অবস্থার মধ্যেই কিন্তু চন্দ্রাণী তার লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করে--

"ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।

সখীগণ সঙ্গে তথা থাকিমু কৌতুকে।।"

দেহগত কামনার প্রচণ্ড পীড়নই চন্দ্রাণীকে রাজা ললারের প্রতি আকর্ষণ করে তা নয়। চন্দ্রাণী নিজে অসাধারণ রূপসী। এই রূপ সচেতনাই তার মধ্যে বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গের মত রূপতৃষ্ণাকে লালিত করেছে। দৌলত কাজী চন্দ্রাণী চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন একে একে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাছাড়া ফুলে মধু থাকলে ভোমরা গুণ্ডন করবেই। চন্দ্রাণীর রূপের আগুন তাই অনেক পুরুষকেই তাড়িত করেছে, একটিবার দেখার আগ্রহে তাদের হৃদয় ভূষিত হয়ে রয়েছে। চন্দ্রাণী যদি শরীর সর্বস্ব নারী হোত, তবে তার কামনার আগুন মেটাবার জন্য পুরুষের অভাব হোত না। চন্দ্রাণীর দেহগত কামনা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে কোনভাবেই অবাধ না করে আশ্চর্য সংযমে লক্ষ্য স্থির করেছে সে—

"কুল লজ্জা অন্তস্পট করি নারী রহে।।

দক্ষিণ পবনে যেন শরীর না দহে

বৎসরের দুই বার যায় দেব স্থানে।

দেখে সুন্দর রূপ তপন নয়ানে।"

লোরের রূপ দেখে এই নারী একদিন আকুলিত হয়ে উঠল। এই আকুলতা স্বাভাবিক এবং চরিত্রানুগত। ময়নার সংযম প্রেমবোধ চন্দ্রাণী চরিত্রে প্রত্যাশা করা যায় না। স্বামীর সহবাসের ব্যর্থতা ময়নাকে তাড়িত করেনি, স্বামীর উপেক্ষা ও দূরে চলে যাওয়া তাকে

ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতীক করে তুলেছে। চন্দ্রাণীর যন্ত্রণা ও যাতনা ভোগ স্বামীর সঙ্গমজনিত অসামর্থে- মানস সংঘটনের এই ভিন্নতাই এই দুটি নারী চরিত্রকে ভিন্ন মেরুর করে তুলেছে। তাছাড়া চন্দ্রাণী যে অনেকটাই দেহগত ও সৌন্দর্যমগ্ন— কামনা প্রতিহত আক্ষেপোক্তির মধ্যেই তা প্রমাণিত।

চন্দ্রাণীর রূপের মোহ ও কামনার সংযম চেষ্টাগত, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়। তাই লোরের রূপ মুহূর্তেই তাকে অবিশ ও অচৈতনা করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণে চন্দ্রাণী রোমান্টিক নারী। যে কুলপ্লাবী লোর-আশক্তি এরপর চন্দ্রাণী চরিত্রে সঞ্চারিত তা কোন গৃহগতপ্রাণ নারীর মধ্যে সম্ভব নয়। নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করার সাহস, কামনার রাজ্যে পুরুষকে পতঙ্গবৎ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, বন্ধনমুক্তির অদমা উৎসাহ, দেহযুক্ত রোমান্টিক প্রেমের জগতে হারিয়ে যাওয়ার যে বাসনা মানুষকে রোমান্টিক জগতের অধিবাসী করে তোলে তার সবকটি বৈশিষ্ট্যই চন্দ্রাণীর মধ্যে বর্তমানে আগত। এরপর একের পর এক দুঃসাহসিক কাজে সে চমকিত করে দিয়েছে। এইকাজে চন্দ্রাণীকে সাহায্য করেছে রতিবিলাসিনী রতিপণ্ডিত ধাই বুদ্ধি শিখা। এই বুদ্ধি শিখার পরামর্শেই দর্পণে নিজের মৃতি দেখিয়ে -লারকে বিবস করে দিয়েছে চন্দ্রাণী। তারপর যখন যোগিবেশী ললারের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনের সুযোগ এসেছে, তখন নিপুণ দুঃশাকায় রতিশাস্ত্রের সহজ স্বাভাবিকবোধে সুকৌশলে ছিড়ে ফেলেছে গলার হার। যে সময়ে সখীরা অমূলার কুড়োতে ব্যস্ত, সেই দুর্লভ অবসরে প্রতিমার আড়াল থেকে লোরের সঙ্গে তার চাক্ষস মিলন সংগঠিত হয়েছে। এই নারী ময়না নয়। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা, সৌন্দর্য মোহগ্রস্ততা চন্দ্রাণীকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের অধিবাসী করে তুলেছে। রোমান্টিকতার দুর্জয় সাহসে সমস্ত বিপদ বাধাকে উপেক্ষা করে চন্দ্রাণীই তোরকে মিলনের জন্য আহ্বান শুনিয়েছে। অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা সর্বগ্রাসী হয়ে চন্দ্রাণীকে এ কাজে তাড়িত না করলেও পছন্দসই পুরুষের সঙ্গে মিলনে নারী হয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় বিবেকের কোন তাড়না তাকে প্রতিহত কননি! বরং রূপের মোহে অজস্র প্রতিকূলতা জয় করে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে রোমান্টিকতাই জয়যুক্ত হয়। মুক্ত প্রাণের এই অধিবাসীরা যথার্থই রহস্যময় রোমান্স ওতের। অনেক বাধার পরে

মিলনের স্বাদ এদের আকুল করে বলেই মিলনানন্দকে রোমান্টিক নারী-পুরুষ অসামাজিকতার অপরাধ বিচারে দূরে সরিয়ে রাখে না। গোপন মিলনের শিখরস্পর্শী সে ছবি কবি আমাদের উপহার দিয়েছে---

"বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।

দুরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।

দোহ উন্মত্ত দোহ রসেতে দুজন।

কাম রসে রতি শাস্ত্রে দোহান বিদ্বান।

পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।

রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।"

মধ্যযুগীয় আদিরসের অনাবৃত হয়তো একে বলা যায়। কিন্তু পুলক রোমাঞ্চিত দেহগত স্বাভাবিক মিলনের রোমান্টিকতা এই জাতীয় আচরণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। যা স্বাভাবিক মন যাকে চায় রোমান্টিকতার যাত্রা সেই পথেই। আদর্শের জন্য জীবনের স্বাভাবিক। জীবনাগ্রহকে বলি দিতে রোমান্টিকতা চায় না। তাই মিলনেই শুধু নয়, আরো দূরে অভিযান শেষ নবীন মিলনও রোমান্টিকতা প্রত্যাশা করে। স্বামী থাকা সত্ত্বেও সাহসী পুরুষের সঙ্গে রহস্যরোমাঞ্চের পথে চন্দ্রাণী ঝাপিয়ে পড়ে শুধু এই আকুলতায়। শুধু তাই নয়, পলায়ন যাত্রায়, বামনের সঙ্গে যুদ্ধে । যোগ্য নির্বাচিত পুরুষকে সার্থক প্রতিনিধি হয়ে সে উৎসাহিত করে। এই অংশে চন্দ্রাণী রোমান্টিক পুরুষের যোগ্য সহযাত্রী। কিন্তু চন্দ্রাণী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না নারীও বটে। ক্রমাগত -গাপন মিলন যে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং বীর বামন যে তাকে সমূলে বিনাশ করবে, চন্দ্রাণী এই আশঙ্কার কথা প্রণয়ী লোরের কাছে উত্থাপিত করে। কারণ লোরের চন্দ্রাণীর চিত্রপট কিন্তু সঙ্গে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা চন্দ্রাণীর। কিন্তু লোর যখন বামনকে বিনাশের কথা বলে, সেই মুহূর্তে চন্দ্রাণীর বক্তব্যে শুধু সমাজসচেতনতাই নয়, অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানেরও প্রকাশ মেলে—

করিব বৈরিতা যুদ্ধ বামনের সঙ্গে।

পৃথিবীতে তোমা নাম রহিব কলঙ্কে।।

লোকে খুযিন্তে রাজ-সুতা দুষ্টা ছলে।

নিজকান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে।

উপপত্নী হিসেবে না থাকতে চেয়ে চন্দ্রাণী আত্মমর্যাদায় লোরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার আকাঙক্ষা প্রকাশ পরে। মধ্যযুগীয় রোমান্স ভাবনায় নয়, যেখানে অবিশ্বাস্য ভাবনা জড়িত-- সেই চরিত্র পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়ে দৌলত কাজী চন্দ্রাণী চরিত্রে পরিণত রোমান্টিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

৬.৪ লোর

পৃথিবীর পুরুষ জাতি ও চরিত্র সম্পর্কে একটি চালু অপবাদ কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সতীময়না'-কাব্যের রাজা -লার সেই পুরুষ জাতির যোগ্য প্রতিনিধি। পতিব্রতা সতীসাধবী স্ত্রী থাকা সত্বেও চঞ্চলতা সেই এক কামোন্মত্ততারই প্রমাণ। দৌলত কাজীও লোরকে সেইভাবেই উপস্থাপিত করেছেন

"যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত।

এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত

আচম্বিতে মতি হৈল লোরক নৃপতি।

ছাড়িয়া রতনহোর গুঞ্জাত আরতি।"

চরিত্রের এই আগ্রাসী ভোগলিঙ্গার কারণেই স্ত্রী ময়নাকে পরিত্যাগ করে রাজা ললারের বনবিহার। স্বামীর এই জাতীয় মনোভাব ময়নার অজানা নয়। সামন্ত মানসিকতা পুষ্ট লোরের নারীপ্রীতির প্রতি বিরোধিতা করা ময়নার পক্ষে অসম্ভ। এটা এমন সময় যখন

রাজারাজড়াদের বিবাহিতা পত্নীরা থাকত অন্তঃপুরে; আর কামনা মদির রাজারা সুন্দরী রমনীদের শরীরের আকর্ষণে ফেনিল উদ্দামতায় বর্ণময় জীবন অতিবাহিত করত। ময়নার এমন স্বামী রাজা লোর। যার চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রী হয়েও ময়নাকে বলতে হয়—

"পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর

অন্তরে বাহিরে কালী।

যাবৎ মত্তমতি পুরি মনঃপ্রীতি

আর পুষ্পে করি কেলি।"

লোর চরিত্র আদ্যন্ত কামনালুব্ধ, ভোগবাদ সর্বস্ব পুরুষচরিত্র, জোর করে একথা বলা যাবে না। রোমান্স জগতের অপর এক চরিত্র চন্দ্রাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে; দৌলত কাজী লোর চরিত্রের ভিন্নাত্মক মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করেছে। যোগী প্রদর্শিত অসাধারণ রূপসী চন্দ্রাণীর চিত্রপট দর্শনেই রাজা লোরের কামনামদির চিত্তে গোহারি দেশে যাত্রা। এই আচরণ চঞ্চল মতি পুরুষের আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে কবি নায়কের অভিসার যাত্রা করিয়েছেন, তাকে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুঃসাহসিক করে তুলেছেন, সেই মুহুর্তেই চরিত্রটিতে রোমান্টিকতার স্পর্শ লেগেছে। তারপর একের পর এক তার রোমাঞ্চপুষ্ট আচরণে হালকা হয়েছে স্থূল রুচির বৈশিষ্ট্য। রূপকথার জগতের বীর রাজপুরুষ যে সাতসমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে বিশাল এক দেশের রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছেতার ছায়াতেই এই অংশের লোর চরিত্র গঠিত। অপরিচয়ের পথে যে বাধা আছে, এটা লোরের অজানা নয়। কিন্তু সেই তো বীর, যে । শত বিপদ বাধাকে উপেক্ষা করে বহুদূর দেশে অপেক্ষারত সৌন্দর্য প্রতিমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। প্রেমের এই সম্পর্কে রোমান্সেরই ছায়া। আর সেই কারণেই দুরন্ত সাহসে এবং গাছোমছমে ভীতির পরিবেশেই চন্দ্রাণীর সঙ্গে লোরের মিলন। এক্ষেত্রে রোমান্স জগতের অধিবাসী ললারের বীরমুর্তি--

"হাতে খড়া শোভে নেত ধরা পরিধান।

বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।।

কুমারীর অন্তঃপুরে গেলা লোরর।

রোহিণী উদ্দেশে যেন গেলা নিশাকর।”

পুরুষের এমন বীরমূর্তি নারীদের আরাধ্য। এদের জন্যই নারীরা মনে মনে দিবস রজনী অপেক্ষা করে। বীরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে এবং একজাতীয় রোমাঞ্চে এদের হাত ধরেই পথে বের হয়, চন্দ্রাণীও সুপুরুষ বীর লোরের সঙ্গে একদিন নিশ্চিত অবস্থান ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করে। এই পলায়নের পথেই বামনের সঙ্গে ললারের একটা বেশ গুরুগম্ভীর কিন্তু রূপকথার জগতের অবিশ্বাসমাখা যুদ্ধ বর্ণিত। এই অংশে বীর লোরই অঙ্কিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষমতায় এবং কাঙ্ক্ষিত নারীকে অধিকার করার সোচ্চার ঘোষণায় বামনকে যে ভাষায় লোর আক্রমণ করেছে তাতে নারী ভোগের দুর্বার বাসনা ও কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত

“খর্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া!

পুরুষ উত্তম স্থানে ভেজে তার প্রিয়া ।।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি মধু যথা পায়।

সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায় ।”

এমন পুরুষই সুন্দরী নারীকে অধিকারে নিয়ে আসতে; যোগীবেশ ধারণ করে। যদিও এই যোগীবেশ ধারণ বেশ একটা রহস্য রোমাঞ্চের পরিবেশেই গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও লোরের বিশ্বাস-অবিশ্বাস মাখা রোমান্টিক বীরত্বে দুর্বল কাপুরুষত্ব ছায়াবিস্তার করে, সে ব্যক্তিত্বময়ী চন্দ্রাণীর দ্বারা পরিচালিত হয়। চন্দ্রাণী যেমনটি চেয়েছে, বীর লোর সেই সেই কাজই করে গেছে। তবে সর্পদংশে সাময়িক। অচৈতন্য এবং মৃত বলে মনে হওয়া চন্দ্রাণীর জন্য লোরের বিলাপ পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে

"উঠ উঠ চন্দ্রমুখী কত নিদ্রা যাও।

মাধুরী সাদরে কেনে আমা না বোলাও।"

চকিত মুহূর্তে রোমান্টিক লোরের মধ্যে অন্য এক লোরের মূর্তি জেগে ওঠে। ময়না ও চন্দ্রাণী চরিত্রের গতিশীলতা না থাকলেও, লোরের চরিত্র অভিনব।

৬.৫ বামন

বিধাতার বিচিত্র পরিহাস কোন কোন চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সব মিলনে অতৃপ্ত মানুষের অসহায় বেদনাবোধ তখন ট্র্যাজেডির হাহাকারে পর্যবসিত হয়। 'সতীময়না'-কাব্যের এইরকম এক পুরুষ চরিত্র চন্দ্রাণীর স্বামী বীরপুর বামন। ট্র্যাজেডির সূত্রপাত ঠিক এখান থেকেই! আবির্ভাবে এই চরিত্রের অসাধারণ বীরমূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন

"দুর্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভুবন।

সমর ভূমিতে যেন সিংহের গমন ।।

খপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ ।

বামন বিক্রম যেন বলির উদাস।"

গোহারি দেশের রাজা মোহরা এমন বীরের সঙ্গে অসাধারণ রপবতী কন্যা চন্দ্রাণীর বিয়ে দেন। বিবাহ পরবর্তী অবস্থাই বামনের জীবনে এবং বামন-চন্দ্রাণীর সম্পর্কে মহাসঙ্কট তৈরী করে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এমন বীরই দাম্পত্য জীবনে এক অসহায় ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত জীবনের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। বামন নারী সহবাসে অক্ষম, একজন নপুংসক—

"রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।"

পুরুষের পৌরুষত্বের এমন অমর্যাদা, এমন অপমানিত রূপ ট্র্যাজেডির হাহাকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অসহায় ব্যর্থতার জন্য বামন তে! দায়ী নয়। অথচ সারাটা জীবন এর জন্য সে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, অপরের উপেক্ষা ও করুণার পাত্র----

“কামভাবে নারী প্রিয় না হয় বামন।।

মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।

নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি।”

বামনের জীবনের নপুংসকতা এক চূড়ান্ত অভিশাপ। অপ্রত্যাশিত এই অভিশাপের আঘাতে তার জীবন তছনছ হয়ে গেছে। কবি বামনের এই বাহ্য বিপর্যয়ের ছবি আঁকেন নি। কিন্তু তার অন্তরের ধ্বংসলীলা সুন্দরী স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার অনীহা এবং ক্রমাগত পলায়নপর মানসিকতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। নারী সহবাসে অক্ষমতা যে পুরুষের জীবনে কত বড় পরাজয়, কত বড় বেদনা-ভাগ বামন চরিত্রের হাহাকারের মুখোমুখি না হলে আমরা এমন করে অনুধাবন করতে পারতাম না। বিবাহিত নারী হিসেবে স্বামী মিলনের যে স্বপ্ন নারী চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে রাখে, সেই স্বপ্ন যদি নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙ্গে যায় তবে চাপা ক্রন্দন দোষাবহ নয়। কিন্তু সেই . সীমাহীন পরাজয়ের মুখোমুখি পুরুষের আত্মযন্ত্রণার কোন তুলনা চলে না। পৃথিবীর সব রঙ এক নিমেষে তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায়, গ্লানির দহনে সমস্ত আকাশটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চন্দ্রাণীর এবং অন্যান্য মানুষজনের কাছে অসঙ্গত ঠেকে তখন বামনের

আচরণ—

“শার্দুল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া।

বন ভ্রম আইসে যদি দুর্জয় বামন।

প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন।”

মন্তব্য

মিলনে অক্ষম বামনের এতো ভিখারীর অবস্থা! সচেতন মানুষ হিসেবে বামনের অজানা নয় যে, দেহই প্রেমের আধার। সেই দেহ যদি অতৃপ্ত থাকে তবে সেই অপরিতৃপ্ত কাম রহস্যময় করে তোলে প্রেমের প্রাসাদকে। দেহগত মিলনেই দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা জেনেও চন্দ্রাণীর সখীদের কথায় সংশয় সন্দেহের মধ্যেই চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্মতি জানায়। কারণ সুকৌশলে সেখীরা জগতের একটি সার সত্য বামনের সামনে উপস্থিত করেছে

“যৌবন কালেতে কনা বড় চিন্তা পায়।

অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সর্বাঙ্গে বেড়ায় ।

সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।

স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধি সুরতি।”

এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে বামনের এই সম্মতি প্রদান, তা একেবারে স্পষ্ট। পরবর্তী ক্ষেত্রে স্ত্রী চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন কালে

মনের শারীরিক অক্ষমতার অসহায় রূপ করুণ হয়ে ওঠে। চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে না চেয়ে বামন ‘পশু প্রায় নিদ্রা যায় এবং পরদিন---

“নিদ্রা হন্তে উঠি বীরে লৈল ধনুশার।

পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর।”

কবি চিত্রিত বামনের এই বীর পশু শিকার মূর্তির আসলে নারী সহবাসের অক্ষমতা জনিত ব্যর্থতা থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার উপায় মাত্র। আত্মধিক্কার এবং গ্লানির বোঝা নিয়ে এমন অবস্থায় কোন পুরুষেরই স্ত্রীর সামনে সহজ স্বাভাবিক হওয়ার উপায় নেই।

প্রেমের আলোকে শারীরিক অক্ষমতার এই অসহায় রূপ হয়তো বামনের পক্ষে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হোত। কিন্তু মনের মধ্যে এই সূক্ষ্ম প্রেমবোধেরও ভীষণ ততব। শারীরিক খর্বতাই তাকে বামন করেনি, মানসিক অসংস্কৃতিও তার এই নামকে অর্থবহ করে তুলেছে। সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং প্রেমের আ-লা বামনের মধ্যে না থাকায় চরিত্রটির মধ্যে একজাতীয় পশু-জনোচিত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্ত্রী চন্দ্রাণীকে বামনের এই আচরণও ভীষণভাবে পীড়িত করে—

মোহ বর্জি কিন্তু মুহুতে প্রতি

"পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।

মুখ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।"

বামনের একমুখী চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ভিন্নাত্মক মাত্রা— এই চরিত্রের সাহস ও বীরত্বে। স্ত্রী মিলনে সে অক্ষম, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়নকারী পুরুষের কাছে তার যাত্রা, ঐ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া পরিপূর্ণভাবে বীরত্বেরই প্রকাশ। বামনের বক্তব্যে যেমন, লোরের সঙ্গে যুদ্ধ ক্রিয়াতেও সেই এক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশিত |

"তেজময় তীক্ষ্ণ বাণে বামন লোরকে হানে

মর্ম ভেদি প্রবেশে হৃদয়।

বামনের তীক্ষ্ণ বাণে। লোররাজ মর্মস্থানে

রক্তে বহে চারু কলেবর।"

বামন চরিত্র দৌলত কাজীর বিস্ময়করণ সৃষ্টি। নারী মিলনে অক্ষমতা জনিত বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, তৎসহ বীরত্ব ও ঔদার্যের প্রকাশে বামন চরিত্রের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত।

৬.৬ অন্যান্য চরিত্র

দৌলত কাজীর 'সতীময়না'-আখ্যানকাব্য। নানান চরিত্রের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক না হলেও প্রত্যাশিত। তাই মূল, চারটি চরিত্র ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় চরিত্র এই কাব্যের বিন্যাস গতিতে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কবি প্রতিভার ছায়া সব চরিত্রের উপর প্রতিফলিত না হলেও, কয়েকটি চরিত্র আকর্ষণীয় এবং সার্থক হয়ে উঠেছে।

আখ্যানকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে মধ্যযুগীয় রোমান্স নির্ভর আখ্যানকাব্যের প্রেক্ষাপটে; রাজা ললারের সামনে উপস্থিত যোগীর চরিত্রটি সুন্দর এবং বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী। যোগী চরিত্রের বর্ণনায় কবি দৌলত কাজী ক্ল্যাসিক গাম্ভর্যের উপস্থাপনা ঘটিয়েছে—

'জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম বিভূতি ভূষণ।

কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন ।

জলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।

যোগাসনে দহিছে সকল অভ্যন্তর।।"

যোগী সন্ন্যাসী চরিত্রগুলি রহস্যময় আলৌকিকতায়; একধারে শ্রদ্ধাবোধ এবং অঘটন সংঘটনকারী চরিত্র হিসেবে প্রায়ই জনমানসে গৃহীত হয়। সতীময়না'-কাব্যের যোগীর মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র নির্ভর রহস্যময়তা দারুণভাবে জড়িয়ে আছে। এই জাতীয় রোমাঞ্চ কর পরিবেশের মধ্যে এই যোগীর আবির্ভাব ঘটে। ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্য সমৃদ্ধ এই যোগীর উদ্দেশ্যটি কিন্তু লঘুতরল। তবে রোমান্সধর্মী আখ্যানকাবে। এই রকম নানা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। যোগী তার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলে গাহরা রাজ্যের রাজা মোহরার অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী চন্দ্রাণীর স্বামী বীর বামন, কিন্তু সে নিপুংসক, মিলন কামনা প্রতিহত হওয়ার দুঃখে-অভিমানে চন্দ্রাণী স্বামী বর্জিত সখী পরিবৃত অন্য এক স্থানে বাস করে। সুন্দরী রমনীর এমন অবস্থায় কামনালুব্ধ অনেক পুরুষের স্বাভাবিক আর্বিভাব ঘটবে। কিন্তু চন্দ্রাণী

নিজেকে ভোগের রাজ্যে বিলিয়ে না দিয়ে সংযত জীবনই যাপন করে। আর 'বৎসরেত দুই বার যায় দেবস্থান।' এমন মুহুর্তেই একদিন যোগীর চন্দ্রাণী দর্শন। এই অবসরে যোগীর সমাধি এবং সমাধিদর্শন বর্ণিত। সূফী ধর্মের সহজিয়া সাধনাই এই বিষয়ে প্রতিফলিত। বর্ণনাটি অপূর্ব সুন্দর----

"নয়ন মুদিয়া পাতাল ভেদিয়া

দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।

স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কূর্ম থাকি

কূর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে।"

এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য যোগী চরিত্রের স্বভাবানুসারী হওয়ায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটা ভারসাম্যে অন্বিত হয়েছে। তবে যোগী চরিত্রে যতই তন্ত্রমন্ত্র তন্ত্রাচার দর্শন কাজ করুক না কেন, যোগীর আসল চরিত্র বৈশিষ্ট্য সংযোগ সাধনকারীর। এই বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রটিকে মানিয়েছেও বেশ ভাল। চন্দ্রাণীর রূপের বর্ণনায় সে যে পুরোপুরি সফল, তার প্রমাণ যোগীর এই অসাধারণ বর্ণনায় সূত্র ধরেই লোরের গোহারি দেশে যাত্রা। রাজা লোরের সামনে সে বলেছে--

"স্ত্রী মধ্যে চন্দ্ররাণী শচী কলাবতী।।

চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।

বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।"

যোগীর মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। তাসত্ত্বেও চরিত্রটি রোমান্স জগতের জন্য আমদানীকৃত প্রয়োজন সাধনকারী চরিত্র ।

বুদ্ধিশিখা

ধাত্রী বা ধাইদের সঙ্গে নবজাতক-জাতিকাদের একসময় প্রায় নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। পেশাগত নাড়ী ছেদন থেকে শুরু করে মাতৃ ও বন্ধু ভাবে শিশুদের লালন-পালনে বাইদের ছিল এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা। সতীময়না'-কাব্যে ধাই বুদ্ধি শিখা চরিত্রে দৌলত কাজী এছাড়াও বিশেষ কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন—

লোকপ্রিয়া সুতা জন চতুর সন্ধানী।

নির্জনে কুমারী সঙ্গে করি এক কেলি।

সময় গোয়ান্ত নানা কাব্য রস খেলি।"

মধুর বাক্যের সঙ্গে বুদ্ধির চাতুর্য্য, বন্ধুকৃত্যের সঙ্গে কাব্যরসাদির প্রতি অনুরাগ ধাই বুদ্ধি শিখা চরিত্রটিকে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়, এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এইসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মাতৃসম স্নেহ এবং বন্ধুর মত ব্যবহারে চন্দ্রাণীর মনোদুঃখ জানার কারণে সে বলতে পারে

"শিশু হতে তোকে মুই করিলু পালনা।

মাকে কেনে গুপ্ত মর্ম অন্তরে বেদনা।।

প্রথমে জার্মিলা যবে এই মহীতলে।

নাভি ছেদ তোমার করিলু কুতূহলে ।।

চন্দ্রাণীর কাছে শুধু ভালোবাসার দারি জানায়নি বুদ্ধি শিখা, আরো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার বক্তব্যে প্রকাশিত---

"সত্য কহ কাহাকে মজিল মন তোর।।

যদি হয় সিদ্ধা, বিদ্যাধর, সুরাসুর।

মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।"

অলৌকিক মন্ত্রশক্তির কথাই বলেছে ধাই বুদ্ধি শিখা। ধাই, বিন, ধোপানি, নাপিতানী প্রভৃতি শ্রেণির নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যযুগে। বহুল পরিমাণে এই সব অতিপ্রাকৃত পরাবিদ্যার চর্চা চালু ছিল। বুদ্ধি শিখার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত। রোমান্টিক রহস্যময়তার উপাদান বলা যেতে পারে এই মন্ত্রশক্তিকে। তবে মন্ত্রশক্তির অলৌকিকতায় নয়, বুদ্ধির চাতুর্য্যেই শেষপর্যন্ত বুদ্ধিশিখা রাজা লোরেরসঙ্গে চন্দ্রাণীর মিলন সংঘটিত করেছে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিশিখা চরিত্রটি যথার্থই উজ্জ্বল।

রত্নামালিনী

সতীময়না'-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রাণী ময়নার দুঃখ-বাধের মধ্যে ইতর চরিত্রের রতনা মালিনীর প্রবেশ। জাগতিক চাহিদায় আকণ্ঠ মালনিজ্জিত, এক তিল সুখের জন্য লালায়িত এই রমনীরা আদ্যন্তে স্থূল রুচির। প্রেমের কিংবা কাজের মধ্যস্থতার কারণেই প্রাচীনকালে

দূতি, কুট্টিনী অথবা মালিনীদের আবির্ভাব ঘটত। দৌলত কাজী মালিনীর এমন চরিত্রকে একেবারে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কন করেছে

"মালিনীর লাস ভেশ কি কহিমু সবিশেষ

কুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।

মধুবস স্থল তুণ্ড হৃদয় গরল কুণ্ড

কপট মন্ত্রণা দমনক।"

কামনাকাতর এক অসভ্য চরিত্র ছাতকুমারের দৌত্যের ভূমিকায় যে তার আবির্ভাব, ময়নার বিরহ দশার মধ্যেও তা সে জানাতে কুণ্ঠা ,বোধ করেনি। মালিনী ইতর, রুচিতায় স্থূল একথা যথার্থ, কিন্তু দেহবাদী এক বিশেষ দর্শন এই রমণীকে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দান করেছে—

"ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।

অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মায়।

চন্দ্র সূর্য অস্তংগতে পুনি উগি যায়।

যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়।

কৃপণের ধন যেন মূখের যৌবন।

কালের না খাইলে হয় শোকের ভাজন ।।"

ছলকলা এদের সহজাত, দেহবাদী দর্শনে এদের পুরোপুরি বিশ্বাস। মালিনী সম্পর্কে কবির উক্তি তাই

'বেশ্যা-গুরু কুটনী প্রধান।

সমগ্র বারমস্যা জুড়ে সতী ময়নাকে কামনার পাঁকে টেনে নামানোর যে আপ্রাণ চেষ্টা মালিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তাতে একের পর এক সুকৌশলী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার তার অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথমে সে ময়নার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছে, অনুকুল প্রকৃতিতে শরীরের উত্তেজনাকে প্রশমিত না করে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত— এমন ইঙ্গিত ময়নার মধ্যে মোহ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। আর এসব করতে গিয়ে ময়নার বক্তব্যে উঠে এসেছে, একমুখী কিন্তু অসাধারণ সমাজ জীবন দর্শন। সেগুলি প্রত্যেকটি যেন এক একটি মূল্যবান রত্ন---

"মোক্ষপদ কাম বর্গ ভুবন নিদান।

কামরসে মজিয়াছে পুরুষ প্রধান।

ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কাম কেলি।

রাধা সনে নিকুঞ্জ খেলায় বনমালী।"

এই দর্শন ছাড়াও প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা, নারী মনস্তত্ত সম্পর্কে গভীর চেতনা মালিনী চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মিত্রকণ্ঠ

রাজা লোরের সারথী মিত্রকণ্ঠের নামেই প্রমাণ, সে শুধু রাজার সারথী নয়, তার বন্ধুও বটে। চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে রোমান্টিক যাত্রায়ও সে সঙ্গী, আবার চন্দ্রাণীর সঙ্গে গোপন মিলনের সময়েও তার ভূমিকা বন্ধুর সাহায্যকারীর

"মিত্রকণ্ঠ-বচন শুনিয়া নৃপবর।।

ক্ষেপিল বরশি পুনি ছানির উপর।

ছানি ভেদ রহে বর্শি বলের প্রহারে।

সখীগণ বলে বর্শি খসাইতে নারে।"

রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে বন্ধুর যে ভূমিকা সেই একই অনুপ্রেরণায় মিত্রকণ্ঠ সারথী বামনের সঙ্গে রাজা -লারে যুদ্ধে সারথার সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার সর্পদংশনে তা চন্দ্রাণীর জন্য জীবনদায়ী বানৌষধি সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে মনে মনে

সংবন করেছে সমব্যথী উদার হৃদয়, বন্ধু না হলে তা কখনই সম্ভব হয় না—

"মিত্রকণ্ঠ সারথি ভাবে মনে মনে।

অবশ্য মরিব লোর কুমারী কারণে?

লোররাজ বিনু আমি ত্যজিব জীবন।

দৈববলে এক বিষে তিনের নিধন।।"

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে চন্দ্রাণীর পিতা সাধারণ পিতার মতই সন্তানের সুখে দুঃখে অনুভূতিপ্রবণ সমব্যথী। দৈবপুরুষ সম্পূর্ণ অর্থেই অলৌকিক জগতের অধিবাসী। মুনিবর

নারদ ও অঙ্গিরা চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। মুনি হয়েও সুন্দরের মোহ যেভাবে তাদের পীড়িত করেছে, তাতে কামনা জর্জর বাস্তব মানুষ বলেই মনে হয়েছে। রাজকন্যা সম্পর্কে অঙ্গিরার ভাবনায় সেই দৃষ্টির ছায়াপাত—

"রূপ দেখি কল্পয় অঙ্গিরা বনবাসী।

পত্ররস চর্বে যেন দরিদ্র উপাসী।"

রতনকুমার ইতর কামুক প্রকৃতির চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি। রাজপুত্র স্বর্ণষ্ঠীব একেবারেই আলৌকিকতা মাখা রোমান্স জগতের বাসী। গা দিয়ে সোনা ঝরে পড়া---বাস্তব জগত থেকে তাকে বহুদূরে নিয়ে গেছে। আলাওল পকথার আমজে মাখা সে উপকাহিনি বর্ণনা করেছেন, তার অন্তর্বর্তী চরিত্রগুলির মধ্যে সেই ভাবনারই ছায়াপাত। রাজা উপেন্দ্রদেব এবং রাণী রতনকলিকা ভাগ্য কদিক বিশেষ ভাবনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চরিত্র। রতনকলিকার আচরণে এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যে রোমান্টিক রহস্যময়তার পুরোপুরি ছায়াপাত। আনন্দধর্মের চরিত্রেও রক্ত-মাংসের বাস্তবতা নেই বললেই চলে, আচর-আচরণও রূপকথার রাজপুত্রের মত। মদনমঞ্জরীর চরিত্রের বিবর্তনেও রূপকথারই প্রভাব। তবে চকিত মুহূর্তে তার মধ্যে বাস্তবতার ইঙ্গিত জেগে উঠেছে। সদাগর কামুককস রাক্ষসের মতন। ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র প্রচণ্ডতপন, চন্দ্রপ্রভা প্রমুখ চরিত্রেরও তেমন কোন ভূমিকা এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য নেই।

৬.৭ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যে দৌলত কাজী ও আলাওলের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা বিচার কর।

২। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যে অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর ।

৩। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-কাব্যে মুখ্য নারী চরিত্র ময়নামতী ও চন্দ্রানী সম্পর্কে আলোচনা কর ।

৬.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী - সম্পাদনা ও মযহারুল ইসলাম, দুলাল চৌধুরী।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যর ইতিহাস (২য় খন্ড)- শ্রী সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খন্ড ও প্রথম পর্ব)- শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন -মঞ্জুলা বেরা ।

৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম - সুখময় মুখোপাধ্যায় ।

৬। রাজসভার সাহিত্য -দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক ৭- লোরচন্দ্রানী - রোমান্টিক ও মৌলিক কাব্য

বিন্যাস ক্রম

৭.১ কাব্য পরিচয়,

৭.২ কাব্যে নিঃসঙ্গতা

৭.৩ অনুবাদ হলেও মৌলিক

৭.৪ দরবারী সাহিত্য

৭.৫ লোরচন্দ্রানী কাব্যে উপন্যাসোচিত আধুনিকতার দিক

৭.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

৭.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৭.১ কাব্য পরিচয়

বাংলা ভাষায় রচিত দৌলত কাজীর ‘সতীময়না’ আদ্যন্ত রোমান্টিক কাব্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। রোমান্টিকতা বা রোমাঞ্চ মানুষের স্বভাব ধর্ম। স্রষ্টা হিসেবে মানুষের সেই স্বভাব ধর্মের ছায়াপাত ঘটে সাহিত্যে শিল্পে। দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও একঘেঁয়িতারাকাকির পুনরাবৃত্তির মধ্যে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে রোমান্সের গত আমদানি করতে চায়। কেননা ঐ জগত আশ্চর্য বর্ণরঙিন, ‘কল্পনার ইছ ধরাগের সমাবেশ' এই জগতেই মেলে। সীমার জগত হারিয়ে গিয়ে রোমান্টিক মনে চেনা জাগতের বাইরে অন্য এক অচেনা জগতের রহস্যময়তা জেগে ওঠে।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমান্টিকতার ধারণা জড়িত। রোমান শব্দের লাতিন নামে Romanum'-প্রসঙ্গে রোমান্স শব্দটির আমদানি! এই ভাবনাসূত্রে 'Novel ও Romance' সমশ্রেণিভুক্ত। পরবর্তীকালে Romanum, latinum, Novella প্রভৃতি নামের সূত্রে - রোমান্সের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে প্রেম। আরব, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে প্রেমের রহস্যময় অলৌকিকতার উপর ভিত্তি করে রোমান্সধর্মী সব কাহিনি গড়ে ওঠে। হাতেমতাই, গুলে বকাওলি, আরব্য রজনী এই ধারার রোমান্স। আবার রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানের মধ্যে পড়ে লায়লা মজনু, ইউসুফ-জুলেখা প্রভৃতি। দৌলত কাজী 'সতীময়না'-কাব্যে এই ধারারই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তবে বিদেশী প্রভাব নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অপূর্ব প্রেমচিত্র, বিদ্যাসুন্দরের রোমাঞ্চকর প্রেম রোমান্স দৌলত কাজীর কাব্যের রোমান্টিক প্রেম বীরাকে গড়ে দিতে সাহায্য করেছে। রোমান্টিকতার প্রধান উপাদান প্রেম। কিন্তু অপরাপর অনেক বিষয় - যুদ্ধ, দুঃসাহসিক অভিযান, বীরত্ব, বর্ণময় প্রকৃতি চিত্রণ, নিয়তির দুজ্ঞেয়তা, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তা - রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

'সতীময়না' পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে বিচ্ছিন্নভাবে রোমান্টিক আবহ গড়ে উঠলেও, পার্থিব প্রেমকে অবলম্বন করে রোমান্স ধর্মীতা উদাম হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য কাব্যে জাগতিক প্রেম নির্ভর রোমান্টিকতাই প্রধান সুর, বাইরের বিচ্ছিন্ন উপাদানও এই ভাবনার প্রতিবন্ধক নয়। রোমান্টিক কবি মানস সীমাহীন সৌন্দর্য চেতনা, অসীমের প্রতি একজাতীয় বিস্ময়বোধ, অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ কাতরতা, রহস্যময় ব্যঞ্জনধর্মীতার প্রতি ধাবিত হয়। অবাধ কল্পনার বিস্তারে প্রতিনিয়তই স্বাভাবিকতা ও সম্ভাবতার সীমা লঙ্ঘিত হয় বলেই রোমান্স ধর্মে লোককথা রূপকথার জগত প্রতিবিম্বিত হয়। পরিচয়ের মধ্যে পরিচয়ের একটা আবেশ ঘনিয়ে আসে। "সতীময়না' কাবের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যভঙ্গীতে লোককথার স্পষ্টতা প্রথমেই একটা রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তোলে। বাস্তবে রাজা রের রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চিত্রপট দর্শনে ব্যাকুল হয়ে সুন্দরী পরস্ত্রীর জন্য দুঃসাহসিক যাত্রায় সন্দেহাতীতভাবে রূপকথার রহস্য রোমাঞ্চজনিত রোমান্টিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর

শত বাধা-বিপত্তিকে জয় করে প্রেমসৌন্দর্যের প্রতীক চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন, রূপকথার জগতের সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে ভিনদেশী বীরপুরুষ রাজপুত্রের কথাই মনে করায় -

"দেয়ালের চারি পার্শ্বে ফিরে রাজ লোর।

চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রময় চকোর।

দ্বারে দ্বারে দ্বারী জাগে হাল্কারে হুঙ্কারে।

কার শক্তি তদ্বারেতে দ্বার করিবারে।

তবে তোর ভাবি চিন্তি দড়ির রশি।

খেপিলেন্ত কুমারীর মন্দির উদ্দেশি ॥"

পরিচিত জীবনের বাইরের রাজা লোরের অ্যাডভ্যাঞ্চার ধর্মের মধ্যে রোমান্সের রহস্যময়তা দানা বেঁধে উঠেছে।

গাছোমছমে পরিবেশ, ভীতি বিহ্বলতা অথচ পরকিয়া জনিত নিষিদ্ধ প্রেমের জগতের হাতছানি কাব্যের রোমান্টিক পরিবেশকে এমন আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। প্রেম সুন্দর, পরকীয়া প্রেম আরো সুন্দর। পরকীয়া প্রেমে থাকে বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল। এই বেড়াজাল ছিড়ে অভিসায় যাত্রায় থাকে নতুন জগতের হাতছানি। নবীনত্বের স্বাদে রোমান্টিকতার জগত পরিপূর্ণ বলেই মানুষকে, বিশেষ করে প্রেমিক মানুষকে তা এমন করে হাতছানি দেয়। সৌন্দর্য প্রতিমা ও রোমান্স একাকার হয়ে যায় বলেই স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে রোমান্সের জগত আমদানি করতে চায়। কেননা ঐ জগত আশ্চর্য বর্ণরঙিন, 'কল্পনার ইবন রাগের সমাবেশ এই জগতেই মেলে। সামার জগত হারিয়ে গিয়ে রোমান্টিক মনে চেনা জাগতের বাইরে অন্য এক অচেনা জগতের রহস্যময়তা জেগে ওঠে।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমান্টিকতার ধারণা জড়িত । রোমান শব্দের লাতিন নামে ‘Romanum-প্রসঙ্গে -রামান্স শটির আমদানি। এই ভাবনাসূত্রে ‘Novel ও Romance' সমশ্রেণিভুক্ত। পরবর্তীকালে Romanum, Latinum, Novella প্রভৃতি নামের সূত্রে রোমান্সের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে প্রেম। আরব, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে প্রেমের রহস্যময় অলৌকিকতার উপর ভিত্তি করে রোমান্সধর্মী সব কাহিনি গড়ে ওঠে। হাতেমতাই, গুলে বকাওলি, আরব্য রজনী এই ধারার রোমান্স। আবার রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানের মধ্যে পড়ে লায়লা মজনু, ইউসুফ-জুলেখা প্রভৃতি। দৌলত কাজী ‘সতীময়না’-কাব্যে এই ধারারই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তবে বিদেশী প্রভাব নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অপূর্ব প্রেমচিত্র, বিদ্যাসুন্দরের রোমাঞ্চকর প্রেম রোমান্স দৌলত কাজীর কাব্যের রোমান্টিক প্রেম বীরাকে গড়ে দিতে সাহায্য করেছে। রোমান্টিকতার প্রধান উপাদান প্রেম। কিন্তু অপরাপর অনেক বিষয় -- যুদ্ধ , দুঃসাহসিক অভিযান, বীরত্ব, বর্ণময় প্রকৃতি চিত্রণ, নিয়তির দুয়েত, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তা - রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

‘সতীময়না পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে বিচ্ছিন্নভাবে রোমান্টিক আবহ গড়ে উঠলেও, পার্থিব প্রেমকে অবলম্বন করে রোমান্স ধর্মীতা এন উদ্দাম হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য কাব্যে জাগতিক প্রেম নির্ভর রোমান্টিকতাই প্রধান সুর, বাইরের বিচ্ছিন্ন উপাদানও এই ভাবনার প্রতিবন্ধক নয়। রোমান্টিক কবি মানস সীমাহীন সৌন্দর্য চেতনা, অসীমের প্রতি একজাতীয় বিস্ময়বোধ, অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ কাতরতা, রহস্যময় ব্যঞ্জনধর্মীতার প্রতি ধাবিত হয়। অবাধ কল্পনার বিস্তারে প্রতিনিয়তই স্বাভাবিকতা ও সম্ভাবতার সীমা লঙ্ঘিত হয় বলেই রোমান্স ধর্মে লোককথা রূপকথার জগত প্রতিবিম্বিত হয়। পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের একটা আবেশ ঘনিয়ে আসে। সতীময়না’ কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যভঙ্গীতে লোককথার স্পষ্টতা প্রথমেই একটা রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তোলে। বাস্তবে রাজা ললারের রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চিত্রপট দর্শনে ব্যাকুল হয়ে সুন্দরী পরস্ত্রীর জন্য দুঃসাহসিক যাত্রায় সন্দেহাতীতভাবে রূপকথার রহস্য রোমাঞ্চ জনিত রোমাটিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শত বাধা-বিপত্তিকে জয় করে প্রেমসৌন্দর্যের প্রতীক চন্দ্রাণীর সঙ্গে

মিলন, রূপকথার জগতের সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে ভিনদেশী বীরপুরুষ রাজপুত্রের কথাই মনে করায় –

“দেয়ালের চারি পার্শ্বে ফিরে রাজ লোর।

চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রময় চকোর ।

দ্বারে দ্বারে দ্বারী জাগে হাল্কারে হুঙ্কারে।

কার শক্তি তদ্বারেতে দ্বার করিবারে

তবে লোর ভাবি চিন্তি দড়ির বরশি।

খেপিলেন্ত কুমারীর মন্দির উদ্দেশি।”

পরিচিত জীবনের বাইরের রাজা লোরের অ্যাডভ্যাঞ্চার ধর্মের মধ্যে রোমান্সের রহস্যময়তা দানা বেঁধে উঠেছে।

গাছোমছমে পরিবেশ, ভীতি বিহ্বলতা অথচ পরকিয়া জনিত নিষিদ্ধ প্রেমের জগতের হাতছানি কাব্যের রোমান্টিক পরিবেশকে এমন আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। প্রেম সুন্দর, পরকীয়া প্রেম আরো সুন্দর। পরকীয়া প্রেমে থাকে বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল। এই বেড়াজাল ছিড়ে অভিসার যাত্রায় থাকে নতুন জগতের হাতছানি। নবীনত্বের স্বাদে রোমান্টিকতার জগত পরিপূর্ণ বলেই মানুষকে, বিশেষ করে প্রেমিক মানুষকে তা এমন করে হাতছানি দেয়। সৌন্দর্য প্রতিমা ও রোমান্স একাকার হয়ে যায় বলেই স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে একধরনের বীরত্ব। এই বীরত্ব রোমান্টিক ধর্মের অপর এক বিশিষ্ট উপাদান। তবে শুধু বীরত্ব নয়, কেমন পরিবেশে এই বীরত্ব কল্পিত, সম্ভাব্যতার কথা ও যুক্তিপরম্পরা তাতে লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, সেটাও বিচার্য। দৌলত কাজীর রোমান্টিক কবিমানস এই জাতীয় বীরত্বের ছবি অঙ্কনে পুরোপুরি সফল। অপহৃতা চন্দ্রাণী সহ পলায়নপর ললারের সঙ্গে বামনের যুদ্ধ বর্ণনায় বীরত্বকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত –

"ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে লোর যেন অগ্নিসম শর

ব্যস্ত হৈল কুমার বামন ।

চোখা চোখা হানে শর জর্জরিত কলেবর

না পারে বামন সহিবারে।

শিথিল বামন মতি বুঝিয়া যে সে সারথি

তারি রাখে তরু আড়ে।"

প্রাচীন কালের Knights-দের রোমান্টিক প্রেমের বশবর্তী হয়ে সুন্দরী নারীর জন্য দুঃসাহসিক বীরত্বের কথাই মনে পড়ে। তাছাড়া শুধু যুদ্ধ নয়, সুন্দরী নারীর জন্য রাজা লোরের বীরত্বপূর্ণ অভিযান এবং অপহরণের মধ্যে রোমান্টিক যুগের বীরত্বের কথাই মনে হয়।

রোমান্স রস দৌলত কাজীর কবিমানসকে পুষ্টিবিধান করেছে। কাব্যখানির সূত্রপাতে, বর্ণনাভঙ্গীতে এবং অগ্রগতিতে সেই রোমান্স রস চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সতীময়না'-কাব্যে রোমান্স রস এবং অন্যান্য যাবতীয় রোমান্টিক ধর্মের প্রধান আশ্রয় বৈধর্ম দ্বারা পরিচালিত আবেগ জর্জর রোমান্টিক প্রেম কবি দৌলত কাজী এই রোমান্টিক প্রেমের বিচিত্র মূর্তি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তার ছেন। ময়নার মধ্যে সতীত্বের নিঃকম্পা শিখায় একলক্ষ্যমুখী প্রেম চিত্রিত। বাহ্যবিচারে গৃহাভিমুখী এই প্রেমের রোমান্টিকতার লক্ষণ নেই বলেই মনে হয়। সৌন্দর্য ও আবেগের পাখায় ভর করে পথাশ্রয়ী প্রেমই রোমান্টিক প্রেমের একমাত্র নিদর্শন নয়। প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়ে স্থির দেহেই আকাঙক্ষা মনে জাগিয়ে রাখে সে, প্রিয়তমের আগমন বার্তার জন্য সে- মানস অভিসার পুষ্ট সেই প্রেমও রোমান্টিক। তাছাড়া বিষাদ কাতরতা, মিলনোত্তর বিচ্ছেদ যন্ত্রনাও রোমান্টিক প্রেমের যথার্থ উপাদান। ময়নার চরিত্রে রোমান্টিক প্রেমের শ্রেণিগত এই লক্ষণকেই উজ্জ্বল করেছেন কবি–

"ফাগুনে কোন্ গুণ। রঙ্গিমা ফাগুন

কুঙ্কুম সৌরভ সিন্দুর।

খেলি, কেলি, মেলি, সকল গেল মেরি,

যদি গেল কান্ত সে দূর।"

চন্দ্রাণী চরিত্রকে ঘিরে রোমান্টিক প্রেম ধর্ম আবর্তিত। প্রেমের সৌন্দর্য প্রতিমা এই নারী। প্রেমের যে দুর্বার গতি রোমান্টিক ভাবনাকে সর্বাংশে উজ্জ্বল করে চন্দ্রাণী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুরাকাঙক্ষী, সববাধাজয়ী সেই প্রেমের ছবিই এঁকেছেন কবি। স্বামী থাকা সত্ত্বেও নিজের মনোগত পুরুষের জন্য দিবসযাপিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা, রোমাঞ্চ রহস্যময়তার মধ্যে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং পিতামাতা পরিজন সব ত্যাগ করে দুর্বার প্রেমশক্তির বশে লোরের সঙ্গে পলায়ন -- চন্দ্রাণী চরিত্রকে রোমান্টিক প্রেমের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করে। কুলছাড়া বাঁধনহারা অনিশ্চিত যাত্রায় পার্থিব প্রেম রোমান্স ধর্মে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চন্দ্রাণী চরিত্রের ভাবনা ও আচরণে এ কথাই প্রমাণিত। চন্দ্রাণীর রোমান্স যাত্রা রাজা লোরের বীরত্ব কর্মেরই অনুগামী –

"এ বলিয়া ক্ষেপে বর্শি ছানির উপরে।

বজ্র যেন ভেদি রহে কৈলাস শিখরে ।।

ভেদিয়া রহিল বর্শি উপরের ছানি।।

কুর বিক্রম দেখি আনন্দ চন্দ্রাণী।"

লোর চন্দ্রাণীর সম্পর্ককে ঘিরেও রোমান্স গড়ে ওঠে। গতানুগতিক ধ্যান ধারণার বাইরে, Strong sence of beauty-র অদম্য আকাঙক্ষায় লোর চন্দ্রাণীর সম্পর্ক গঠিত বলেই - তা এমন গতিশীল এবং রোমান্টিক।

কাহিনির অন্যানা অংশও রোমান্টিক ভাবধারাকেই বহন করে। যোগীর আগমনে, রাজার সঙ্গে মিলনে এবং লোর সহ মোহরা দেশে গমনের মধ্যে রোমান্টিকতার রেশ ফুটে উঠে। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজা ললারের যোগীবেশ ধারণ করে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলনে বুদ্ধিশিখা ধাইয়ের চাতুর্য্যে মালিনী চরিত্রের বক্তব্যে ও আচরণে, সর্বোপরি বিভিন্ন স্থানে অতিপ্রাকৃতের আমদানিতে রোমান্টিকতা প্রস্ফুটিত। রোমান্টিক প্রেমের মূল আখ্যানকে আরো বেশী বর্ণময় করে তুলেছে সমগ্র কাব্য জুড়ে কবির অসাধারণ রোমান্টিক প্রকৃতির চিত্রণে। লোর-চন্দ্রাণীর প্রসঙ্গেও যেমন, ময়নার চরিত্রে বিষাদ জড়িত প্রেম চিত্রণেও প্রকৃতির ভূমিকা অনবদ্য। মালিনীর বর্ণনায় -রামান্টিক প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতি চিত্রণ আশ্চর্য সুন্দর -

“বিচিত্র তারকা শশী শোভায় অম্বর।।

জলে কুমুদিনী শোভে কুসুম্বে ভ্রমর।

ধবল শরৎ ঋতু উজ্জ্বল যামিনী।

নারী-পুরুষের কথা শুনলো কামিনী ।”

রোমান্টিসিজম হ’ল স্বপ্ন ও কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে জগতকে দেখার বিশিষ্ট ভঙ্গী। রূপকথার জগত এই স্বপ্ন ও কল্পনার জগত। সতীময়নার যে অংশটুকু আলাওল রচিত, সেখানেও বিস্ময় ও রহস্যময়তার পথে রোমান্স রস পরিবেশিত। প্রেম স্বপ্নের জগতে সব কিছুই সম্ভব বলে, আলাওল যে শাখাকাহিনি সংযোজিত করেছেন তাতে রূপকথার বর্ণালেপনে রোমান্টিকতা পরিবেশিত। ভাগ্য লিপি বর্ণনা প্রসঙ্গে রতন কলিকার যে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ মাত্রা, কাব্যরসের কৌতুহল বাড়িয়ে তোলার অনুষঙ্গ হিসাবে রূপকথাকে ব্যবহার করেছেন সেখানে কবি -

“আর চারিভিতে দিলা ছোট ছোট দ্বার।

খেলিলে পবন বহে খণ্ডে অন্ধকার।

ছয় মাসের তৈল জল মাঞ্জাসে ভরিয়া।

আদেশিলা কন্যা প্রতি শীঘ্র উঠ গিয়া।”

আলাওল পণ্ডিত কবি, কিন্তু জীবন রসিক। এই জীবনরস রসিকতাই কবিকে রোমান্টিক পরিবেশ গঠনের অনুকুলে অবাস্তবরাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভাসমান সমুদ্র শিলার প্রসঙ্গ, রতনকলিকার গাছে ওঠার কথায় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। সর্বোপরি হস্তিকর্ণ নামে রাক্ষস এবং ভোমরার মধ্যে রাক্ষসের প্রাণের অস্তিত্ব – রূপকথার জগতের পরিপূর্ণ আস্বাদ। আধুনিক কালের পরিমার্জিত রোমান্স ভাবনা না পাওয়া গেলেও, ‘সতীময়না’-কাব্যে দৌলত কাজী ও আলাওল পার্থিব প্রেমের অবাধ চিত্রণে রোমান্স রসেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

৭.২ কাব্যে নিঃসঙ্গতা

নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন তখনই আসে যখন একজন মানুষ তার চারপাশের জীবনধারা ও জীবন দর্শন থেকে নিজেকে পৃথক করে ভাবে। যে জীবনকে সে দেখে আসছে যে জীবনভাবনা তার পারিপার্শ্বিকের মানুষজনের দ্বারা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে সে যখন নিজের মনোভাবনাকে মেলাতে পারে না তখন সে পারিপার্শ্বিকের লোকজনের সঙ্গকে পরিত্যাগ করে নিজ ভাবনার আলোতে এককভাবে চলার চেষ্টা করে। তখন পূর্ব জীবনদর্শনের পরম্পরা থেকে নিজের জীবনদর্শন নূতন এক বার্তা নিয়ে হাজির হয়। আর যাঁরা এই জীবনভাবনাকে কাব্য-উপন্যাসে প্রকাশ করতে পারেন তাদের ভাষায় ফুটে ওঠে সেই জীবনভাবনা। সাহিত্যের এই ভাষারূপে জীবনভাবনা প্রকাশে সাহিত্যিক যখন নিজেকে নিরপেক্ষ রূপে দেখান তখন মূলত কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়, আর যখন নিজেকে সেই ভাবনার অঙ্গী করে প্রকাশ করেন তখন তা কাব্যরূপ পায়। এই কাব্যের মধ্যে কবির একান্ত নিজস্ব একাকীত্ব প্রকাশ হল নিঃসঙ্গতার রূপ।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাস্তব দৃষ্ট জীবনভাবনা চর্যাপদে বাংলা ভাষারূপ পেয়েছে। তবে তা থেকে গেছে একটি বিশেষ ধর্মের সাধন-প্রক্রিয়ার ভাষারূপ হিসাবে। ফলে চর্যাপদে সেই বিশেষ ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, কোন ব্যক্তির জীবন ভাবনার পরিচয় নয়। তবুও স্থূলরূপে জীবনযাপনের যে ছিটেফোঁটা তত্ত্বের আড়ালে ধরা পড়ে সেখানে একক জীবনের ব্যথা বেদনা নেই। শুধু টুকরো একটি চিত্র—টিলায় এক শবর রমণী বসে রয়েছে। টিলায় বসে অর্থাৎ সে একা। নিজ পরিজনদের থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখা কিছুক্ষণ। নিজের অন্তরে ডুব দিয়ে নিজেকে চিনে নেওয়া।

এরপর সাহিত্য বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জীবনের চিত্রণ তা মধ্যযুগের প্রারম্ভে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ধরা পড়ে নি! ধর্ম ও জাতি রক্ষার কারণে সাহিত্যের ভাষা-রূপে সেই সময়ের জীবন চিত্রণ আঁকা সম্ভব হয় নি। ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতায় স্থিতাবস্থা আসতে শুরু করলে ভাষায় উঠে আসে দেশ তথা জাতির ঐতিহ্যের ইতিহাস। তাই সংস্কৃত ভাষায় লেখা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-এ প্রতিফলিত সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় তুলে এনে পরম্পরা বাহিত ঐতিহ্যকে সমসাময়িক ভাবনায় প্রকাশের চেষ্টা শুরু হল। ততদিনে বাংলাদেশের পরিমন্ডলে সংস্কৃতের খোলস ছেড়ে বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র রূপ পেয়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বাঙালিয়ানা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-এ সমসাময়িক বাঙালিয়ানা ছাপ ফেলে দিল। এই সাহিত্যগুলি তাই না হল অক্ষরিক অনুবাদ, না হল ভাবানুবাদ; তা হয়ে উঠল অনেকটা অনুকরণ সাহিত্য।

তাই কাহিনিতে কবিদের মৌলিকত্ব ধরা পড়ল। কিন্তু এই সাহিত্যগুলি পদ্যবন্ধে রচিত হলেও কাব্যের কল্পনাজাল বোনা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যবিন্যাস নয়, এগুলি আখ্যানধর্মী। আখ্যানে জীবন চিত্রণ ঘটনা ও চরিত্রের মেলবন্ধনে ধরা হয়।

আমরা এই সব কাব্যে নিঃসঙ্গতার জীবন চিত্রণকে যদি ধরতে চাই তা আধুনিক কাব্যের মতো করে দেখলে হবে না। আধুনিক কাব্যে রচয়িতার যে নিঃসঙ্গ জীবনবোধ ধরা পড়ে মধ্যযুগের কাব্যে সেরূপ ধরা পড়ে না। মধ্যযুগের কাব্য আখ্যানধর্মী; তাই এক্ষেত্রে আখ্যানের মধ্যে যে সব চরিত্র বিন্যস্ত সেই সব চরিত্রের নিঃসঙ্গ জীবনকে ধরতে হবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্য সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' মধ্যযুগের আখ্যানধর্মী রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাব্য। এই কাব্যের আখ্যান এমনভাবে বিন্যস্ত যেখানে চরিত্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতার দিকটি উঠে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে গভীর জীবনবোধ থাকবে না, যেহেতু ব্যক্তি মানুষ প্রাধান্য পায় নি। ব্যক্তিমানুষ প্রাধান্য পেলে চারপাশের মানুষজন থাকলেও মনের কাছে নিঃসঙ্গ হয়। এবং চাওয়া-পাও, আশা-আকাঙক্ষার সফলতা না পেয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। মধ্যযুগে ব্যক্তিমানুষ সমাজ বেষ্টনে থাকে। তাই লোরচন্দ্রানী কাব্যের চরিত্রগুলিও এরূপ সমাজ বেষ্টনীর মধ্যে থেকে কতখানি নিঃসঙ্গতার মধ্যে যেতে পেরেছে তা দেখে নেওয়া যাক্।।

লোরচন্দ্রানী কাব্যের চারটি প্রধান চরিত্র লোর, ময়না, বামন, চন্দ্রানী—প্রত্যেকেই কোন কোন সময়ে একাকী থেকে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে এবং জীবনের বিফলতাকে ব্যক্ত করেছে; তবে এদের মধ্যে বামন চরিত্রের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি দাগ কেটে যায়। একে একে চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। লোর যোগীর হাতে ধৃত পোতলীর রূপ দেখে এবং সেই পোতলীর জীবন কাহিনি শুনে রাজ্য ও পত্নী ময়নার কথা চিন্তা না করে গোহারী রাজ্যে রাজকুমারী চন্দ্রানীকে দেখা ও পাওয়ার আশায় হাজির হয়। ঘটনাচক্রে চন্দ্রানী গবাক্ষ পথে লোরকে দেখে অনুরক্ত হয়ে পড়ায় দ্বিতীয়বার নিমন্ত্রণে রাজপ্রাসাদে দর্পণে চন্দ্রানীর রূপ দেখে লোরের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। সেই রূপ ভাল করে দেখার জন্য ও সেই রূপবতী নারীকে পাওয়ার জন্য একাকী মনে মনে তীব্র আকুলতা প্রকাশ করে। একে ময়নাবতীকে ছেড়ে এসে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে চন্দ্রানীকে না পাওয়ার ব্যথা আরও একাকী ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছে

"শিবিরে আইলা লোর রূপ মদে মতি ভোর

নিশি দিশি নাহি পরিচয়।।

ভাবিয়া সে কলাবতী উনমত্ত নৃপমতি

অনুক্ষণ বিলাপি গোয়ায়।

কি দেখি ধিগদৃষ্ট নয়নে লাগিল মিষ্ট |

না দেখিল নয়ন ভরিয়া।"

এভাবে লোর পারিপার্শ্বিক বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে একাকী নিজ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণায় ব্যথিত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছে।

মানাবতী চরিত্রটি তো কাহিনির প্রায় প্রথম থেকে একাকিনী বিরহিণীর জীবন যাপন করেছে। লোরবিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে শুধুমাত্র একনিষ্ঠ প্রেমের জোরে ও ভারতীয় নারীর সতীত্ব ভাবনার বলে নিজেকে সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। একাকিনী ময়নার বিলাপ পাঠক হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

"স্বামীর বিচ্ছেদে রামা, ত্রাসিত হরিণী সমা।

নিশি দিশি বহে ঘন শ্বাস।

ত্যজিয়া ভূষণ হার, অঞ্জন চন্দন আর

উপভোগ সুখ পরিহাস!!"

এই নিঃসঙ্গ জীবনের কথা কাব্যের অনেকটা জুড়ে ব্যক্ত হয়েছে। তবে ময়না এরূপ নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ধৈর্য ধরে স্বামী ললারের জন্যই অপেক্ষারত থেকেছে। চন্দ্রানী চরিত্রটি এই কাব্যে অনেক বেশি জীবন ধর্মে ভরপুর। চন্দ্রানীকে নিয়েই কাহিনি বিচিত্র পথে

এগিয়েছে। চন্দ্রানী যৌবনপ্রাপ্ত হয়েও স্বামীসঙ্গ না পাওয়ায় সখী পরিবেষ্টিত হয়েও একাকী মনোকষ্টে ভুগেছে।

"স্বামী বিনে বিষন্ন সে কামের কামিনী।

চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন তাপিত রোহিণী।।"

বিরহিণী চন্দ্রানী স্বামীর আশায় বেদনাহত চিত্তে বসে থাকে; আর 'মন বেদনা চিত্তে আঁখি ঝরে নীর। এই নিঃসঙ্গতা বড়ই দুঃখকর। কিন্তু এর চেয়ে বড় বেশি একা ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে যখন স্বামী বামন রতির ক্রীড়ায় অপারগ জানতে পেরেছে। এই নিঃসঙ্গতায় জীবন যাপন করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে। তবুও এরূপ স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটানোর চেয়ে একা স্বামী-বিহীন থাকা অনেক ভাল মনে করে আলাদা মহলে নিজেকে স্থাপন করেছে। তবে যৌবনধর্ম তো জীবনকে অন্য পাঠ শেখায়। দেখা যায়, চন্দ্রানীর এককনিঃসঙ্গ জীবনে লোররাজের ছায়া পড়েছে। অথচ বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষকে ভালোলাগার কথা বলা যায় না। তাই চন্দ্রানী আবারও নিজ দুঃখ বেদনে নিমজ্জিত থেকে এবং সখীকুল ও অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে নিজের মনোগহনে ডুব দিয়েছে।

"মলিন চিকুর সব মলিন অম্বর।

দিবস-চন্দ্রমা যেন বদন ধূসর।।"

এই নিঃসঙ্গ জীবনে ধাই বুদ্ধিশিখার সাহায্যে নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে এবং লোরকে পেয়ে জীবন সফল হয়েছে। ফলে চন্দ্রানী চরিত্রটি বারে বারে একাকীত্বে ভুগলেও শেষ পর্যন্ত জীবন ধর্মকে জয়ী করতে পেরেছে এবং নিঃসঙ্গতাকে কাটাতে পেরেছে। 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ও ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে বামন চরিত্রটি। বামন রাজার পুত্র এবং রাজ জামাতা। চন্দ্রানী যৌবন প্রাপ্ত হলেও স্বামী বামন তার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। সখীদের কাম-কলা-শাস্ত্র ও রতি পাঠ শ্রবণ করে বামন চন্দ্রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে গেলেও 'ভূত প্রায় খাট হেঁটে করিল শয়ন এবং পশু প্রায় নিদ্রা যায়। স্বামীর এরূপ ব্যবহারে চন্দ্রানী নিজে নিজে বিলাপ করতে থাকে এবং নিজ কর্মফলকে দোষা-রোপ করে। এদিকে

"নিদ্রা হন্তে উঠি বীরে লৈল ধনুশর।

পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর।।"

বামনের এরূপ ব্যবহারে প্রাতে চন্দ্রানী ক্রন্দন করলে মাতা রাজমহিষী তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে ধাই বুদ্ধিশিখাকে বামনের শঠতার কারণ জানতে পাঠান। লক্ষণীয়, রাজমাতা বামনকে যত ভাবে গঞ্জনা করেছেন ধাই তা শতগুণ করে শুনিয়েছে।

"কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ।

লবণ উদকে নহে কুমুদ বিকাশ।।

তুমি কেনে ভার্যা তেজ অবোধের প্রায়।

অক্ষয় অমৃত নিধি ঠেল দুই পায়।

পশু হন্তে অধিক হও তুমি মূঢ় মতি।

ধন্য পশুজাতি সেহ না ছাড়ে দম্পতি।।

কোথা তোর ধর্ম কর্ম কোথা সুচরিত।

নপুংসক আকৃতি তুমি রমণী বর্জিত।।"

যে বামন ধাই বুদ্ধিশিখাকে দেখে সম্ভ্রমে শির নত করেছিল সেই বামন ধাত্রীমুখে রাজমহিষীর এরূপ গঞ্জনার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শোনায় যে কিনা নিজ বাহুবলে পৃথিবী জয় করতে পারে তাকে একজন স্ত্রী-লোক এতসব নিন্দা করে! কিন্তু তখনও সে জানে না। যে জীবনে সে কী অভাব নিয়ে জন্মেছে। তাই পর মুহূর্তে রাজমহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করে আবার স্ত্রী চন্দ্রানীর সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এবার সে অনুভব করতে পেরেছে যে সে জীবনের সমস্ত রতি-সুখ-বিলাস থেকে বঞ্চিত। সে যতই বহু বলশালী, অর্থ-সম্পদ-রাজত্বের অধিকারি হোক না কেন, রতি-বিলাসের অক্ষমতা তাকে সবার চোখে হীন করে তুলেছে। এবার রতি-সুখ বঞ্চিত স্ত্রী চন্দ্রানী অক্ষম স্বামীকে নানান কটুক্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে—"শুকের সহিত ক্রিয়া না করয় বকে', 'পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ, মূর্খ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল' ইত্যাদি। আর স্ত্রীর কাছে জীবন-সুখে পরাজিত হয়ে ভুবন বিজয়ী' বামন প্রভাত শেষে বনে মৃগয়া করতে গমন করেছে। লজ্জিত-লাঞ্ছিত বামন। স্ত্রীর থেকে, অন্য সকলের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকতে চেয়েছে। যে যুবকটি বৃদ্ধ শ্বশুরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে শাসন করে, যার সমান বীর আর নেই, অন্য সমস্ত গুণে যে গুণান্বিত সে জীবন ধর্মের বিশেষ গুণে পরাজিত হয়ে একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। সবার থেকে সরে গিয়ে বনে পশু শিকারে নিজেকে নিয়োজিত করে এক ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বামনের এই একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া ভিন্নতর বিষাদের সুর বাজিয়ে দিয়েছে। একটি নপুংসক চরিত্র তার অন্যান্য সমস্ত গুণের কারণে পাঠকের সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছে।

কবি দৌলত কাজী এই নিঃসঙ্গ জীবনকে নিজ বোধের মধ্যে নিতে পেরেছেন তা চরিত্র নির্মাণে প্রমাণ মিলছে। কিন্তু বর্ণনায় গীতি মূর্ছনা থাকলেও মধ্যযুগ গীতিকবিতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কবির লেখনীতে যদি নিজ নিঃসঙ্গ জীবনবোধ প্রকাশের মধ্যে সার্বজনীনতা অর্থাৎ সেই জীবনবোধ পাঠক সকল নিজ বোধের সঙ্গে একাত্ম করতে পারতেন তাহলে আধুনিক গীতিকবিতা পেতাম যেখানে নিঃসঙ্গতা প্রকাশের সুযোগ থাকত। মধ্যযুগের কবি—এই সামাজিক মানুষটি—মধ্যযুগে সমাজে ব্যক্তিমানুষ পৃথকভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় নিজবোধকে অন্যের বোধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাই আধুনিক কাব্যের কবির নিঃসঙ্গ জীবনবোধ সে যুগে ঘটনা জালে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৭.৩ অনুবাদ হলেও মৌলিক

দৌলত কাজীর 'সতীময়না'-কাব্যের বিষয় যে মৌলিক নয়, কবি নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছে আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার সমর সচিব অমাত্য মহামতি শ্রী আশরাফ খানের নির্দেশে হিন্দী কবি মিয়া সাধনের 'মৈনাস'কাব্য অবলম্বনে তার অনুবাদধর্মী কাব্যরচনার প্রয়াস -

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।

না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।

দেশীভাষে কহতাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।

সকলে শুনিয়া যেন বুঝায় সানন্দে।।"

লিখিত অর্থাৎ পঠনগত প্রভাব বলতে এটুকুই। তাছাড়া সাধনের 'মৈনাসৎ' একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কাব্য। এই কাব্যের বিষয় বিহার তাঞ্চলে প্রচলিত লোরক মল্ল-চন্দ্রাণীর রোমান্টিক প্রেম নির্ভর লোকগাথা । সতীময়না' কাব্যের বিষয়ও এই লোর-চন্দ্রণীর লোকপ্রচলিত রোমান্টিক প্রেম। তাছাড়া সাধনের গ্রন্থটি ছাড়াও লোর-চন্দ্রাণীর প্রেম উপাখ্যান লোকসাহিত্যের ধর্ম অনুযায়ী একটু পরিবর্তন সহ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। এই ভাবনা অমূলক বা অনুমানসাপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়। লোর-চন্দ্রাণীর রোমান্টিক প্রেম আখ্যানের প্রায় একই গল্প বিভিন্ন লোকমাধ্যমের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

'লোরিক নাচ'-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে চতুর্দশ শতাব্দীতে। লোকসঙ্গীতে এই গল্প বিহারের আভীর সমাজে জনপ্রিয় ছিল। একইভাবে রোমান্টিক প্রেম আখ্যান নানা চিত্রে পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া অল্প কিছু আগে মুল্লা বা মৌলানা দাউদ রচিত 'চন্দায়ন' - নামে কাব্যের

অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই কাব্যেরও বিষয় লোর-চন্দ্রাণীর রোমান্টিক প্রেম। সাধনের কাব্যের অনুবাদ ক্রমে তিনি 'সতীময়না' কাব্য বাংলা ভাষায় পাঁচালি ছন্দে রচনা করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু লোকপ্রচলিত জনপ্রিয় এই উপাখ্যানগুলির সঙ্গে কবির কোনরকম পরিচিতি ছিল না একথা বিশ্বাস করা যায় না। সতীময়না-র বিশেষ কাব্যপরিকল্পনায় 'মৈনাস' - সাহায্য করে থাকবে; কিন্তু বাতাসের মত ভেসে থাকা শ্রুতিনির্ভর কাহিনির অংশ উপাদান হিসেবে কবি দৌলত কাজীকে উদ্দীপ্ত করবে না, এটা কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই সমস্ত কাহিনিগুলির গল্পে এবং চরিত্রে নামকরণে পরিবর্তন আছে। কোন কাহিনিতে লোরকে পশুচারণা করতে হয়েছে, কোথাও চন্দ্রাণীকে নিয়ে পালাবার সময় বামনের ত্রাসে লোরকে স্থানীয় রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। কোন কাহিনিতে চামারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। নামকরণেও অঞ্চল ভিত্তিক সামান্য রদবদল আছে। যেমন – পোর না নুর, চন্দ্রাণী বাচন বা চলৈণী, ময়না বা মৈনা বা মঞ্জরী জাতীয় আঞ্চলিক উচ্চারণধর্মী পরিবর্তন। কাহিনি অর্থাৎ গল্প কথনেও লোককথার স্বভাবধর্মানুযায়ী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

দৌলত কাজী প্রতিভাধর কবি ও শিল্পী। তাছাড়া তার অজানা ছিল না যে, রাজসভার মানুষদের সামনে একেবারে রূপকথার জগত আমদানি করতে পারবেন না এবং তা করাও যথার্থ হবে না। কবি হিসেবে দৌলত কাজী তাই প্রথমেই মনস্থ করেছিলেন স্বল্প পরিসরের অতৃপ্তি যেন পাঠক সাধারণের মনে না থাকে। মধ্যযুগের কাব্য পরিকল্পনা অনুযায়ী তাতে যেন নানা স্বাদের বৈচিত্র থাকে। অনুবাদের প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ত থেকেও তাতে যেন ব্যক্তি প্রতিভার ছায়াবিস্তার ঘটে। সতীময়না'-কাব্যে তাই মূলের প্রতি অনুসৃতি এবং মৌলিক বিন্যাসের স্বাতন্ত্র এবং উভয়ের একটা শিল্প কুশল সমন্বয় গড়ে উঠেছে। সাধনের কাব্যের স্তবকের সরাসরি অনুসরণ দৌলত কাজী উপেক্ষা করেননি। সেই পরিচয়ও স্বল্প নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগী হলেই ধারণা পরিষ্কার হবে। যেমন -

মৈনাসৎ **লোর চন্দ্রাণী**

১) "এক এক করত জীব দেউ	এক এক করি মুই দিনু নিজ
জগ দোসরকানাব না লেউ ।।	জগতে দোসর নাম না লইমু আন ।।
ফাটাহি তাসু নারিকো হিয়া।	ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ।
এক ছাড়ি জেহি দোসর কিয়া।"	এক ছাড়ি ভাবয় সে দোসরক গুণ।
২) "মৈনাঁ বাত্ আচ্‌কে জানি।	কুটনী-বচন শুনি ঠাই হেন সত্য জানি
কটনী কো বোলেই গিইয়ানী।	নাপিত বোলাই ততক্ষণে।
তবহিনা বেণু বোলায়ী।	সুগন্ধি কুসুম্ব রঙ্গে মার্জন করাইল অঙ্গে
কুমকুম মরদন্ কী নহওয়ারী ।"।	স্নান করাইলা সখীগণে ‖
৩) "যে ঘর কান্ত তি করে বিরাশে	যার ঘরে নিজ পতি করয় বিলাস।
সেই ন ছাঢ় না পীয়া কো পাস।।"	কামাফুলী কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ।
৪) "মানহি পরব ছতিসা জাতি	আরে ময়ন পরব দেওয়ালি রতি মায়া অতি।
ঔপয় ভাইস আংগ কোবাতি।	খেলে মঙ্গল ছত্রিশ জাতি পাতি!
হোয়ি কাতিক পরব দেওয়ারি।	কি মোর কার্তিক মাসে পরব দেওয়ালি রসে।
মোহি লেকে সংসার উজারি।"	কিংবা সুখ বিচিত্র আকাশে।

অনুবাদে অনুসরণ মূলানুগত্যই প্রমাণ করে। কিন্তু এই স্তবক বন্ধগুলির অনুবাদও আক্ষরিক অনুবাদ নয়। চরণে হেরফের ঘটিয়ে কবি মৌলিকতার আভাস গড়ে তুলেছেন। সেই কারণেই বলা যায় 'সতীময়না' কাব্যে কবি সাধনের 'মৈনাস'-কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তাছাড়া একজন শিল্পসচেতন কবির পক্ষে একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়। ভাবানুবাদই এই সব মৌলিক প্রতিভাধর কবির যথার্থ পথ।

মৌলিকতা প্রসঙ্গেই দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভা সার্থক। শিশুর কৌতূহল ও রূপকথার রহস্যে ঘেরা যে কাহিনি গ্রামীণ লোকের বিশেষত, অমার্জিত রুচি গ্রামীণ লোকের স্কুল খোরাকের বিষয় ছিল -- সেই কাহিনিকেই দৌলত কাজী অসাধারণ কাব্য সুষমা দান করেছেন। কবি রাজা লোরের পশুচারণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্যপ্রিয় খামখেয়ালি রাজায় পরিণত করেছেন। এই জাতীয় সূত্রপাতেই কাহিনির মধ্যে নাটকীয়তা এবং উপন্যাসধর্মী গল্প বয়নের আভাষ জাগিয়ে তুলেছেন কবি। তাছাড়া একটি রোমান্টিক প্রেম নির্ভর বিষয়কে সরলরৈখিক পথে পরিচালিত করলে কবি নিজের শিল্প কুশলতার প্রতিই অন্যায় করতেন। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে আখ্যানকাব্যে গতিশীলতা আনয়নের জন্য কবিরা নানারকম প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। দৌলত কাজী সেইভাবেই কাহিনিতে উপকরণগত চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে একাধারে আয়তন এবং গতিশীলতা বজায় রেখেছে। যে সময়ে রাজা লোরের সামনে সুন্দরী নারীর চিত্রপট সহযোগীর আবির্ভাব ঘটেছে, তা কবির স্বাতন্ত্র নয়, গল্প বয়নের মুন্সীয়ানারই পরিচয় বহন করে। পত্নী থাকা সত্ত্বেও লোর বনবাসে নারীসঙ্গ বর্জিত জীবনয়াবন করছিলেন। এই মানসিক অবস্থাতেই একমাত্র সৌন্দর্য প্রতিমা নারীদের জন্য রোমান্টিক যাত্রা সম্ভব। এই মৌলিকতায় কবির অভিনবত্বই প্রমাণিত। পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ চন্দ্রাণীর সঙ্গে রাজা লোরের সাক্ষাৎকার প্রথমে দর্পণের প্রতিবিম্বে, পরে যোগীর ছদ্মবেশে। এই পরিকল্পনা শুধু মৌলিক নয়, অভিনব। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় থেকে কাব্যরীতি আহরণ করে দৌলত কাজী একটা সুচারু কাব্যবিন্যাস রীতি গড়ে তুলেছেন। গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতায় লোকগাথা নির্ভর একটি উপাখ্যানকে প্রকৃত কাব্যকথায় পরিণত করেছেন। একটি সার্থক উপন্যাসের মত অদৃশ্য সংযোগে আখ্যানকাব্যের কাহিনিকে গড়ে তুলেছেন।

অনুবাদ বিষয়ের কাছে দায়বদ্ধ কবির এই স্বতন্ত্র কবিমানসটাই মৌলিকতা। বিশেষ করে বলতেই হয়, হিন্দু ভাষী বিহার অঞ্চলের সংস্কৃতিপুষ্ট কাহিনিকে বাংলাদেশ তথা আরাকানের প্রকৃতি ও পরিবেশের -যাগ্য করে তুলেছেন কবি। রাজা লোরের সংসার এবং চন্দ্রাণীর পিত্রালয়ের গার্হস্থ্য চিত্র বাংলাদেশের পরিবারের কথাই মনে করায়। একইভাবে

সাধনের কাব্যে মৈনার সঙ্গে মালিনীর প্রথম আলাপ প্রসঙ্গে পাঁপড় ভাজা ও উত্তর ভারতের শাড়ির বর্ণনা রয়েছে। বাংলাদেশের ষোড়শসপ্তদশ শতকের জীবন চর্যায় এ দুটি উপকরণ অনুপস্থিত ছিল বলেই দৌলত যথেষ্ট ঔচিত্য বোধের সঙ্গে এই বর্ণনা বর্জন করেছেন (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, সম্পাদনাঃ ডঃ মযহারুল ইসলাম ও ড. দুলাল চৌধুরী)। বর্জন করেছেন সাধনের বর্ষা ঋতুর প্রসঙ্গ। সাধন উত্তরভারতের 'বর্ষা উৎসব' বা 'বর্ষামঙ্গল গান'-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন

"সাওন মৈনা আয়ী অসান।

ঘর ঘর সংখী হিনদোলা তানা।

ঘর ঘর সংঘী হিনদোলা তানা।।

কান্ত সোহাগিন ঝুলা বারা।

গাওয়ে গীত উঠে ঝংকারা।।"

পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশে, এই উৎসব তেমন জনপ্রিয় নয়। দৌলত কাজীর অভিনবত্ব 'দোলনা' ও 'সঙ্গীতের' উল্লেখে ঝুলন বর্ণনাকে

জীবন্ত করেছেন -

"আনন্দের হিল্লোলে দম্পতি সব দোলে।।

কান্তহীন বিরহিনী কান্ত নাহি কোলে।"

কাব্য বিন্যাসের আরো অনেক অংশে দৌলত কাজী তার মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ বর্ণনাতে যেমন, মনসামঙ্গলের প্রভাব অনুসারী চন্দ্রাণীর সর্পদংশের প্রসঙ্গটিও তেমনি অভিনব। সতীময়না'-কাব্যে, বুদ্ধি শিখা ধাইয়ের নাম এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনায় একেবারে উজ্জ্বল।

৭.৪ দরবারী সাহিত্য

সতীময়না' কাব্যটি দৌলত কাজীর মৌলিক সৃষ্টি নয়। মিয়া সাধনের ঠেট গোহরী ভাষায় রচিত লোককথা নির্ভর কাব্য 'মৈনাস'-অবলম্বনে কবি 'সতীময়না'-কাব্যটির পরিকল্পনা করেন। তাছাড়া এই কাব্যপরিকল্পনায় কবির নিজের প্রেরণা নয়, আরকান রাজ শ্রীসুধর্মার সমর সচিব মহামতি অমাত্যের নির্দেশই কাব্যটির উৎসস্থল। স্বভাবতই দৌলত কাজীর কাব্যটির অন্তর্বর্তী ব্যক্তিভাবনার যে প্রকাশই থাকুক না কেন; একটি বিশেষ প্রভাব কাব্যটির উপর সূত্রপাতেই প্রভাববিস্তারকারী। রাজসভার প্রভাবই হল সেই বিশেষ প্রভাব। অর্থাৎ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, আদেশে, সর্বোপরি বিশেষ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপুষ্ট সভাসদদের কথা স্মরণে রেখে যে প্রভাবানুসারী সাহিত্য গড়ে ওঠে, সাহিত্য বিচারে তাকেই দরবারী সাহিত্য বলে। এই শ্রেণির সাহিত্যের পাঠক একশ্রেণির পাঠক। তাসত্ত্বেও যে রাজারা কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাদের শিল্পরুচি, রসবোধ, পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কবিদের সামনে সাহিত্য চর্চার দুয়ার খুলে দিত। রাজাদের এই ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার।

পৃষ্ঠ-পাষকের ভূমিকা নিয়ে এককালে রাজারাজড়ারা যদি এগিয়ে না আসতেন, তাহলে নানা কারণে অনেক প্রতিভাধর কবির অনেক অসাধারণ সৃষ্টি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের দিকে তাকালেই দেখা যাবে একটা বৃহৎ অংশের সাহিত্য দরবারী সাহিত্য। যে গ্রন্থগুলি শুধু যুগলক্ষণকেই আহরণ করে না, বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে যাওয়ার ধর্মও সন্নিবেশিত করে। রাজদরবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই কবিদের কাব্য তাদের স্রষ্টাদের অস্তিত্বকে কিন্তু কলঙ্কিত না করে, প্রকৃত সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকাকেই প্রকাশিত করেছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা, জয়দেব, ধোয়ী পবনদূত সমৃদ্ধ সেন রাজসভা, পাল রাজসভার কবি অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দ। যেমন স্বয়ং কবিপরিচয়ে বিখ্যাত, একইভাবে মিথিলা রাজদরবারের কবি বিদ্যাপতি, নদীয়া-কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভাকে অস্বীকারের উপায় নেই। তবে রুচিশীল

সূক্ষ্ম ও মার্জিত রসের যে অমর কাব্যধারা, পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে এক অলৌকিক শান্তির প্রবাহ বয়ে নিয়ে আসে- দরবারী সাহিত্যের প্রভাবধর্মী সচেতন শিল্পকলা সেই ধারা থেকে অনেক দূরের বিষয়। পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্য, শব্দের চাকচিক্য, রুচির বিকৃতি, আদিরসের অবাধ অনাবৃত প্রকাশ-- রাজদরবারের পাণ্ডিত্য ও শৃঙ্গার রসের চরিত্র বৈষ্টিকেই উজ্জ্বল করে তোলে। এই ধর্মের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের তিক্তরূপ, হাসির তরঙ্গ, কবিধর্মের আনুগত্য প্রকাশক মানসিকতা। অজস্র ঝাড়বাতির আলোক জ্বলে ওঠে দরবারী সাহিত্য, রাজসভার তো বটেই সমকালীন জনরুচির এক বিশেষ অংশের প্রভাবও অস্বীকৃত হয় না।

দৌলত কাজী ও আলাওল এই ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় সার্থক কবি। রাজদরবারে আশ্রয়প্রাপ্তি, পৃষ্ঠপোষক রাজাদের প্রতি অবাধ প্রশস্তি, রভস লীলার সীমাহীন বিস্তার -- দৌলত কাজী ও আলাওলকে রাজসভার কবি হিসেবে যোগ্য স্বীকৃতি দান করেছে। 'সতীময়না' কাব্যে দরবারী ঢঙে রাজপ্রশস্তি ও ভণিতা রচনা করে দৌলত কাজী ও আলাওল, দরবারী সাহিত্যের ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। কাম এবং আদিরসের অবাধ উল্লাস এই শ্রেণির কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রেমচেতনার আধারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় কবিরা আসলে দেহকেন্দ্রিক কামকলার নগ্নরূপ উদঘাটিত করতে চেয়েছেন। দৌলত কাজী চন্দ্রাণীর রূপ বর্ণনায় যৌনতাই ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। শুধু চন্দ্রাণী কেন ময়নার সৌন্দর্য চিত্রণেও এই আদিরসের সীমাহীন প্রাবল্য--

"মন্মথ-মথিত যে সম্পূর্ণ শ্রীফল।

নিবিড় নির্মল কুচ মুকুল কোমল ।।

নাভি কুণ্ড নহে রতি ক্রিয়ার সর্বস্ব।

মদনের বিভা হেতু মঙ্গল কলস।"

পৃষ্ঠপোষক রাজারা পণ্ডিত ও শিল্পরসিক ছিলেন সত্য; কিন্তু তারাও কবিদের আদিরসের বর্ণনাকে সমর্থন করতেন। তার ওপরে ছিল সভাসদদের প্রবল প্রভাব। প্রেমধর্মী বিষয়কেও কবিরা কামনার ফেনিল উচ্ছাসে একেবারে বর্ণময় করে তুলতেন। সতীময়না'-কাব্যে দৌলত কাজীর বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত রুচির প্রকাশ পাওয়া গেলেও সমগ্র কাব্যটি দরবারী সাহিত্যের উপাদানে ঠাসা। তাই লোর-চন্দ্রাণীর মিলনেও দেহবর্ণনার একেবারে অনাবৃত রূপ-

“প্রথমে মদন কোল ঘন আলিঙ্গন।

কাম-যুদ্ধে ভয় লজ্জা ধর্ম পলায়ন

দন্তে দন্তে ঘরষণ বদনে বদন

পুলকে পুরয় তনু সঘন চুম্বন।

পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।

রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।”

অশ্লীলতার প্রবল ঘূর্ণাবর্তে শ্লীলতার সীমা সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। স্রষ্টারা নিজের আনন্দেই সৃষ্টি করেন। কিন্তু যেখানে একটা ভুল। বিকৃতি রুচির আরোপ কবির সৃষ্টিধর্মে প্রভাব বিস্তার করে, তখন বাধ্য হয়ে কবিও শিল্প সংযমের সীমারেখা অতিক্রম করে যান। কবির পক্ষে পুরুষের এই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে উপেক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। কারণ নারী অধিকাংশটাই ছিল তখন ভোগের সামগ্রী। অবসরের মুহূর্তে সুরা সহযোগে কাব্যচর্চার রুচি ও সূক্ষ্মতা কোনভাবেই গৃহীত হত না– রাজদরার আদিরসের বর্ণনা চাই৩ কবিদের কাছে। দৌলত কাজী ও আলাওন সেই ধারাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে ‘সতীময়না’-কাব্যে।

দরবারী সাহিত্য মানেই আদিরস আর দেহ কামনার ফেনিল উচ্ছাস নয়। শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য কামনার অনাবৃত রূপকে কখনো সংযমে, কখনো স্বাভাবানুসারে প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিত্তি রূপে কাজ করে। সতীময়না'-কাব্যে দৌলত কাজীর পাণ্ডিত্য পুরোপুরি প্রতিফলিত। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবি অনায়াস দক্ষতায় কাব্যবোধের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছিলেন। আলঙ্কারিকদের বর্ণিত কাব্য নির্মাণ রীতি দৌলত কাজীর অজানা ছিল না। তাই আরবী, ফারসী, আরাকানী, সংস্কৃত, চট্টগ্রামী প্রভৃতি শব্দকে অকাতরে আমন্ত্রণ। জানিয়েছিলেন রাজসভার বিচিত্র সভাসদদের মত। শব্দই যে কবির ভাবকে ধারণ করে এই বিষয়টি কবি জানতেন বলেই 'ময়নার ভারতী'-কে 'রসের পাঁচালী-করতে এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। দার্শনিক যে বক্তব্যগুলি কবির কাব্যে প্রাজ্ঞ উক্তির মত ঝলমল করছে- সেগুলির গঠনে পাণ্ডিত্যের সাথে দরবারী রুচি জনিত অভিজ্ঞতা মিশে গেছে। যেমন –

"যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।

তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎসনা।।"

আলোচকেরা বলেন, রাজসভা বুদ্ধি মানের মিলন কেন্দ্র, হৃদয়হীনদের ক্রীড়াকেন্দ্র। এখানে হৃদয়ের কারবার অপেক্ষা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের চাকচিক্যটাই প্রধান। তাই দৌলত কাজী যে বাক্যবন্ধগুলি গড়ে তুললেন তা উজ্জ্বল অলংকারের নিদর্শন রূপে রাজসভার পাণ্ডিত ও উজ্জ্বলতাকেই ধারণ করল। উপমা, উৎপেক্ষা, অনুপ্রাসের প্রসাদ নির্মাণ করে কবি আলো জ্বেলে দিলেন রাজসভাগৃহে। উপম তালংকারের প্রয়োগে কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়--

"বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।

দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।"

সুরাত্মক, ধীর গতির পয়ার ত্রিপদী ছন্দেও কবি যে দোলা সৃষ্টি করেছেন, শিল্পকুশলতা সেখানেও প্রতিফলিত হয়েছে এবং দরবারের decorative-ধর্মকেই তা উদঘাটিত করেছে।

মন্তব্য

দরবারী সাহিত্যে কৃত্রিম শিল্পকলার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বলেই ভাষা ও শব্দের সৌধ নির্মাণ চোখ ধাঁধিয়ে যায়। স্থাপত্য ধর্মে classic বৈশিষ্ট্য নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মিলেমিশে এমন একটা শিল্প মর্যাদা লাভ করে, যেখানে লোককথাধর্মী বিষয়ও ধ্রুপদী সাহিত্যের স্তরে উপনীত হয় । সতীময়না'-র যে অংশটুকু আলাওল রচনা করেছেন, সেখানেও দরবারী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করে উঠেছে।' শবদে শবদে বিয়া'-দেওয়ার একটি উদ্দেশ্যমুখী প্রয়াস পাণ্ডিত বুদ্ধির চমৎকারিত্বকেই প্রকাশ করে। কামকলার সাধনা সরস্বতীর আরাধনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে। আলাওলের রচনাংশে এই জাতীয় ধর্মের সঙ্গে অবিশ্বাস্য বিষয়ের আমদানি ও আলংকারিক গুণাবলী অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। দৌলত কাজী ও আলাওল উভয় কবি মিলে 'সতীময়না'-কাব্যে দরবারী সাহিত্যের প্রাণলক্ষণকে সার্থকভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৭.৫ লোরচন্দ্রানী কাব্যে উপন্যাসোচিত আধুনিকতার দিক

রোমান্টিক সাহিত্যের মুখ্য বিষয়বস্তু হল প্রেম। আরবী সাহিত্যেই দুর্বার প্রেমের প্রচন্ড শক্তির দাপটদেখিয়ে রোমন্স রচিত হয়েছিল। ফরাসী চারণ কবিদের রচনায় প্রেমেররহস্য ও রোমাঞ্চ কাব্যরসের প্রধান উপাদানহয়। রোমান্টিসিজমের শিল্পরীতি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য তার পূর্বেই সেখানে Romantic period আরম্ভ হয়েছিল। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অজানা রহস্যের জন্য ব্যকুলতা Romance, যাকে realism-এর বিপরীত বলা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের প্রেম চেতনায় এবং লোকগীতিতে ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রোমান্টিক প্রেমচেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল। কবি দৌলত কাজি ঐ ঐতিহ্য অবলম্বনেই 'লোর-চন্দ্রানী' লিখে স্বপ্নকল্পনাকে বাস্তবজীবনাশ্রয়ী করে তুলে আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্যের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

লোরচন্দ্রানী' কাব্যখানির কাব্য বিষয় বিচার করলে সৌন্দর্যের স্বপ্ন ওসুদরের রহস্য প্রিয়তার রোমান্টিক আবেগ পরিলক্ষিত হয়। লোরক রাজা পরমা সুন্দরী গুণবতী ময়নাকে পত্নীরূপে

পেয়েছিল। কিন্তু তার রোমান্টিক মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ছিল না। সে সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে উদ্যান বাটিকায় খেয়ালী জীবন চর্চায় সময় কাটায়। যোগীর কাছে একটি অপূর্ব সুন্দরীর প্রতিমূর্তি দেখে রোমান্টিক রহস্যে বিভোর হয়ে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যা পেয়েছি তা নয়, যা পেতে পারি তারই উদ্দেশ্যে দুর্গমের অভিসার রোমান্টিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য লোরক চরিত্রের মূল গঠনের মধ্যে দৌলত কাজি রোমান্টিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। লোরক চরিত্রের মূল গঠনের মধ্যে দৌলত কাজি রোমান্টিক নায়কের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুললেন। নায়িকা চন্দ্রানীর চরিত্রেও রোমান্টিক লক্ষণের অভাব নেই। তবে স্বামী বামনের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য তার রোমান্টিক মানসিকতাকে চরম অতৃপ্তিতে ক্ষুন্ন করেছে। অনিন্দ্যকান্তি লোরককে পিতার রাজভায় দেখে সে রাজসভায় দেখে সে রোমান্টিক প্রেমচেতনায় বিহ্বল হল। কৌশল নিজ মূর্তির প্রতিবিম্ব লোরের সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত করল। দেবপূজার উদ্দেশ্যে মন্দিরে গিয়ে যেভাবে গলার মুক্তামালা ছিড়ে লোরককে ভাল করে দেখে নিল এবং পূজার পুস্পাঞ্জলি প্রদানের ছলে লোরককে প্রেম নিবেদন করেছিল তাতে কাহিনীতে রোমান্টিক রস দানা বেঁধে উঠেছে। দেববাদ ও ভক্তিবাদের সাহিত্য রচনার যুগে মানব মনের রোমান্টিক আবেগকে এই ভাবে কাব্য ভাষার প্রদান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। দৌলত কাজি সেই যুগের পক্ষে অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

শুধু নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টিতেই নয়, কাহিনী বিন্যাস কৌশলের মধ্যেও রোমান্টিক রস ও রহস্য দৌলত কাতি আগাগোড়া জাগ্রত রেখেছেন। ময়নাবতীর চরিত্রে মধ্যযুগের হিন্দু সমাজের সতীত্বের আদর্শ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। স্বামী যথেচ্ছাচার থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না — এই আদর্শটাই -রামান্টিক কবি আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু প্রেম সম্পর্কের মধ্যে সমাজ সংস্কারকে তুচ্ছ করে যে -রামান্টিক উত্তেজনা জাগে, চন্দ্রানঈ সংক্রান্ত ঘটনাগুলির মধ্যে দৌলত কাজি তা নিপুণভাবে সমাবেশ করেছেন। গল্পটি সংক্রান্ত ঘটনাগুলির মধ্যে দৌলত কাজি তা নিপুণভাবে সমাবেশ করেছেন। গল্পটি সাজাবার মধ্যে দৌলত কাজি ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তোররাজ একটি সুন্দরী রমণীর প্রতিমূর্তি দেখে রোমান্টিক কৌতুহলে আবিষ্ট। অপরিচিত রহস্য উদঘাটনের জন্য তার দুঃসাহসিক যাত্রা ।

সে গোহারী দেশে উপস্থিত হয়ে রাজকন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারে প্রবলভাবে প্রণয়াসক্ত হয়। তারপর রাজক্যার প্রচ্ছন্ন অনুমোদনে উল্লসিত হয়ে দড়ির সিঁড়ির সহায়তায় প্রচন্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাজকন্যার মহলে গোপনে প্রবেশ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রেমে ও বীর্যে যে সিভাদ্রী দেখা যায়, মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজাদের মধ্যে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, লোর চরিত্রের মধ্যে দৌলত কাজি সেই পরিচয় প্রকটিতে করলেন। চন্দ্রানীর স্বামীর অগোচরে রাজা তোরক যেভাবে পরনারী হরণ করেছে, সেটি নিঃসন্দেহে সামাজিক অপরাধ। ফলে, গোটা কাহিনীটা চমৎকার কৌতুহলপ্রদ হয়ে উঠেছে। দৌলত কাজি একদিকে দেখিয়েছেন প্রেমের দুর্বার শক্তি ও দুরন্ত গতি, আর একদিকে ময়নাবতীকে কেন্দ্র করে দেখিয়েছেন প্রেমের সুদৃঢ় নিষ্ঠা। লোরকের চন্দ্রানীর জন্যে অভিযাত্রা দুঃসাহসিক অভিযান এই অভিযাত্রায় আছে দুঃখ কষ্ট, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। দৌলত কাজি বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কল্পনা ও স্বপ্ন দিয়ে বাস্তব জীবনের প্রবৃত্তিগুলিকে শুধু উদঘাটিত নয়, সুপ্রকাশিত করেছেন। সাধারণ লোকো কথাকে নায়িকাপ্রধান রোমান্টিক কাব্যরূপে উপস্থিত করে এই কাব্যধারায় প্রাক্ সূচনা করেছিলেন। যথাযোগ্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের মত মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে নাটকীয় রসচেতনায় এবং গীতিরসের মূচ্ছনায় কাব্যখানিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ করে রেখেছেন।

৭.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। ‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী’ অনুবাদ কাব্য হলেও দৌলত কাজীর মৌলিকতার পরিচয় সম্পর্কে আলাচনা কর ।

২। রোমান্টিক কাব্য হিসেবে ‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রণী’ - কাব্যটির রোমান্টিক ধর্ম আলোচনা কর।

৩। দরবারী সাহিত্য হিসেবে ‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী’-র সার্থকতা বিচার কর।

৪। ‘সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী’-কাব্যের প্রেমকাহিনীর স্বাতন্ত্র পরিস্ফুট কর ।

৭.৭ সহায়ক গ্রন্থ

১। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী - সম্পাদনা ও মযহারুল ইসলাম, দুলাল চৌধুরী।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যর ইতিহাস (২য় খন্ড)- শ্রী সুকুমার সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খন্ড ও প্রথম পর্ব)- শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন -মঞ্জুলা বেরা ।

৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম - সুখময় মুখোপাধ্যায় ।

৬। রাজসভার সাহিত্য -দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।